ধানের শীষে শিশির

মহাশ্বেতা দেবী

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার-কে

আমাদের প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বই :

হাজার চুরাশীর মা

অরণ্যের অধিকার

অগ্নিগর্ভ

নৈঋতে মেঘ

শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা

চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর

কবি বন্দ্যঘটী গঞ্রির জীবন ও মৃত্যু

লায়লী আসমানের আয়না

নাটক :

হাজার চুরাশীর মা

॥ ১ ॥

এষার যখন বছর বারো বয়স, তখন তাদের বাড়িতে জয়ামাসি এসেছিলেন। নিশ্চয়ই শরীর সারতে, অসুখ দেখাতে, অথবা অন্য কোনো কাজে। এষাদের বাড়িতে এ রকম অগুনতি আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। এষার মা'র নিজেরই আত্মীয়স্বজন ছিল অনেক। তা ছাড়া দেশ-বিদেশ বেড়াতে গিয়ে তিনি বহু জনের সঙ্গে চিরদিনের আত্মীয়তা স্বীকার করে আসতেন।

প্রথম দিকে এষার বাবা অবাক হয়ে যেতেন। যাঁরা আসতেন, তাঁদের সকলকে চেনবার চেষ্টা করতেন। এত মানুষের আসা-যাওয়ার হিসেব রেখে নিজেদের জীবনটা ব্যস্ত করে তুলতে রীতিমতো আপত্তি ছিল তাঁর। হয়তো ভাবতেন এটা এষার মা'র খেয়াল। আস্তে আস্তে শুধরে যাবে। তিনি নিজে কম কথা বলতেন, একটু নির্জনতা প্রিয়, আড়ালের মানুষ। স্ত্রীকে নিজের রুচিতে দীক্ষিত করবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। বিয়ে করবার আগেই বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছিল তাঁর। যে মন দিয়ে মানুষ স্ত্রীকে ভালবাসে, সংসার রচনা করে, সেই মন দিয়ে তিনি ভালবেসে ছিলেন তাঁর নির্জনতা, তাঁর ছন্দে বাঁধা জীবনযাত্রা। বাড়ির প্রতিটি তুচ্ছ জিনিস নির্বাচনেও ছিল তাঁর রুচির স্পর্শ।

বন্ধুরা বলতেন এর চেয়ে না কি তাঁর কবিতা লেখা উচিত ছিল। বলতেন, 'তুমি পুরুষমানুষ হয়ে যে ভাবে সংসার সাজাও গোছাও, কবিরা সেই যত্নে শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন বলে জানি।'

এ কথা শুনলে ভদ্রলোক ঈষৎ হাসতেন। আত্মীয়স্বজন বলত মেয়েলিপনা। সে কথা কানে এলেও হাসতেন। পুরুষ হলেই সংসারের গৃহিণীপনার দিকটা মোটে জানবে না এ তিনি স্বীকার

করতেন না। বলতেন সব মেয়েদের মধ্যেই কিছুটা পুরুষের অংশ থাকে, সব পুরুষের মধ্যেই এককোণে নারী বাস করে, বিধাতার সৃষ্টিতে কোনো কিছুই ওজন ছাড়া নয়। অন্যরা নানা মন্তব্য করত। তাঁর মা শুধু হাসতেন। বলতেন, 'বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' মা আত্মীয়-কুটুম্বদের ডেকে খবরাখবর নিতেন, ভাল মেয়ে কোথায় পাওয়া যায়, তাঁর ছেলের পাশে মানায় এমন বউ। ছেলে হাসতেন আর বলতেন এমন মেয়ে চাই, যে তাঁর জীবনে ছন্দ পতন ঘটাবে না।

বিয়েটা বোধহয় কপালে লেখা থাকে, তাই কেমন করে একদিন এ বাড়িতে সানাই বাজল। বাসরে এসে বন্ধুরা বললেন, 'সতীশ এবার তোমার মনোমতো সঙ্গিনী পেয়েছ তো? আমরা দেখে বড় খুশি হলাম।'

কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি পালটে গেল সব।

ঠাকুমাকে এষার সামান্যই মনে পড়ে, পুবদিকের ছোট ঘরে তিনি শুয়ে থাকতেন। ছেলের বিয়ে হবার পর থেকেই শরীরও তেমন ভাল থাকত না। তা ছাড়া এষার মা'র কাছে এত লোকজন আসতেন যেতেন, যে খেই হারিয়ে ফেলতেন তিনি। সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আসলে এষার মা সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ম সব পালটে দিচ্ছিলেন। সংসারের আধিপত্য একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে যাওয়ার সময়ে সাধারণত ঘরে ঘরে কুরুক্ষেত্র হয়। কোথাও হইচই করে, কোথাও নীরবে, ভদ্রতার আবরণটুকু বজায় রেখে। যুদ্ধ ছাড়া সংসারের এক রত্তি অধিকার শাশুড়ী বউকে দিতে চান না।

এষার ঠাকুমা কিন্তু টপ করে সব ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। নাতি নাতনী নিয়ে পুবের ঘরে থাকতেন, আর এষার বাবার বিব্রত অবস্থা দেখে কখনো হাসতেন, কখনো দুঃখ পেতেন। স্বভাবে এবং রুচিতে গরমিল, এ ছাড়া এষার মা'র বিরুদ্ধে তাঁরও বলবার তেমন

কিছু ছিল না। ছেলেকে বলতেন, 'যে যেমন ভাবে তৈরি, ও স্বভাবের বিরুদ্ধে যায় কি করে বল দেখি।'

'চেষ্টা করে কই?'

'সবাই যে তেমন হয় না বাবা, চেষ্টা করতে জানে না ও।'

অথচ এষার বাবাও এষার মা'কে ভালবাসতেন। সেটি জেনেই যেন বুড়ি নিশ্চিন্তে ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে বলে গেলেন 'মানিয়ে নিস। সংসারে চলতে গেলে মানিয়ে নিতে হয়।' ছেলে বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন জীবনটা নষ্ট হল। সে কথায় আমলই দিলেন না। হেসে বললেন, 'এতেই নষ্ট হয়ে গেল সব? তা কখনো হয়? তোর অন্য কর্তব্য নেই?'

হেসে হেসে যেন ছেলের মনটিকে ঠিক দিকে চালিয়ে দিয়ে গেলেন। মৃত্যুকালে জড়ানো অস্পষ্ট গলায় যখন বললেন, 'তোকে একলা রেখে যাচ্ছি,' তখন বোঝা গেল আসলে ছেলের জন্যে কি উদ্বেগ ছিল মনে মনে। ডান হাতটি অসহায় ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে চিত করলেন বুকের ওপর, 'একলা রেখে যাচ্ছি' বলার সঙ্গে সঙ্গে। শীর্ণ আঙুলগুলোয়, চোখের কোণের জলে তাঁকে বড় নিরুপায় দেখাল। তাঁকে দেখে এষার বাবার খুব কষ্ট হয়। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল 'এই নিয়ম মা, আসা-যাওয়ার সময়ে কেউ কারো নয়। তোমার সাধ্য কি তুমি জগতের নিয়ম পালটে দেবে?'

ঝুঁকে তিনি মার দিকে চেয়ে ছিলেন। এখনো আত্মীয়-স্বজনরা বলেন, 'সতীশের মতো মাতৃভক্ত চট করে দেখা যায় না।'

এষার বাবা মা'র দিকে চেয়ে মনে করেছিলেন এখন মাও একলা। দীর্ঘ, অচেনা পথে যাচ্ছেন। এমন সময়ে কে বললে 'কানে তারক ব্রহ্ম নাম বল।' তিনি মন্ত্র চালিতের মতো বললেন 'ওঁ তারকব্রহ্ম।' আবার শুনলেন 'মুখে গঙ্গাজল দাও।' তিনি গঙ্গাজল দিলেন, জল গড়িয়ে পড়ল। সবাই বললে 'তবে হয়ে গেছে।'

এষার বাবা খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন। সামনে বসেও তিনি টের পেলেন না কিছুই? যখন ভাবছিলেন এবার মা'র আরেক যাত্রা শুরু, তার আগেই মা'র দেহ থেকে প্রাণ চলে গেছে? অবাক হয়েছিলেন, খুব একটা ক্ষতির বোধ মনে জাগে নি। শ্মশান থেকে ফিরে এসে দরজার ঝনকাঠে হাত রেখে যখন দেখলেন ঘরের মেঝে ধোয়া, জলের দাগ কাটা, আর মাঝে গোবরের মুটির ওপর একটা পিদিম বসানো, তখনি মনে শূন্যতার বোধ এল। সে শূন্যতার জীবনেও পূর্ণ হয়নি।

এষার বাবার স্বভাব ঐ রকম। যে ক্ষতিগুলো তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত, সেগুলোর প্রতি তাঁর অসাধারণ মমতা। এষা বড় হলে শুনেছে বাবা মাকে বলছেন 'না—না, কোনো ক্ষতিরই ঠিক পূরণ হয় না, এ আমি বিশ্বাস করি না। সব থেকে যায়।'

'রাখ বলেই থাকে।' এষার মা ধীরে বলেছিলেন। তখন তাঁর বয়েস হয়েছে. সংসারের চাপ পড়ে পড়ে ভোঁতা হয়ে গেছেন তিনি, তবু কোনো কোনো বিষয়ে পুরনো অভ্যস্ত নিপুণতা কাজ করত। যেমন ঐ কথার পিঠে সাজিয়ে কথা বলা। তিনি জানতেন শব্দের ক্ষমতা অপরিসীম। গুছিয়ে সাজিয়ে তাকমতো ব্যবহার করতে পারলে মুখের কথা কখনো হয়ে ওঠে মনের ক্ষতে সান্ত্বনার চন্দন প্রলেপ, কখনো তীক্ষ্ণধার অস্ত্র।

তবু, এষার বাবার বিষয়ে তাঁর কথাটা সত্যি। ক্ষতকে, ক্ষতিকে, লালন করতেন এষার বাবা, ভুলতেন না কখনো। অতি দুঃখী মানুষ যে, সেই জীবনের বঞ্চনাগুলিকেই বড় করে দেখে. হয়তো এষার বাবা আসলে দুঃখী। সম্ভবত তাঁর সংসারে ঐ শূন্যতাটুকুই ছিল একেবারে নিজের, যার ভাগ কেউ নিতে চায় নি। আর সব কিছুই ভাগাভাগি হয়ে দশজনের হয়ে গিয়েছিল।

এষা বড় হবার পর মাঝে মাঝে বাবা তাঁর মা'র কথা বলেছেন। সম্ভবত সন্তানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে একই স্মৃতিকে দু'জনে ভাগ করে

নিয়ে, তিনি নিজের নিঃসঙ্গতার হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। তা অবশ্য সম্ভব হয় নি। বাবার গলার আবেগ এষাকে লজ্জা দিয়েছিল। তার সঙ্কুচিত, বিব্রত মুখ দেখে বাবা নিজের ভাবালুতায় আরো গভীর লজ্জা পান। তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে যায়. 'আচ্ছা এখন যাও', বলে তিনি নিজের ঘরে পালিয়ে বাঁচেন। নিজের আবরণ নিজেই রচনা করে মানুষ। বেরোতে পারলেই হয়তো মুক্তি, কিন্তু বেরিয়ে আসা বড় কঠিন। এষার বাবার মতো মানুষের পক্ষে আরো কঠিন, আরো কষ্টকর। তারপর আর কখনো তিনি এ-বাড়িতে মা'র নাম করেন নি।

না, ঠাকুমাকে এষার ভাল মনে পড়ে না। সে জানে বাবার আলমারিতে ঠাকুমার একখানা ছবি আছে। ভাসা ভাসা মনে পড়ে কবিরাজী ওষুধ আর পুরনো ঘি-র তীব্র দুর্গন্ধ। ঠাকুমার জন্যে শেষ অবধি কবিরাজ আনা হয়েছিল।

ঠাকুমা এবং তাঁর আমলের বাড়ি এষা চেনে না। তার চেয়ে জয়ামাসির কথা তার অনেক স্পষ্ট মনে আছে। মনে থাকবার একটা কারণ হচ্ছে জয়ামাসিকে দেখেই তার মামাতো বোন রেবা মুখ টিপে হেসেছিল। হাসবার ধরণটা ভাল নয়। বলেছিল, 'ও তোর কে হয় তা জানিস ?'

এষার ছোটবেলা বাড়িতে মামাতো মাসতুতো বোন ভাইরা দল বেঁধে ছুটি কাটাতে আসত। এষার পড়ার ঘরে ছিল মেয়েদের আড্ডা আর চেনা অচেনা সব লোকেদের নিয়ে সেখানে অসম্ভব সব গল্পের জাল বোনা হত। বড়দের কাছ থেকে সবকিছু গোপন করে চলার মধ্যেই ছিল আসল আনন্দ।

রেবা, বিনু, সীমা, সবাই এষার চেয়ে বয়সে বড়। সীমার বয়স রীতিমতো সতেরো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হত ছেলেদের কথা। ইস্কুলে যাবার পথে কে কার দিকে তাকিয়েছিল, কে বোনের কাছ থেকে বিনুর নাম জেনে নিয়েছে, বিয়ে বাড়িতে

কে পরিবেশন করতে এসে সীমাকে চুপ করে দু'বার পান দিয়ে যায়। একবার হাতে হাত ঠেকিয়ে, তাই নিয়েই কথার অন্ত ছিল না।

ওরা সবাই বইয়ের পাতার মধ্যে ফুলের পাপড়ি গুঁজে রাখত, ভালবাসার কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলতে জানত না। কখনো চকলেটের বাক্সের মধ্যে বিলিতী ছবির নায়কের ছবি. হালআমলের আধুনিক গাইয়ে অথবা কোনো সুন্দর মিষ্টি নাম, সব কিছুই ভালবাসত তারা। আসলে ভালবাসাই উদ্দেশ্য, কল্পনাতেই আনন্দ, ওদের সব কথা যে সত্যি নয়। তা অনেকদিন অবধি এষা বুঝত না।

তার ওপর রেবা ঐ রকম সম্ভব অসম্ভব গল্প বানাত। প্রতিটি গল্প মর্মান্তিক, শোচনীয় তাদের পরিণতি। 'কি ট্রাজিডি, বল্ তো ভাই? রেবার মুখে কথাটি লেগেই থাকত। এষার মাস্টারমশায়ের কপালের কাটা দাগ (পরে জানা যায় সেটি ফোড়ার দাগ) নিয়ে সে এমন করুণ একটি দুর্ঘটনার গল্প ফেঁদেছিল, যে মাস্টারমশায়ের দিকে চাইলেই এষার কান্না পেত।

নিজের বাবা, মা, চেনা, অচেনা, রেবা সকলের জীবনেরই গোপন সব দুঃখের খবর জানত। তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করত এষা, রেবাকে মনে হত তার চেয়ে অনেক অনেক উঁচু স্তরের মানুষ। 'না ভাই, তোমায় বলব না,' বলে রেবা তাকে অসহ্য মনে কষ্ট দিতে পারত।

'এষা, সেই কথাটা শুনে যা',—রেবার গলায় অন্তরঙ্গতার সুর শুনলে এষার মন আনন্দে ভরে যেত। রেবাই জয়ামাসিমা সম্পর্কে তাকে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে বলে। সেটা গৌণ। রেবার সব কথাই যে মিথ্যে বানানো, তা যেদিন থেকে বুঝেছে এষা, সেদিন থেকেই রেবার আজগুবি গল্পগুলোর জাদুমন্ত্রও ঘুচে গেছে। তাঁকে মনে রাখবার মতো দুটি অভিজ্ঞতা তার নিজের আছে।

জয়ামাসির আসা আর থাকা নিয়ে বাড়িতে বিশেষ করে কোনো অশান্তি হয়েছিল কিনা তা মনে পড়ে না। তবে মাঝরাতে একঘুমের পর হঠাৎ জেগে এষা বাবা মা'র কথা শুনতে পায়। মামাতো মাসতুতো বোনেদের সঙ্গে মাসখানেক কাটাবার পর তার বয়স বোধহয় চট করে বেড়ে যায়। কেননা বাবা মা'র কথা আড়াল থেকে শুনতে তার খুব ভাল লাগতে শুরু করে। দোষ হচ্ছে, পাপ হচ্ছে, একথাও তার মনে হয়। একটু উসখুস করে সাড়া দিলে হয় তো মা তখনি ঘরে আসবেন জিগেস করতে। দোষ এবং পাপ বোধ এষার সঙ্গের সাথী। সম্ভবত সে বাবা মা'র কথা থেকে বুঝতে চেষ্টা করছিল তার বিষয়ে কোনো কথা হচ্ছে কি না।

'জয়াকে তুমিই আসতে বলেছিলে।' বাবার গলা মৃদু, অসহায়, ক্লান্ত। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েন না তিনি, রীতিমতো অনিদ্রার রোগী, অনেক সময় অপেক্ষা করে তবে তাঁর চোখে ঘুম আসে। এষার মনে হল ঘুমের সময় চলে যাচ্ছে বলে বাবা অসহায় হয়ে পড়েছেন। সময়টি পেরিয়ে গেলে তাঁকে বাকি রাতটুকু পায়চারি করে কাটিয়ে দিতে হবে। মামারা যখন মাঝে মাঝে রাত জেগে তাস খেলতে বসেন, তাঁদের উল্লাসের হাসি ও চীৎকার শুনে এমন অনেক রাত তাঁর হেঁটে হেঁটে কাটে। এ কথা মা'র অজানা নয়। কিন্তু মা কেন বাবার সঙ্গে কথা বলছেন? রাতে তিনি সচরাচর বাবার সঙ্গে কথা বলেন না।

'তুমিই জয়াকে আসতে বলেছিলে ছবি।'

'তখন জানতাম না ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল। জয়া বলল বলে জানলাম।' কিছুক্ষণ কথাবার্তা নেই। তার বাবা ধীরে বললেন—'তোমার কথা হয়েছে।'

'ওর আসার কথা হতেই তুমি কেন বললে না?'

'কি বলতাম? একসময়ে আমার মা'র কাছে ওর বাবা বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন সেইকথা? বোকামি কর না, ঘুমোতে দাও।'

'হ্যাঁ, আমি কথা বললেই যত বিরক্ত আসে তোমার...' মা আরো কি কি বললেন এষা শুনতে পায় নি। কেননা তার নিজের বুকের ধকধকানি বেড়ে গিয়েছিল। জয়ামাসির সঙ্গে বাবার বিয়ের কথা হয়েছিল ? নিশ্চয় এর মধ্যে দোষের কিছু আছে, ব্যাপারটা গুরুতর, নইলে এত রাতে চুপি চুপি সে কথা বলার অর্থ কি ?

তার দু'একদিনের মধ্যেই জয়ামাসি চলে যান। যাবার আগে এষা তাঁর কাছে ঘুরঘুর করছিল, বলেন—'দেখি, তোর হাতটা দেখি।'

হাত দেখে জয়ামাসি তার মা'কে বললেন, 'ছবি, তোমার মেয়ের খুব লেখাপড়া হবে।'

তার গালটিপে বললেন—'তুইও যে দেখছি আমারই মতন, ভারী স্নেহমমতার কাঙাল।'

শোনবার সঙ্গে সঙ্গে এষার মনে হল জয়ামাসির মতো কেউ ভালবাসেনি তাকে। সত্যিই সে যেন স্নেহমমতা পায় নি কারো। খুব ভালবেসে ফেলল এষা জয়ামাসিকে, এমন কি তিনি চলে যাবেন জেনে ঝরঝর করে কাঁদলও খানিকটা।

জয়ামাসি খুব বিব্রত হয়ে পড়েন। এষার চোখের জল দেখে তিনি লজ্জা পান। বয়সের হিসেবে তাঁর যৌবন তখনো যায় নি, এদিকে চিরকুমারী, মনের আবেগের প্রকাশ দেখলেই তাঁর লজ্জা হয়। বিব্রত হয়ে তিনি একটা জামার লেস দিয়ে দেন এষাকে। জয়ামাসির বাক্সে তার চেয়ে শৌখিন কিছু ছিল না।

মা এত রেগে গিয়েছিলেন যে কিছু বলতে পর্যন্ত পারেন নি। বাইরের লোকের জন্য মেয়ের টান দেখে তাঁর গা জ্বালা করছিল। জয়ামাসির কথা নানা কারণে এষার অনেকদিন অবধি মনে ছিল।

॥ ২ ॥

একদিন এষাদের বাড়ির আকাশে একটা মস্ত বড় ঘুড়ি উড়ল।

তখন ঠিক দুপুরবেলা। কেন যেন আষাঢ়ের আকাশের কোনায় কোনায় মেঘের জটলা সকাল থেকে, অথচ বৃষ্টি নেই। এ-রকম দুপুরে, বাড়িতে সবাই যখন বিশ্রামে, চারিদিক নিঝঝুম, শান্ত, ফেরিওলারা পর্যন্ত এ গলির পথ ভুলে গেছে। তখন এষা প্রায়ই পা টিপে টিপে বাবার ঘরে ঢোকে। চুপ করে জানলায় বসে থাকতে তার ভাল লাগে।

এষা চুপ করেই বসেছিল।

জানালা দিয়ে চেয়েছিল আকাশের দিকে। উজ্জ্বল সোনালি দেখাচ্ছিল ঘুড়িটা। সমস্ত আকাশ শান্ত, গম্ভীর, ধীরে ছড়িয়ে গেল সেই শান্ত নীলিমা বাড়ির ছাতের ওপর দিয়ে, নারকেল গাছের মাথায়, যেন দিগন্ত উপচে ঢেলে দিল কে। ঘুড়িটা ভেসে বেড়াতে লাগল সেই গাঢ় মেদুর নীলিমায় এক টুকরো খুশির খবরের মতো। জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে এষার মনে হতে লাগল এই দুপুরটা তার একলার, আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। ছাতের পর ছাত, চিলেকোঠা, তারে মেলা রঙিন কাপড়। গাছের পর গাছের মাথায় চারদিক সবুজ। মনে হয় চারদিক যেন বনে ঘেরা।

এখন বাড়িটা খুব খালি।

সবাই চলে গেছে। রেবা, বিনু, সীমা। যাবার আগে সীমা চোখের জল ফেলে গেল। বলে গেল, 'এষা, তোর এ ব্যবহারের কথা ভুলব না কখনো।'

সীমার মা, এষার মা'র খুড়তুতো বোন। বগুড়ায় থাকেন। ওখানে কোনোদিন যায় নি এষারা। শুধু মাঝে মাঝে শুনেছে সীমার বাবার

সামান্য আয়। সীমারা অনেক ভাইবোন। ওরা একটা ছোটবাড়িতে গাদাগাদি করে বাস করে। ওঁকে ছাত্রজীবনে এষার বাবা চিনতেন। এষার মা'র আত্মীয়স্বজনের মধ্যে শুধু ওঁর সম্পর্কেই বাবা কিছু শ্রদ্ধা রাখেন বলে এষার মনে হয়।

তার মানে এই নয় যে অন্যদের সম্পর্কে তাঁর মনে অশ্রদ্ধা আছে। মানুষকে অশ্রদ্ধা করা, মন্দ ভাবা তাঁর স্বভাবের বাইরে। আসলে, বিশ্বসংসার বিষয়ে তিনি উদাসীন, যে সব মানুষে তাঁর আকর্ষণ আছে, একমাত্র তাদের বেলাতেই তিনি উদাসীনতার আবরণ সরিয়ে রেখে স্বাভাবিক হন।

তিনি শুনতে না চাইলে কি হবে, এষার মা তাঁকে সব সময়ে নানান খবর শোনান। আশ্চর্য সজীবতা মা'র স্বভাবে। সর্ব সময়ে প্রাণপ্রাচুর্য উপচে পড়ছে। রঙিন তাতের দামী শাড়ি ছাড়া পরেন না। ছুটোছুটি করে কাজ করেন, মুখে সদাই হাসি, কাজের উৎসাহে অকাজ বেশি করেন। ঠিক অফিস যাবার সময়ে ঘরের ঝুল ঝাড়তে এলেন, রান্না অর্ধেক নামিয়ে রেখে এসে বসলেন এষার চুল আঁচড়াতে। এখনো চেহারায় লাবণ্য আছে, কমনীয়তা, তাঁরই সমবয়সী পাড়ার অন্য মহিলাদের দেখলে তবে বোঝা যায় বয়স তাঁকে কত কম অধিকার করতে পেরেছে।

তাঁর আত্মীয়স্বজন কার কি হল, নতুন চাকরি, বিয়ে, দুর্ঘটনা, আনন্দ সংবাদ, সব তিনি খুঁটিয়ে বলতে বসেন স্বামীর কাছে। অফিস থেকে এসে সতীশ যখন চেয়ারে বসেন গা এলিয়ে, পাশে বসে কথা বলে যান এষার মা। বাবার মুখে শুধু 'হুঁ', তাইতো, ও', মাঝে মাঝে শোনা যায়।

শেষে রেগে মা বলেন, 'না, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ নেই কোনো।'

রেগে উঠে যান না তিনি। যদিও, এষার ধারণা বাবা মনে মনে তাই-ই চান। তখন মা বলেন, 'বল, তোমার যা ভাল লাগে তাই

নিয়েই কথা বল।' অথচ, সীমার বাবা মোহিত মেসোমশায়ের কথা উঠলে এখনো বাবা দুঃখ করে বলেন 'কি ছাত্র ছিলেন! কি ডিবেট করতেন! নন্-কোঅপারেশন করে এম. এ, পড়া ছেড়ে দিলেন তাই! সবাই দুঃখ করেছিল, এমন কি প্রিন্সিপাল ওঁর বাড়িতে অবধি গেলেন। শুনলেন না মোহিতদা। স্যার বললেন, 'মোহিত, এভাবে নিজেকে নষ্ট কর না। মোহিতদা কি বললেন জান?'

এবার মা চোখ তুলে তাকান।

'মোহিতদা বললেন, কয়েক হাজার ছাত্রকে এভাবে জীবন নষ্ট করতে হবে স্যার, নইলে স্বাধীনতা আসবে না। কিন্তু কি লাভ হল!' ওঁর মতো ছেলে শেষ অবধি মফঃস্বলে ওকালতি করছেন।

সম্ভবত তিনি বোঝেন নি তাঁর কথা এষার কানে যাচ্ছে। বুঝলে আর একটু সতর্ক হয়ে কথা বলতেন! অথবা, শব্দের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনোই ধারণা ছিল না তাঁর। সাধারণত তাঁকে এষা কখনই কারো সম্পর্কে এত কথা বলতে শোনে নি। এখন বাবাকে এমন আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করতে দেখে তার মনে মোহিত মেসোমশায় সম্পর্কে বেশ উজ্জ্বল ধারণা হয়। সীমা সেই মোহিত মেসোমশায়ের মেয়ে। আটজন ভাইবোনের মধ্যে সে মেজ। তার মাথার ওপর এক দাদা, সে-ও এখানে পড়ে মাসখানেক আগে তাকে এখানে পাঠিয়ে দেন তার বাবা। সতীশের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানান 'শ্রীমতী যদি কিছুদিন তোমার কাছে থাকে'...... শেষের দিকে আরো কিছু ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা ছিল। এষার মা'র কাছে তাঁর ফুলদিদি চোখের জলে ভেজা একখানি আঁকাবাঁকা অক্ষরে চিঠি লেখেন। তাতে অনেক মনের কথা ছিল, 'ভাই, আমরা দুটি বোন, এক সময়ে একই বোঁটায় দুইটি ফুলের মতো ছিলাম' দিয়ে চিঠির পাঠ শুরু। পরিশেষে মেয়ের জন্যে একটি পাত্র দেখবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ।

এবার বাবা অবশ্য বিয়ের কথা শুনে অন্যমনস্কভাবে 'হুঁ, হাঁ' করে হঠাৎ বললেন, 'না, মেয়েটার যদি মন থাকে তবে ওকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। লেখাপড়া শিখুক। মোহিতদার মেয়ে তো! একটু লেখাপড়া শিখবে না?'

ছাত্রজীবনের পর থেকে দীর্ঘ অদর্শনে মোহিতদা সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা তখনো অম্লান।

সীমা আসতে তিনি ভাল করে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার বাবা বলেছেন যতদিন খুশি থাকতে। তা তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে স্কুলে ভর্তি হতে পার, তোমার মাসিমাকে জানিও, ভর্তি করে দেবেন।'

আরো কিছু জিজ্ঞেস করতেন বোধ হয়, কিন্তু সীমার বিরাট জাল-বাঁধা খোঁপা, মুখের পাউডার ও ঠোঁটের সবজান্তা মুচকি হাসি দেখে তাঁর কৌতূহল সহজেই মাঝপথে থেমে গেল। বেশ, এখন যাও, হাত মুখ ধুয়ে টুয়ে · ' বলে তিনি তাড়াতাড়ি খবরের কাগজে আবার ডুবে গেলেন।

ইতিমধ্যে রেবা এবং বিনু আসে। সীমা হয়তো একটু বেশি গম্ভীর হয়ে থাকছিল ইদানীং। গম্ভীর, অথচ অন্যমনস্ক। সর্বদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, এষা একদিন অবাক হয়ে শুনল সীমা পিওনকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করছে তার নামে কোনো চিঠি আছে কি না।

সেদিন রাতে, খেতে বসে বাবা কথায় কথায় বললেন, 'শোন, পিওনকে একটু বলে দিও তো চিঠির গোলমাল করছে আজকাল; আমার চিঠি নাইন বি-তে দিয়েছে।'

'সে নতুন পিওন দিয়ে থাকবে।'

'কেন, আবার পিওন পালটেছে না কি?' যা হয়ে আসছে, যা চলছে তার এতটুকু রদবদল হচ্ছে জানলেই এষার বাবা ব্যস্ত হন।

'না বাবা,' এষা হঠাৎ বলল, 'আজ পুরনো পিওনকেই দেখলাম; যাকে তুমি পুজোর বকশিশ দিয়েছিলে?'

সীমার দিকে চেয়ে বলল, 'ও আমাদের চেনা পিওন সীমাদি, তোমার চিঠি থাকলে ঠিক দিয়ে যাবে—কি হল ?'

সীমা বিষম খেল, জল খেয়ে নিজেকে সামলাল। বাবা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কেন, বাড়ির চিঠি পাওনি সীমা ?'

'না মেসোমশায়, ভাই আজ···'

'চিঠি না পেলে চিন্তা হয় বই কি'

হঠাৎ মা কথাটা থামিয়ে দিলেন যেন, বাবার দিকে চেয়ে বললেন, 'আস্তে খাও, ঠাকুর ভাত দিক আরো দুটি।'

এষা বলতে যাচ্ছিল 'কিন্তু কালই তো সীমাদি বাড়ির চিঠি পেয়েছ, হাতে চিমটি খেয়ে থেমে গেল। রেবা তাকে থামিয়ে দিয়েছে। সীমা আর বিনুর মুখ নিচু।

সতীশ বললেন না কিছু। বলবেন কি বলবেন না, বললেই বা কাকে বলবেন, খাওয়ার পর্ব নিঃশব্দে শেষ হল।

পরে, ওপরে এসে রেবাকে এষা জিগ্যেস করলে, 'কি হয়েছে !'

তখন সীমা তাকে নিয়ে যায় আড়ালে। এষার হাত ধরে ছলছল চোখে বলে, 'এষা, যদি আমার নামে কোনো চিঠি আসে, তবে কাউকে বলিস না ভাই, যদি কেউ আসে দেখা করতে, তবে বলিস না মাসিমাকে, প্রতিজ্ঞা কর ভাই !'

এষা কিন্তু চট করে হ্যাঁ বলতে পারে নি। 'তুমি এমন করছ কেন,' বলে অবাক হয়ে সে থেমে যায়। কি যেন অন্যায় করছে সীমা, তাকেও দলে টানতে চাইছে, এষার মনে খটকা বেধে গেল। সীমা অবশ্য তার কথা শোনে নি। নিজের আবেগে কথা বলে যাচ্ছিল সে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, ঠোঁট কাঁপছে, এষা হঠাৎ দেখল সীমাকে খুব অপরিচিত দেখাচ্ছে, নতুন নতুন, খুব সুন্দর।

'কি করব বল্ ভাই। ওকে ওর দাদা নিয়ে যাচ্ছেন কোথায় যেন পশ্চিমে না কোথায়। যাবার পথে একবারটি লুকিয়ে দেখা

করতে আসবে, কি করে না বলব বল দেখি! আমার বাবা মা যে বেশি বেশি রাগ দেখালেন, নইলে সে কি আর……?'

এষার মাথায় ঢুকছিল না কিছু। বোকার মতো সে মাথা নাড়লে। পরে, বিছানার ওপর বসে নিয়ম মতো ভগবানকে ডাকবার পরও ঘুম এল না চোখে। এখন ভয় হতে লাগল সীমা তাকে যা করতে বলেছে তাতে নিশ্চয় পাপ হবে, দারুণ পাপ। ভয়ানক পাপের ভয় এষার।

সম্ভবত এই সব কথা ভেবেই ঘুম আসে নি এষার অনেকক্ষণ অবধি, মনে মনে ভেবে পায় নি কি করবে এর পর। হঠাৎ বাবার গলা কানে গেল।

'মোহিতদা চিঠি লিখেছেন…'

'ওঁদের মেয়ে ওঁরা যা বলবেন তাই করতে হবে।'

'তাই বলে এইটুকু একটা মেয়েকে…'

'খুব ছোট নয় সীমা, বিয়ের বয়স হয়েছে।'

'যাকগে মোহিতদা আসছেন, ওকে নিয়ে যাবেন, আমি একটা কথা ভাবছিলাম, এষার কথা বলছি।'

চওড়া দক্ষিণের বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে বাবা মা কথা বলছিলেন। এখন ওপাশে চলে গেলেন, ওদের কথা আর শোনা গেল না। তখন এষার কি দুর্ভাবনা। কি শুনেছেন বাবা হঠাৎ? তার কথা বলতে চাইলেন কেন? মা'র গলা শোনা গেল 'শোনবার হলে তোমার কথা শুনবে হাজার হলেও তোমার কথা তো!'

'তোমার' কথাটির ওপর একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল, পরাজয়ের বেদনা, চাপা ক্ষোভ, লুকনো অভিমান 'তোমার কথা ও মানে খুব, আমি বলে লাভ হবে না কিছু।'

'লাভ হবে না কিছু,' এ-কথাটি, এষার কানে ধক্ করে বাজে। শুনেছে সে আগেও শুনেছে কথাটি, ভাসা ভাসা মনে হয় মা'র কাছেই শোনা। এমনিই এক জ্যোৎস্নারাত, জ্যোৎস্নারাতের সঙ্গে

কি যেন আছে? বালিশের নিচে হাত রাখল এষা। এখন এষার মনে পড়ল।

বেশিদিন নয়, দু'বছরের কথা। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল সব, এষার বিশেষ করে মনে আছে, সেদিনই সামনের বাড়ির মলির মা মারা গেলেন। বারান্দায় যাবে না, বাবার কড়া হুকুম ছিল। কিন্তু মা যাওয়া আসা করছিলেন—ঘর-বারান্দায়। সম্ভবত সেই জন্যেই বাবা অফিস থেকে এসে এষাদের নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। বড় ফিটনে চড়ে ঘুরে-টুরে শবযাত্রার সময় কাটিয়ে ফিরে এলেন বাড়ি।

চোখের সামনে দেখতে হয়নি কিছু। তবু বিছানায় শুয়ে ঘুম এল কই। কেবলই ভয় হচ্ছিল, মানদা ঝি-র কথায় ভয় বেড়ে যায়। এষাদের মশারি গুঁজে দিতে দিতে সে অপ্রসন্ন গলায় বলে 'কেমন মা জানি না, বিছানার নিচে একটা লোহার চাবি রেখে গেল না? এত যাওয়া আসা ছিল এ বাড়িতে, একটু সাবধান হওয়া দরকার।'

রাতে শুয়ে হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিল এষা।

তখন তার বয়েস আরো কম। দশ বছর হয়েছে সবে। অন্যদিন শুতে না শুতেই ঘুম আসে। সেদিন ঘুম আসে নি বহুক্ষণ। জ্যোৎস্নাটা মনে হচ্ছিল বড্ড বেশি সাদা। মশারিটা হাওয়ায় নড়ছিল আর মনে হচ্ছিল কে এসে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। কাদের বাড়িতে কলের ট্যাঙ্ক উপচে জল পড়ছে। জ্যোৎস্নারাতে জলের শব্দটা অবধি মনে হচ্ছিল অস্বাভাবিক।

একটু পরেই মলিদের বাড়ি থেকে আবার কান্নার শব্দ ওঠে। বোঝা যায় ওদের মা-কে দাহ করে ফিরে এল শবযাত্রীরা।

তারপরই ভয় পায় এষা। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে। বাবা মা দু'জনেই ছুটে আসেন।

'না, আমাদের কাছে থাকতে হবে,' এষা বার বার কাঁদে, বাবার কোলে মুখ গুঁজে।

'তুমি থাকবে?' বাবা মা'র দিকে অসহায় ভাবে চান।

মা-ও এষার মাথায় হাত রেখেছিলেন, সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। কিন্তু এষার কথা শুনে উঠে পড়লেন হঠাৎ। একটু হেসে বলেন, 'তুমি থাক, ও তোমাকেই চাইছে।'

'হ্যাঁ, বাবা থাকবে।' এষা আবার বলে।

'জান তো তোমাকেই ভালবাসে। আমি থাকলে ও শান্ত হবে না। লাভ হবে না কিছু।'

'আশ্চর্য!' বাবার গলায় মৃদু তিরস্কার ছিল। আসলে, পরে এষা বুঝেছে, সে বাবাকে বেশি ভালবাসে এ নিয়ে মা'র ঈর্ষা ছিল চিরদিন। আরো চারটি সন্তান ছিল তাঁর, তারা তাঁকে প্রাপ্য সম্মান, ভালবাসা সবই দিয়েছিল। এষাও মা'কে ভালবাসত। কিন্তু তিনি ভাল করেই জানতেন বড়টির বিশ্বাস তিনি পান নি।

জানতে পেরে তাঁর রাগ হত, দুঃখ হত। সতীশ বলতেন, 'ছেলেমেয়ের ভালবাসাও অর্জন করতে হয়, যে শ্রদ্ধেয় তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে!'

এষার মা অবশ্য স্বামীর সব কথা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর স্বভাব ছিল অনেকটা জমির মালিকের মতো। ফসল দিক, বা নিষ্ফলা বন্ধ্যা হোক, জমিটা তাঁরই থাকবে। এষার বিশ্বাস, শ্রদ্ধা—তাতে যেন তাঁর ভগবৎদত্ত অধিকার ছিল। পান নি বলে তাঁর রাগ হত।

সেইজন্যে কথায় কথায় বলতেন, 'লাভ হবে না কিছু, কোনো লাভ নেই ওর সঙ্গে মিছে বকবক ক'রে।'

লাভ নেই বলতেন, তবু টানাটানি করতেন ওকে নিয়ে। পরে, অনেক পরে এষা বুঝেছে মা'কে সে স্বচ্ছন্দে সুখী রাখতে পারে ভালবাসার অভিনয় করে। শ্রদ্ধার ভান দেখিয়ে। তার মা সংসারের বহুজনের মতো স্বচ্ছন্দে তৃপ্ত থাকতে পারেন নকল ভালবাসা,

সেখানো স্নেহ-মমতা পেয়েই। তার বাবার মতো লোকই সংসারে বড় একা। নির্জনতম, যারা যতটুকু হোক, যত সামান্য হোক, খাঁটি জিনিসটুকু চায়।

'ঘেন্না করতে হলে ঘেন্না ক'রো, মুখে ভালবাসার ভান দেখিও না, নির্জলা ঘৃণা রাগ, সব সইতে পারি আমি।' একবার এষার এক ভাইকে বলেছিলেন।

বড় হয়ে অবশ্য এষারও মনে হয়েছে মা'কে সহজেই খুশি করতে পারত সে। ছোটবেলা যদি মা'র স্বভাবটা তার জানা হয়ে যেত। কিন্তু ছোটবেলা সে নিজেও ছিল অন্যরকম। মেকি নিয়ে, নকল নিয়ে কারবার যে করা চলে সে জ্ঞানই ছিল না তার।

দুপুরবেলা বসে বসে সীমার কথা মনে করতে গিয়ে এত কথা মনে পড়ে যায় এষার।

সীমার চলে যাওয়ার সঙ্গে সে-ও জড়িয়ে পড়েছে বই কি।

মোহিতদার মেয়ে বলে সীমার ওপর বাবার যত স্নেহই থাক, ঐ চিঠি আসা আসির ব্যাপার থেকে বাবা মা দু'জনেই সীমার সম্পর্কে একটু জুড়িয়ে গেলেন। রাতে শুয়ে শুয়ে বাবা মা'র কথা শুনে এষা ভাল করেই বুঝল তাকে নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। সীমা কিছু করেছে—কি করেছে তা রেবা, বিনু কেউই বলে না। অথচ তিনজন একসঙ্গে বসে প্রায়ই কথাটথা বলে।

পরদিন দুপুরেই কাণ্ডটা ঘটল।

দুপুরবেলা, যখন সবাই ঘুমোচ্ছে, তখন গল্পের বই আনতে নিচে গিয়েছিল এষা। কিছু মনে না ভেবেই সে বাইরের ঘরের দরজাটা খোলে।

সীমা আর একটি অপরিচিত ছেলে। সীমার হাত ধরে ছেলেটি কি যেন বলে যাচ্ছে, সীমার চোখে জল। ওরা এষাকে দেখবার আগেই এষা শুনল ছেলেটির গলায় অনুনয়, 'তুমি চিঠি দেবে, আমি চিঠি দেব গোপালের কাছে, একটা বছর যেমন করে

হোক কেটে যাবে। জীবনেও ভুলতে পারব না তোমায়, বিশ্বাস কর···!'

এষাকে দেখে দু'জনেই চমকে ওঠে।

'এষা!' সীমা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। ছেলেটি পালাবার পথ খোঁজে। মফঃস্বলের ছেলে, কোমরে জড়িয়ে ধুতি পরা, শার্টের ওপর ছোট উড়ুনি।

হঠাৎ ভয় পেয়ে যায় এষা। সীমা তার দিকে মিনতিভরা চোখ তুলে কি যেন বলছে। মনে হয় এটা সীমাদির আরেকটা ষড়যন্ত্র। ওর চিঠির ব্যাপারে এষা একটা কথা বলেছে, তাই বাবা, মা'র কত দুশ্চিন্তা! আবার এখন কি যেন একটা হবে।

এষা অসহায় বোধ করে। ছুটে চলে যায় ওপরে। মাকে ডেকে তোলে ঘুম থেকে। বোকার মতো কাঁদে, আর বলে, 'আমি জানি না, আমার দোষ নেই।'

তারপর যা যা ঘটে গেল, সবই যেন অদ্ভুত, চেনাজানার বাইরে। সীমাকে বকতে গিয়ে এষার মা নিজেই অপ্রস্তুত হলেন। সীমার মুখে কোনো কথা নেই। সে শুধু কাঁদল বিছানায় শুয়ে। এষার মা বার বার বললেন, 'আমার মুখ রাখলে না সীমা।'

এষার বাবা অবশ্য বিশেষ বিচলিত হলেন না। আস্তে বললেন, 'মোহিতদা নিজেই আসবেন লিখেছিলেন, আরো তাড়াতাড়ি আসতে লিখে দিই। রেবা, বিনু, ওরাও চলে যাক। আমার কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছে এষার পক্ষে ওদের সঙ্গটা খুব ভাল নয়।'

এ-কথা বললে অন্য সময়ে এষার মা ঝগড়া করতে ছাড়তেন না। রেবা, বিনু সবাই তাঁরই ভাইঝি, বোনঝি। ওঁদের মন্দ বলা মানে তাঁকে মন্দ বলা, এই সব পুরনো কথার পুঁটলি খুলে বসেন।

এখন কিছুই বললেন না। সীমার ব্যবহারে তিনি নিজেও ভয় পেয়েছেন। এত শান্ত এবং নিরাপদ পরিবেশে বাস করেন তিনি,

চারপাশের আবহাওয়া এতই স্থির, অচঞ্চল, যে সীমার ব্যাপারটা সেখানে রীতিমতো একটা উপদ্রব বললেই হয়।

'মোহিতদা আসছেন,' বলে এষার বাবা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ছাত্রজীবনের পর আর দেখেন নি তাঁকে। সম্পর্কে ভায়রাভাই হবার পরেও দেখেন নি। বগুড়া যে এমন একটা দূরের জায়গা তা নয়, তবে বিনে কারণে ঠাঁইনাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ানো কমজনেরই হয়ে ওঠে।

দেখেন নি বলে মোহিতদা সম্পর্কে উজ্জ্বল, রঙিন ধারণাগুলো অম্লান ছিল এষার বাবার। মোহিতের ছাত্রজীবন, তেজস্বিতা, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া এ-সব নিয়ে যেন এষার বাবা নিজেই গর্ব অনুভব করতেন। এমনভাবে গল্প করতেন যে এষাও মনে মনে ভাবত মোহিত একজন দেশপ্রেমিক, তেজস্বী লোক।

সেই মোহিতদা আসছেন। যদিও আসবার উপলক্ষটি ভাল নয়। তবু সতীশের এখানে তাঁর এই প্রথম আসা। সতীশ বললেন, 'খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ভাল ক'রো। ওঁরা জেলখাটা লোক। জেলে একবার যা করেছিলেন···'

আবার সতীশ তাঁর পুরনো গল্পগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। রাজবন্দীদের মধ্যে বাজি ধরে সেই মাছমাংস খাওয়ার গল্প। মোহিতদা'র কথা শুনে সায়েব সুপারের সেই প্রশংসা এ-সব গল্প আবার শুনল এষা। বাবা বললেন, 'মোহিতদা আসুন, তারপর খবর দেব আমাদের সমসাময়িক দু'চারজন বন্ধুবান্ধবকে। খুশি হবেন সবাই।'

মোহিত বগুড়া থেকে আসতে না আসতেই অবশ্য সতীশের মোহভঙ্গ ঘটল। মোহিত এলেন ঘোড়ার গাড়িতে আধময়লা ধুতি কোট, পানের কৌটো, টিনের বাক্সে জরদগব হ'য়ে। এসে সতীশ নেই দেখে যেন বড়ই আশ্বস্ত হলেন। খবরের কাগজে একটি ভিজে গামছা জড়ানো ছিল। এষা তাঁকে প্রণাম করতে, বহুক্ষণ তিনি

মুখের এদিক থেকে ওদিক অবধি একটি বৃহৎ হাসি ধরে রাখলেন। তারপর বললেন, 'গামছাটা মেলে দাও।'

এষার মা'র দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "ট্রেনে চড়লে মাথা বনবন্ করে ঘোরে। তাই শান্তাহার থেকেই গামছা বেঁধে নিয়েছিলাম।'

কি জন্যে এসেছেন, কেন চিঠি লিখেছিলেন সে-সব কথা কিছুই না তুলে তিনি এষার মা'র কাছে, রান্নাঘরের দরজায় মোড়া পেতে বসলেন। অনেক ভাণতা-টনিতা করে যে কথা বললেন, তার সারার্থ হচ্ছে বর্তমানে মোহিত বিব্রত। সতীশ যদি তাঁকে কিছু টাকা না দেন, তবে মোহিত এ যাত্রায় সীমার বিয়ে দিতে পারবেন না।

এষা তখনো ঘোরাঘুরি করছিল। মোহিতের প্রশস্ত পিঠে বড় ফোড়া, ছোট ব্রণ, অসংখ্য ঘামাচি মিলে বিজ্ঞান বইয়ে চাঁদের গা'র ছবির মতো দেখাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই মোহিত এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলেন। নিশ্বাস ফেলে বলছিলেন 'সুখের সংসার, তার চেহারাই আলাদা।' এষা বোধ হয় তখনো একেবারে আশা হারায় নি। পুরনো দেশপ্রেমিকের ছিটেফোঁটাও আছে কি না কোথাও, দেখবার জন্যে সে মোহিতের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল। তার দৃষ্টিতে—শ্রদ্ধা।

কিন্তু সেদিকে কোনোই নজর ছিল না মোহিতের। তিনি তাঁর পুকুর পাড়ের কলাবাগানের দখলী মামলার এক অতিদীর্ঘ, ক্রমশ বিবরণ ফেঁদে বসে এষার মা'র ধৈর্য ক্ষয় করছিলেন। এমনি সময় এষা তাঁর হাতে অটোগ্রাফ খাতা দেয়।

'ই কি, ই কি, আমায় খাতা দেওয়া কেন?' বলে তিনি একটু হাসেন। কিন্তু খাতা কেড়ে নেন ক্ষিপ্রহাতে। স্পষ্ট বোঝা যায়, দেশকর্মী বলে মফঃস্বলের তরুণ সমাজে খাতা সই করে তাঁর অভ্যাস আছে। কলম নিয়ে খসখস করে লিখে দেন।

'ওরে জাগ্‌রে জাগ্‌রে জাগ্‌
তন্দ্রার ঘরে গেলি কি ভুলে রে,
মা আমাদের সিংহবাহিনী ?'

মুচকি হেসে এষাকে বলেন, 'আসবে, আমাদের দিন—ঐ এল বলে, সবে তো যুদ্ধের দু'বছর। এরাও যাবে, আমাদেরও সুদিন আসবে!'

কথাটি অসমাপ্ত রেখে তিনি জানালা দিয়ে চেয়ে থাকেন বাইরের দিকে।—যেন তাঁর ঐ সুদিন জানালা দিয়ে হঠাৎ ঢুকবে।

সতীশ আসবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাঁর ভোল পালটে যায়। ভয়ানক চটে ওঠেন মোহিত। ক্ষুব্ধ গলায় জানান সীমার সঙ্গে এ ছেলের ভাব বহুদিনের। আশা করেছিলেন সতীশ সীমাকে সামলে রাখতে পারবেন।

'তোমার যদি নজর থাকবে ভায়া, তবে ইন ইওর প্রেমিসেস্‌ সে ছেলে ট্রেস্‌পাস করে কি ক'রে?' বলে ঘন ঘন পায়চারি করতে থাকেন। সীমাকে কদর্য গাল দিয়ে বলেন, 'এবার চল্‌ তুই, তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব।'

তারপরই টাকা চান সতীশের কাছে। তাঁর সম্পর্কে বহুদিন ধরে লালিত উজ্জ্বল ধারণা সব ভেঙে যাওয়াতে সতীশ যে কিছুটা বিমূঢ়, তা মোহিত মোটেই বোঝেন না।

'সীমার বিয়ে বলে কিছু দিও ভায়া', বলে মোহিত যে-ভাবে আবার হাসি বিস্তার করেন, তাতে বোঝা যায় লোকের কাছে চাওয়ার অভ্যাস তাঁর অনেকদিনের। কয়েক মিনিটের পরিচিতের কাছে হাত পাতা তাঁর কাছে ছেলেদের খাতায় দেশাত্মবোধক বাণী লেখার চেয়ে আরো অনেক সোজা।

পরদিনই টাকাপয়সা দিয়ে সতীশ বিদায় করে দেন মোহিতকে। যাবার সময়ে মোহিত কলকাতার মাছ, মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে যান। সীমা গাড়িতে ওঠে কাঁদতে কাঁদতে।

'তোর এ-ব্যবহারের কথা ভুলব না। দেখিস এর জন্যে তোর
কি হয় !' সীমা অভিশাপ দিয়ে যায় এষাকে।

তার পরে পরেই রেবা এবং বিনুও চলে গেল। হঠাৎ, মোহিত
সম্পর্কে ধাক্কা খেয়ে নিরুৎসাহ হয়েই বোধহয় সতীশ সংসারের দিকে
ফিরে চাইলেন। 'এষা, ইস্কুলে ভর্তি করে দেব তোকে, স্কুলের
হস্টেলে থাকবি।'

এষার মা অবাক হলেন। এষাও কম অবাক হয় নি।

'কেন, হস্টেলে কেন ?'

'না না, দূরে যাওয়াই ভাল। বাড়িতে থেকে ভাল হচ্ছে না
কিছু।' সতীশ মাথা নাড়লেন।

বর্ষার দুপুরে, বাবার ঘরে বসে বসে এষার মনে পড়ল সব
কয়েক দিন বাদেই সে হস্টেলে যাবে।

হঠাৎ নিচে কে কড়া নাড়ল।

॥ ৩ ॥

কড়া নাড়ল দরজায়, নেমে গেল এষা।

কোঁকড়া চুল, হাসিমাখা ঠোঁট, সপ্রশ্ন চাহনি। ছেলেটি আস্তে
বলল, 'এটা সতীশ রায়ের বাড়ি ?'

গলা গম্ভীর, একটু বেশি ভারি ! এষা মাথা নাড়ল। সে অবাক
হয়ে গাড়িটা দেখছিল।

'তাঁর স্ত্রীকে একটু খবর দিলে ভাল হয়', ছেলেটি হাতে ঘড়ি
দেখল, 'বললেই হবে অনিমেষ এসেছে।'

গাড়ির দিকে চেয়ে বলল, 'এবার তোমরাও নামতে পার। পৌঁছে
গেছি।'

এতক্ষণে এষা দেখল গাড়িতে আর একটি যুবক, তার পাশে

একটি মেয়ে। ওপর থেকে নেমে এলেন মা, চাকরকে ডেকে তোলা হল ঘুম থেকে। এষা অবাক হয়ে অনিমেষকে দেখছিল।

'এই, আমি তোমার দাদা হই, কি রকম দাদা জিগ্যেস ক'রো না। চট করে বলতে পারব না। তারচেয়ে চল ভেতরে যাওয়া যাক।' অনিমেষ এষার দিকে চেয়ে হাসল। এষা লজ্জা পেল।

'কি, অনিমেষ, সম্পর্ক নেই বলছ কেন?'

এই প্রথম দেখা গেল এষার মা একটু বিব্রত হলেন। চট করে মনে পড়ল না সম্পর্ক। হেসে বললেন, 'সম্পর্ক দুদিক দিয়েই, তবে তোমার মাকে আমরা ছোটবেলা বোন বলেই মনে করতাম। এরা কে?'

'আমার বন্ধু কনক, ওর বোন বিভা।'

'ভেতরে আসতে বল।'

'না, এখন ওরা ভেতরে আসবে না ছবিমাসি। রায়পুর থেকে আসছি আমি, লম্বা রাস্তা, তাই স্টেশনে গিয়েছিল।'

'এখানেই থাক তোমরা?' এষার মা সৌজন্য করলেন।

'হ্যাঁ, ল্যান্সডাউন টেরাস। পরে আসব বরং।' বিভার গলাটা খসখসে, একটু চাপা। কিন্তু কাঁধ অবধি কাটা চুল, এক হাতে ঘড়ি, মাদ্রাজী শাড়ির সবুজ আঁচল, এষা চোখ ফেরাতে পারল না।

একতলার মাঝের ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হল অনিমেষকে। টেবিলে বইয়ের স্তূপ ঢেলে দিল অনিমেষ, কোণের তেপায়ায় রাখল গ্রামোফোন। বলল, 'আস্তে আস্তে গুছিয়ে নেওয়া যাবে'খন। কি বল—তোমার নাম কি?'

'এষা।'

'আমি অনিমেষ। আমার নামটার মধ্যে তোমার নামের প্রতিধ্বনি আছে।'

এষা লক্ষ্য করল অনিমেষ অনেক বড় তার চেয়ে, কোন না বারো তেরো বছরের বড় হবে, কিন্তু এষার সঙ্গে কথা বলে, ঠিক যেন বড়দের সঙ্গে কথা বলছে।

'কি ভাবছিলে ওপরে বসে এষা? নিচে আমরা গাড়ি থামিয়ে তোমায় দেখাছিলাম। বিভা বললে এই বাড়িটাই হবে।'

এষার মার দিকে চেয়ে 'আপনার মেয়ে খুব ফুটফুটে হয়েছে।' বলতে বলতে অনিমেষ একটা ড্রেসিং গাউন বের করে আলনার হুকে ঝোলাল, দু'তিন জোড়া জুতো বের করে রাখল কোনায়। অনিমেষের চোখে মোটা শেলের চশমা, দামী জামাকাপড়ে সুন্দর গন্ধ, ওর মৃদু, বিনীত কথা বলবার ভঙ্গী সব কিছু অবাক করে দিল এষাকে।

'আপনার আর ছেলেমেয়েরা কোথায়? আমার ভাল লাগে বাচ্ছাদের, সত্যি?'

ক্যামেরা বের করলে, আবার ঢোকাল। ক্যামেরা, টর্চ, অনেকগুলো বিলেতী মাসিকপত্র। ব্যস্ত হয়ে ছবি বললেন, 'এখন এসব থাক অনিমেষ, তুমি একটু বিশ্রাম কর।'

'যা বলেছেন। এখন দরকার এক পেয়ালা চা, এষা তুমি চা করতে পার?'

তারপর কি মনে পড়তে অনিমেষ বলল, 'আপনি ইচ্ছে হলেই আমাকে অনী বলে ডাকতে পারেন। বাড়িতে সবাই আমায় তাইই বলে। জিনিসপত্র এখন গোছাব না।'

'হাজার হলেও দু'বছরের জন্যে আসা। গোছাবার সময় অনেক পাব। কি বল এষা?'

'দু'বছরের জন্যে?'

'হ্যাঁ। দু'বছর পড়ে হায়ার অ্যাকউন্টেন্সি পাস করলে বাবার অফিসে ঢুকতে পারব।'

সতীশ শুনে একটু অবাক হলেন। বললেন, 'বিজয়বাবুর সঙ্গে কাজ করবে? তুমি না নাগপুর থেকে ইতিহাসে প্রথম হয়েছিলে?'

'তা হয়েছিলাম।'

'তবে ?'

'বাবার ছেলেরা কেউই আগ্রহ দেখাল না। দাদা হল মেরিন ইঞ্জিনীয়ার, মেজদা গেল ব্যবসা করতে। আমার বেলা হঠাৎ বাবা ঢালাও হুকুম দিলেন অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে হবে। দাদাদের বেলা খুব একটা মাথা ঘামান নি। আমরা বলতে গেলে একটু অবাক হয়েছিলাম। টাকা রোজগার করা ছাড়া আর কোনো দিকে বাবার মন ছিল বলে আমরা জানতাম না।'

অনিমেষের গলাটা একটু বিষণ্ণ শোনাল। তারপর সে হাসল। বলল, 'আপনার এখানে থাকবার ব্যবস্থাও বাবা করেছেন। আমি জানতাম না। ক্রমে ক্রমে সবই জানবেন। আমি ওঁর অবাধ্য ছেলে। তবু দু'বছরের জন্যে সব কিছু মাথা পেতে নিয়েছি মেসোমশায়।'

'ভালই করেছ।'

'আমার নিজেরও স্বার্থ আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।'

সতীশ বললেন, 'তোমার বাবা আমায় চাকরি পেতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আছে।'

'আপনার কথা ইদানীং আমায় অনেক শুনতে হয়েছে। যা ভাল লাগে তাই করলেই সব সময় ভাল হয় না। এ. জি. অফিসে অডিট-অফিসার হয়ে ঢুকেছিলেন বলেই আপনার এত উন্নতি হয়েছে।'

'উন্নতি!' মাথায় হাত বুলিয়ে সতীশ হাসতে চেষ্টা করলেন। অনিমেষ তাঁর চোখের মৃদু বিষণ্ণতা, সুকুমার হাতের অসহায় ভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। সতীশ বোঝেন নি তাঁর নিঃসঙ্গতা অনিমেষের চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছে। তিনি আস্তে বললেন, 'আমি মাস্টার হতে চেয়েছিলাম অনিমেষ। ইচ্ছে ছিল কলেজে পড়াব, আর কি ভেবেছিলাম জান? ভেবেছিলাম মন্দিরস্থাপত্য নিয়ে কাজটাজ করব।'

'শুনেছি।'

'এ চাকরি নিতে এতটুকু ইচ্ছে ছিল না আমার। কিন্তু মা ছিলেন, তাঁর দিকে চেয়ে শেষ অবধি ঢুকে পড়লাম কেরানিগিরিতে। না—অনিমেষ, খুব নিচু চাকরিতে ঢুকে পড়ে অফিসের পরীক্ষায় পাস করে করে তবে ওপরে উঠেছি। মন থেকে খুব তৃপ্তি পেয়েছি সে-কথা বলব না, তবে ঐ যা বললাম, অভ্যাসে সব হয়।'

বলতে বলতেই সতীশের মনে হল, এ-সব কথা অনিমেষকে বলা ঠিক হচ্ছে না।

'আমার কথায় কান দিও না অনিমেষ,' বলতে বলতে তিনি উঠে পড়লেন। তাঁর মনের কোণে কিছু কিছু প্রশ্ন লেগেই রইল। বিজয় মিত্র রায়পুরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মানুষ। কৃতী এবং কর্মবীর। জীবিত কালেই নিজের নামে রাস্তার নামকরণ করেছেন। মধ্যপ্রদেশের শহরটিতে তাঁর বিষয় বৈভবের খ্যাতি আছে। ও অঞ্চলে যে মানীগুণী লোক বেড়াতে যান, যে কোনো সরকারী কর্মচারী, দেশনেতা, সায়েবসুবো, সবাই তাঁর বাড়িতে ওঠেন। তাঁর ছোট ছেলে হয়ে অনিমেষ কেন কোনো মতে রোজগার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল, কেন তিনিও হঠাৎ সতীশকে লিখে ছেলেকে কলকাতা পাঠালেন এ-সব প্রশ্ন সতীশের মনে রয়ে গেল। অথচ কোনো প্রশ্ন করলেন না। স্বভাব-গত সৌজন্য তাঁকে বাধা দিল।

অনিমেষ আসতে এ-বাড়ির আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তন এল।

এতদিন এ-বাড়িতে বাইরের লোক অনেক এসেছে, বাস করেছে, কিন্তু অনিমেষ এল সম্পূর্ণ বাইরের, একটা অচেনা জগৎ থেকে। এতদিন এ-বাড়িতে খাওয়াদাওয়া ওঠাবসার মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না কোনো, সতীশ একলা ছিলেন ব্যতিক্রম। চা চিরদিন চাকর করে দিয়ে আসে যার যার ঘরে। জলখাবার তৈরি হলে ঠাকুর ডাক দেয়, যে যার মতো গিয়ে খেয়ে আসে।

বাড়িতে লোকজন অতিথি আগন্তুকের অভাব কোনো দিনই

হয় নি। এষার মা ভালবাসেন তাঁদের সঙ্গে বসে অনেক বেলা অবধি গড়িয়ে গড়িয়ে গল্প করতে—খেতে। ছেলেমেয়েদের অবধি নিয়ম শৃঙ্খলা শেখান নি কোনো দিন। মাঝে মাঝে উৎসাহভরে একই দিনে অনেক কাজ ফেঁদে বসেন। ঝুল ঝাড়বেন, বাড়ি গোছাবেন, মাস কাবারের জিনিসপত্র তুলবেন, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় গোছাবেন। ফলে বেলা হয়ে যায়, জিনিসপত্র স্তূপাকার হয়ে গড়াগড়ি যায়, ছেলেদের খাওয়া হয় না।

সুশৃঙ্খলভাবে জীবন চালাবার মধ্যেও যে আনন্দ আছে তা যেন বিশ্বাসই করতে চান না এষার মা। কে যেন তাঁকে বিয়ের আগে বলেছিলেন, 'পাখির মতো মুক্ত তুমি, কলস্বরা, বন্ধন তোমার জন্যে নয়।' ঠাট্টা করেছিলেন কি না কে জানে। কিন্তু সেই থেকে এষার মা'র মাথায় কিছু কিছু উচ্চ ধারণার ফানুস গজিয়ে যায়। পাখিরা শুধু ছুটে বেড়ায় না, তারা নীড়ও বাঁধে। কিন্তু সে সব এষার মা লক্ষ্য করেন নি। নিয়ম মানা মানেই যেন দাসত্ব করা, এই তাঁর ধারণা দাঁড়ায়। প্রতিটি দিন যেন পিকনিক বা উৎসবের দিন, এই ভাবে সময় কাটাতেই অভ্যস্ত হয়ে যান তিনি।

ফলে ভাল মন্দ দুই-ই হয়।

ভালর মধ্যে, লাভের খাতায় এই দেখা যায়, যে এষার মা'র চেহারায়, স্বভাবে, মিষ্টি হাসিতে কচি ঝলমলে ভাবটি থেকে যায়। আর সবগুলোই ক্ষতি বলে ধরা যেতে পারে, আসবাবে ধুলো, চালের টিনে আরশালা, সংসারে অসন্তোষ।

কিন্তু এষার মা'কেও সচকিত হতে হল। একদিন তিনি অবাক হয়ে দেখলেন টেবিলে চা হচ্ছে। এষা চা ঢেলে পরিবেশন করছে সবাইকে। কাঁচের বাসনগুলোও চেনা চেনা মনে হল।

আরো অবাক হলেন, যখন সতীশ অবধি এসে বসলেন সেখানে। অনিমেষ আর সতীশ দু'জনে উপস্থিত থাকতে আপনা থেকেই ছেলেমেয়েরা শান্ত হয়ে বসল, কম কথা বলল। সতীশ একটু হেসে

বললেন, 'দেখলে তো ছবি, তুমি যা পার নি এষা তাই পারল।' ছোটখাটো ঘর গৃহস্থালির কাজে এষার মন দেখা গেল। কোথায় কোন দেরাজে তোলা ছিল সুন্দর পর্দা, দেওয়ালে টাঙাবার ছবি, ফুলদানি সব টেনে বের করল সে।

'সুন্দর হচ্ছে এষা,' অনিমেষ উৎসাহ দিল। সতীশ খুশি হয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে এষা তার ঠাকুরমা'র স্বভাবটা পেয়েছে। জান অনিমেষ, ভারী সুন্দর রুচি ছিল মা'র। আমার যত উৎসাহ সব তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।'

এষার এত উৎসাহের পেছনে ছিল ছোট্ট একটি কারণ।

সেদিন বিভা এসেছিল হঠাৎ দুপুরবেলা। অনিমেষ বেরোয় নি, তার অল্প জ্বর হয়েছিল।

এষা এসেছিল কি কাজে, হঠাৎ অনিমেষ বলল, 'বস এষা, একটু গল্প করি।'

কথায় কথায় এষা প্রশ্ন করে, 'অনিমেষদা, আপনার মা আছেন? বোন নেই বুঝি?' এমনি আরো কতকগুলো প্রশ্ন, রায়পুরের বাড়ি কিরকম, একথা কি সত্যি, অনিমেষদের বাড়িতে অনেকগুলো কুকুর আছে, চড়বার ঘোড়া?

'হ্যাঁ এষা, মা আছেন, তিনি ভীষণ, ভীষণ ব্যস্ত মহিলা,' অনিমেষ একটু হাসে। হাসলে কারুর চোখে মুখে এত দুঃখ ফুটে ওঠে তা এষা জানত না।

'মা কুকুর পোষেন, গোলাপ চাষ করেন, একজিবিশানে সে-সব দেখান, আবার সিমলা বম্বেতে মেডেল নিতে যান। মা'র নাম তুমি জান না এষা, তাঁর ছবি যে-সব কাগজে বেরোয় সে-সব কাগজ তুমি দেখ নি।'

মা'র ছবি কাগজে বেরোয়? এষা অবাক হল।

'মা, বলতে গেলে ছমাস রায়পুরে থাকেন না। হ্যাঁ, একজন আছেন রায়পুরে, তিনি আমার বাবা। তাঁর অবশ্য সবই আছে,

গাড়ি, ঘোড়া, কুকুর। বড় বড় শিকারী কুকুর। অবশ্য তারা বাবাকে বেশি ভয় পায়, না আমরা, সেটা ভেবে দেখবার কথা।'

'বাবাকে আপনি খুব ভয় পান অনিমেষদা ?'

'না, এষা। আমি বোধহয় অতটা ভয় পাই না। তুমি জান না ভয়ানক সাহস আমার' অনিমেষ গম্ভীর হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। এষার মনে হল অনিমেষের জন্যে কিছু একটা করে। কি করতে পারে সে ? অনেক ভেবে সে জিগোস করে, 'অনিমেষদা চা খাবেন ?'

'চা ?'

'হ্যাঁ অনিমেষদা। আমি করে আনছি। উনোনে জল চাপানো থাকেই, কোনো অসুবিধে হবে না। আমি চা করতে পারি সত্যি বলছি।'

'যাঃ ছবিমাসিই পারেন না, তুমি পারবে !'

এমন সময়ে বিভা ঢুকল ঘরে। বলল, 'কি ব্যাপার বলত ? কনক চিঠি পেল তোমার, কি, জ্বর হয়েছে ?'

'একটু। বেশ ভাল হয়েছে বিভা, তুমি এসে পড়েছ। এষা তুমি ওকে সব এনে-টেনে দাও, ও চা করবে।'

এষা ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হল, একটু অবাক। বিভার ছাই রঙের গরদ শাড়ি, গলার সরু হার, কাঁধ অবধি চুল, সব কিছু থেকে অচেনা সুরভি উঠছে। চোখ বুজে আসতে চায় এমনই তীব্র গন্ধ। বিভা চা করবে !

এষাকে অবাক করে বিভা গুছিয়ে চা করল। চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'পেয়ালাগুলো সাবান জলে ধুয়ে নিও এষা, পেয়ালার সঙ্গে মানানসই প্লেট কিনে নিতে বল মা'কে, আর, চা-টা কেটলিতে না ভিজিয়ে টি-পটে ভিজিও, কেমন ?'

বিভা মিষ্টি হাসল। অনিমেষ বললে, 'ওকে বলে কি হবে বিভা ? এষা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু, এ-বাড়িতে···এদের ঠিক···' হাত নেড়ে কি বলতে গিয়ে সে চুপ করে গেল।

'হ্যাঁ।' বিভা গম্ভীর মন্তব্য করল। চারদিকে চেয়ে বলল, একদিন এসে তোমার ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে যাব।'

'বাড়িটা কিন্তু সুন্দর।'

'হ্যাঁ, যদিও সেটা চট করে বোঝা মুশকিল।'

এষার মনের কোথায় যেন এই সুন্দর, অচেনা শৌখিন মেয়েটির প্রতি বিদ্বেষ জমে ওঠে। বেরিয়ে যেতে যেতে সে শোনে বিভা গলা নিচু করে বলছে, 'অনিমেষ, ইরা এসেছে।'

'ইরা এসেছে।' অনিমেষের গলা বিস্ময়ে তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। তারপর দুজনের গলা নিচু। দ্রুত কথা, দুজনেই উত্তেজিত, বিভা বিব্রত।

সেদিনই এষা যেন বুঝল অনিমেষ, বিভা, ওরা এ-বাড়ির অনেক কিছুই অসুন্দর মনে করে।

সেই জন্যেই এষা হঠাৎ বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইল। ফলে একটা লাভ হল এই যে হস্টেলে যাওয়াটা পিছিয়ে গেল অনির্দিষ্ট কালের জন্যে।

॥ ৪ ॥

হস্টেলে যাওয়া পিছিয়ে গেল, হঠাৎ একদিকে এ-বাড়ির সকলের কাছে বড্ড প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল এষা, তাকে ছাড়া চলল না কারো। মণি, কনক, হীরক এসে জিগ্যেস করল, 'সকালে কি খাব তা কি তুমি বলে দেবে দিদি?'

বিব্রত সতীশ জানতে চাইলেন বড় আলমারি কোন চাবিতে খোলে, ঠাকুর বলল, 'ভাঁড়ার বের করে দাও।' মানদা জলভরা চোখে এসে বলল, 'আমার হাত-পা আসছে না দিদি, কিছু করতে পারছি না মন দিয়ে।'

এষার মা তখন হাসপাতালে।

জ্ঞান ছিল না তাঁর, কানে যাচ্ছিল না কোনো কথা। ডাক্তার নার্স, সবাই ঘিরে ছিল তাঁকে। বাইরে করিডোরে লম্বা ছায়া পড়েছে, সরে যাচ্ছে। সতীশ পায়চারি করছিলেন, অনিমেষ রেলিঙে দাঁড়িয়ে, অচঞ্চল, স্থির। সতীশ মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে তাকাচ্ছিলেন স্ত্রীর মাসতুতো ভাই বনিদা এবং বুলবুল বউদির দিকে। রোগী দেখতে এসে তাঁরা কথা বলে যাচ্ছেন। গলা নিচু করে। নিঃসন্তান দম্পতি, থাকেন কুচবিহার। মাঝে মাঝে কলকাতা আসেন হইহই করতে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল শুধু অন্তরে নয়, বাইরেও। দুজনের বয়স হয়েছে, লাল টুকটুকে বেঁটে মোটা চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখ, ভেতর থেকে আনন্দ উপচে পড়ছে। তাঁদের মধ্যে মনের মিল অসাধারণ প্রায় আদর্শ বললেও হয়। বাইরে, জনারণ্যে গিয়েও তাঁরা শুধু দুজনে দুজনের সঙ্গে গল্প করেন। এখনো তাই করছেন। দেখলে মনে হতে পারে দীর্ঘ অদর্শনের পর এই যা দেখা, কিন্তু বনিদা এবং বুলবুল বউদির মধ্যে বিচ্ছেদ কখনো হয় না, পাঁচ মিনিটের জন্যেও না।

সতীশের ঘন ঘন চাহনির উত্তাপ তাঁরা টের পাচ্ছিলেন কিনা কে জানে।

'ট্যু ব্যাড! ছবির এ-রকম হল।'

'কে জানে ছবি আসলে এরকম ভিতু!'

'হঠাৎ হয়ে গেল আর কি!'

'খারাপ লাগছে, খুব খারাপ লাগছে আমার।'

বুলবুল নাক টানলেন, 'সতীশ হয়তো আমার উপর কতই রাগ করেছ!'

'কি যে বল বুলবুল!'

বলে উঠে গেলেন বনিদা। ডাক্তারদের একজনকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে বললেন, 'অল রাইট তো।' চেয়ে রইলেন আশায়

আশায়। তাঁর স্বভাব দায়িত্বহীন, অপরিণত, ফুর্তিবাজ। এই তো হল, ছবির বিপদ হয়েছে, ট্যু ব্যাড, তবে এই তো এলাম আমরা, এতক্ষণ নিচু গলায় কথা বলেছি। সময়োচিত গাম্ভীর্য দেখিয়েছি, কিন্তু এখন আর কেন. এই গোছের ভাবখানা।

ডাক্তার তাঁর দিকে তাকালেন. সংক্ষিপ্ত কথায় বললেন, 'এখন বলা যাচ্ছে না কিছু, আপনারা কথা বলে কাজে ব্যাঘাত ঘটাবেন না, প্লীজ !'

বনিদা'র কষ্ট হল নিজের জন্যে। হয়তো এখনো তাঁর এখানে থাকা উচিত। কিন্তু বাইরে খেতে যাবেন, দোকানে কেনাকাটা আছে, রাতে থিয়েটারের টিকিট করা হয়ে গেছে, কি করে সতীশের সামনে গিয়ে যাবার কথা বলবেন ?

'ওঁরা চলে গেলে পারেন।' অনিমেষ আস্তে বলল।

'ও, হ্যাঁ, নিশ্চয়।' বিব্রত হলেন সতীশ। হাঁফছেড়ে বাঁচলেন দুজনে, অমনি উঠে পড়লেন, মেসে গেলেন।

'এগারোটা বাজল।' সতীশ আস্তে বললেন। বাতাসে তখনো বুলবুলের জামার এসেন্সের গন্ধ লেগে আছে, ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর।

যদিও ওঁদের ওপর রাগ করা তাঁর পক্ষে অর্থহীন, অসঙ্গত অনিমেষের তাই মনে হল। প্রত্যেক মানুষের মতোই ওঁরাও নিজ নিজ স্বভাব এবং অভ্যাসের দাস। ভদ্রলোক, ঐ বনিদা ধরেই নিয়েছেন কুচবিহারটা কাজের জায়গা, কলকাতা স্ফূর্তির। কুচবিহারে বসে বসে ওঁরা শুধু টাকাই জমান না, উদ্যমও জমাতে থাকেন। ওখানে না কি পাই পয়সা হিসেব ক'রে বাঁচেন, আলোর পলতেটি অবধি মেপে মেপে উস্কে দেন। যাতে তেল না পোড়ে।

শ্যামাপোকা না কি দেওয়ালির পিদিমে পুড়ে মরবে বলেই যত্ন করে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে, ওরাও নিজেদের কলকাতায় অপব্যয় করবেন বলেই তোড়জোড় করেন। এখানে এসে আর হাঁটতে তর সয়না, ট্যাক্সি থাকে সঙ্গে। তারপর কলকাতার এ প্রান্ত থেকে

ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ান। সবগুলো ছবি দেখা চাই, থিয়েটার, সার্কাস। প্রতিটি সাজানো দোকান দেখলেই নবোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বনিদা'র মতো কম লোকই জানে কলকাতার অন্ধিসন্ধি। সাহেব পাড়ায় পানদোক্তা খেতে হলে ক্যামাক স্ট্রীটে কোথায় আছে চিন্তামণি সাহুর দোকান, গেরস্থের বাস ভবানীপুরের কোন গলিতে পাওয়া যায় অমৃত-বিনিন্দিত তেলেভাজা, এসব তাঁর নখদর্পণে।

যদিও তাঁদের মুখের লালচে আভা, চোখের ঘোলাটে অস্বাস্থ্য দেখে অনিমেষের সন্দেহ হয় এখন ওঁরা আনন্দ করেন স্বভাব বশে, শরীরে বিশেষ সইছে না।

কাল ছবিমাসিকে নিয়ে ওঁরা বেরিয়ে ছিলেন দুপুরে। মাঝ রাতে ছবি দেখে ফিটন চড়ে বেড়াবার শখ হয়েছিল ওঁদের। ছবিমাসির বোঝা উচিত ছিল শরীরের অবস্থা, তাঁর মুখের ফ্যাকাসে ভাব, চেহারায় নরম আভা দেখে অনিমেষের নিজের বুঝতে বাকি থাকে নি কিছু। কিন্তু ছবিমাসি নিজেও কম হইচইবাজ নন। স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে গেলেন সব ফেলে রেখে, বলে গেলেন 'তোমরা খেয়ে-টেয়ে নিও।'

কিন্তু রাত বারোটার পর কাউকেই বিশ্বাস করা চলে না। কলকাতার রাত বড় খেয়ালী, বেহিসেবী, দায়িত্বহীন। অনিমেষ নিজে দেখেছে চৌরঙ্গীর রাতের রাস্তায় কি অদ্ভুত নেশা আছে, হাঁটতে হাঁটতে এই সেদিনই। 'ইনটক্সিকেটিং, ইট গেট্স ইন ইওর ব্লাড,' প্রৌঢ় সায়েব, হয়তো নাবিক, অথবা ভবঘুরে, অথবা চা-এর স্পেকুলেটর, বর্তমানে রয়্যাল এক্সচেঞ্জের কৃপায় সর্বস্বান্ত, মিউজিয়মের উল্টোদিকের একমাত্র লাইট পোস্টকে জড়িয়ে, গায়ে হেলান রেখে আস্তে বলছিল, মাতাল চোখে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে। অনিমেষ দেখছিল আশেপাশে আর কেউ নেই, রাস্তা নির্জন, পুলিশ অবধি চোখে পড়ে না। সায়েব নেশায় ভুরভুরে। শুঁড়ির দোকান কাছে নেই, মোহময়ী নিশীথিনী সম্ভবত সায়েবের রক্ত নিয়ে খেলা করছিল।

এমন রাতে ক্লান্ত বৃদ্ধ কোচোয়ান, এবং বিরক্ত নিদ্রাতুর ঘোড়া, সামনে দীর্ঘ রাস্তা, বনিদা এবং বুলবুল বউদির শখ হল গাড়ি ছোটাতে হবে। কোচোয়ানের চাবুক পিঠে পড়তেই ঘোড়া গেল ক্ষেপে। ছুটতে ছুটতে অনেক বড় কোনো কাণ্ড ঘটতে পারত, কলকাতায় মাঝে মাঝেই এমন দুর্ঘটনা হয়। থিয়েটার রোডের কাছাকাছি বিখ্যাত অ্যাক্সিডেণ্ট কর্নার, যেখানে ফি বছর চমকপ্রদ কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে, সবাই বলে ঐ তিনমাথাওয়ালা লাইট পোস্টটা ভূতুড়ে, অপয়া, সেখানে ধাক্কা খেয়ে তবে ঘোড়াটা থামল, বিরাট দুর্ঘটনা বাঁচল।

সেই রাতে ঘোড়া জোয়াল থেকে খোলা, কোচোয়ানকে ধমক-ধামক করা, ট্যাক্সি খুঁজে বাড়ি ফেরা, সব সারতে অনেক রাত। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই ছবিমাসি শরীর খারাপ লাগছে ব'লে পড়ে গেলেন। এমন অবস্থায় সতীশের মতো ধীর স্থির লোকও হতভম্ব হয়ে গেলেন। অনিমেষই বলল, 'হাসপাতালে নিয়ে চলুন।'

তারপর অনেকক্ষণ কেটেছে। অপারেশন হয়ে গেছে, কিন্তু ডাক্তাররা যতই বলুন স্ত্রীর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত সতীশ বাড়ি ফিরতে নারাজ। অনিমেষ আগ্রহ সহকারে তাঁকে লক্ষ্য করে। সতীশ এবং তাঁর স্ত্রী, প্রত্যেকের জীবনে তাঁদের দেখে মনে হয়েছে স্বভাবে রুচিতে দু'জনের মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান। এমন কি, অনিমেষের এমনও মনে হয়েছে সতীশের কাছে তাঁর স্ত্রী প্রয়োজনীয় নন। সঙ্গী, বন্ধু সচিব কিছুই নন তিনি, শুধু মাত্র স্ত্রী।

অথচ, এখন মনে হল সতীশ স্ত্রী-কে খুব ভালবাসেন। ওঁর অসুস্থতায় তিনি অসহায়। সর্বদা যে মানুষকে মনে হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ এখন তিনি বড়ই অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত, কেন না ছবিমাসি মাদ্রাজী শাড়ি পরে বনিদা, বুলবুল বউদির সঙ্গে বেড়াতে যাবার পরিণাম স্বরূপ ঐ ঘরে শুয়ে আছেন।

'প্রয়োজন কি বুঝে পাই না, ওভাবে বেড়িয়ে কি সুখ পায়।'

অনিমেষ আস্তে বলল, 'মেসোমশায়, ডাক্তার সেন বলছেন বাড়ি ঘুরে আসতে পারেন।'

'না অনী, এ কি বলছ তুমি···'

সতীশের চেহারায় একটা দোষী দোষী ভাব, নিজেকে ক্ষমা করতে পারছেন না।

অনিমেষের এখন মনে হল সতীশ বয়সে বড় হলে কি হবে, বড় কম বোঝেন। হয়তো এখনো উনি মনে মনে ভাবছেন, ওঁর কোনো রকম সতর্কতার অভাবেই এমনটা ঘটল। হয়তো উনি এখনো জানেন না যা ঘটবার তা ঘটে, যদিও কেন ঘটল তার অনেক রকমে যুক্তি, ব্যাখ্যা এবং কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

আরো মনে হল সে যত জনকে এ পর্যন্ত দেখেছে, তাদের সকলের মতোই সতীশও মানুষ নন, মানুষের ভগ্নাংশ মাত্র। অনেক কিছুই মনে পড়ে না তাঁর। এখন শুধু স্ত্রীর কথাই ভাবছেন, অথচ বাড়িতে ছোটদের রেখে এসেছেন, হীরকের বয়স মাত্রই সাড়ে তিন। আত্মীয় না, স্বজন না কয়েকটি মাইনে-করা কাজের লোক মাত্র, আর এ বাড়িতে এসে অনিমেষ যা দেখেছে, লোকজনকে ছবিমাসি তেমন আপন করে নিতে পারেননি। ছেলেমেয়েদের কথাও সতীশের মনে হওয়া উচিত ছিল। মানুষ অবশ্য ক্বচিৎ কদাচ নিখুঁত হয়। অনিমেষ মনে মনে যত আশাই রাখুক, নিটোল সুন্দর সুপারণত কোনোদিন হবে না মানুষ, অন্তত তার চেনাশোনার পরিধিতে নয়।

'আপনি তা হলে থাকুন, আমি বাড়ি যাই।'

'তুমি যাবে অনী?'

'হ্যাঁ। দুজনে এখানে আটকে থেকে লাভ নেই। ওরা একা আছে, এষা ছেলেমানুষ।'

'তা বটে, তোমারও বেরোনো হল না আজ।'

'কই আর হল।'

একটু হেসে বেরিয়ে এল অনিমেষ। এতক্ষণে ক্লান্ত লাগছে খুব, মাথা ধরে উঠছে। এই ঘনঘন মাথাধরাটা আর গেল না। হয়তো চোখের জন্য ধরে, অথবা অন্য কোনো কারণে, অনিমেষ একটা রিকশা ডাকল।

এষা কেঁদে কেটে চোখ লাল করে ফেলেছে, বাড়ির চেহারা অবিন্যস্ত, এলোমেলো। মানদার সঙ্গে একজন মোটাসোটা মহিলা কথা বলছেন, ফর্সা সুন্দর চেহারা, বয়স্ক, বড়ই কথা বলেন।

'এখন কেমন আছে?' উৎসুক হয়ে তাকালেন। বোঝা গেল অনিমেষের জবাব পেয়ে একটু নিরাশ হলেন। এ ধরনের আপদ-বিপদের আকস্মিক খবর তাঁদের নিথর জীবন একটু চঞ্চল হয়।

তিনি বললেন, 'মণি, কনক, হীরক, সবাই ঘুমোচ্ছে দেখে গেলাম, পরে খবর নেব!'

'ওরা খেয়েছে মানদা?'

মানদা হাত উলটে দেখাল। যেহেতু সে এ বাড়ির পুরনো ঝি, সে হেতু এমন অবস্থায় তারও বসে বসে দুঃখ করার অধিকার আছে এই ভাবখানা।

'খেয়েছে। আমি খাইয়ে দিয়েছি।'

এষা বলল।

'লক্ষ্মী মেয়ে। সেদিন বলেছিল চা করবে, এখন আমার জন্য এক পেয়ালা চা করে আন দেখি।'

'এখন চা করব? অনেক বেলা হয়েছে না?'

'হোকগে। চা খাই নি বলেই মাথা ধরেছে। আমায় চা দিয়েই তুমি স্নান করে নেবে। আমরা একসঙ্গে খাব। লক্ষ্মণ, তুমি ঘরটর সব পরিষ্কার করে রাখ। মানদা, বিকেলে ওরা কি খাবে ব্যবস্থা করো।'

'ঠাকুর আমাকে মনে করিয়ে দিও, রাতের রান্নার কথা বলে দেব।'

'মা: বিকেলে আসবে না অনীদা?'

'না এষা। কিছুই হয় নি তোমার মা'র। ব্যথা লেগেছে বলে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকবেন। তা' বলে বাড়িতে সবাই নোংরা হয়ে থেকে লাভ কি।'

'নোংরা!' এষা অপ্রস্তুত হয়ে তার জামা দেখল, চুল উষ্কখুষ্ক।

অনিমেষ আস্তে বলল, 'তোমার দোষ নেই এষা। নিয়মিত সুন্দর জীবন যাপন করবার মধ্যে আনন্দও আছে। তোমাকে কেউ শেখায় নি, তাই জান না। যাও স্নান করতে যাও।'

তার প্রতিটি কথা এষা কি আগ্রহে শোনে তা এইমাত্র দেখেছে অনিমেষ, তার দুঃখ হল, গভীর মমতা। এষা তার প্রিয় হবার জন্যে কত যত্ন করে সে কথা অনিমেষের অজানা নয়। সেই সঙ্গে গোপন আনন্দ, মনের মতো ক'রে কাউকে গড়ে তোলে এ অনিমেষের অনেকদিনের সাধ।

সেদিন রাতেই অনিমেষ এষাকে ইরার কথা বলল।

'খুব শখ ছিল ইরাকে আমার মনের মতো ক'রে গড়ে তুলি।'

'কেন?'

একদিনে খুব বড় হয়ে গেছে এষা, সংসারের অনেক দায় নেমে এসেছে তার ওপর। সতীশ এসেছেন বিকেলে, আবার গেছেন। বড় হয়ে গেছে এষা, তাই বাবা না ফেরা অবধি জেগে থাকার অনুমতি পেয়েছে। মনে মনে একটা ভয়ও আছে। মা যদি না ফিরে আসে, যদি মলির মা'র মতো মরে যায়। মানদার কাছে গিয়ে সে বসেছিল। কিন্তু মানদা, 'একদিন সকলেই চোখ বুজবে মা। সংসারকে কলা দেখিয়ে চলে যাবে ড্যাঙডেঙিয়ে, দু'দিন আগে আর পরে' বলে হোঃ করে একটি বড় নিশ্বাস ফেলে আঁচল পেতে ঘুমিয়ে পড়ল। তাই অনিমেষের পাশে আরেকটা চেয়ারে বারান্দায় বসল এষা।

'কেন অনীদা ?' এষা আবার জিগ্যেস করল।

'আমার যে খুব ইচ্ছে করে এষা। কিন্তু জান, ইরা এমন নিখুঁত যে ওকে শেখাবার কিছুই নেই আমার।'

'ইরা কে অনীদা ?'

'ইরা ? ও, ইরা হচ্ছে বিভার মাসতুতো বোন।'

'খুব সুন্দর বুঝি ?'

'আস্‌লে দেখ।'

'এখানে আসবেন ?'

'আমি বললেই আসবে। কিন্তু আমি ওকে আসতে বলব না। ও এলে আমার বড় অসুবিধে হয়, গোলমাল হয়ে যায় সব। তারচেয়ে ও রায়পুরে থাকাই ভাল।'

'উনিও রায়পুরে থাকেন ?' এষার কৌতূহল আবার জেগে উঠল। রায়পুর বলতে কোনো সুনির্দিষ্ট ছবি মনে হয় না তার। বড় বড় ঘর, অনেক কুকুর, রাগী, রাশভারি বাবা, এ পর্যন্ত সে বুঝতে পারে। কিন্তু অনিমেষের মা কুকুর পোষেন, গোলাপ ফুটিয়ে সিমলা থেকে মেডেল আনেন এগুলো ঠিক বুঝতে পারে না। এখন রায়পুরে মনগড়া ছবিতে একটি নতুন, অদেখা মুখ যুক্ত হল, ইরার মুখ।

'রায়পুর ছাড়া আর কোথায় যাবে বল !'

'সেদিন যে বললেন উনি কলকাতায় এসেছেন !'

ক'দিনের জন্যে। ওকে ছাড়া এখন মা'র চলে না। অথচ, ক্যাপ্টেন নন্দী, ইরার বাবা, যখন মারা গেলেন তখন মা-ই আপত্তি তোলেন, ওকে থাকতে দেব না। প্রথমটা ঠিক না বলতে পারেন নি। হাজার হলেও, ইরার মা মা'র বন্ধু ছিলেন। বাবাকে বললেন কয়েকদিনের জন্যে ইরাকে আনছি। ওর জন্যে অন্য একটা ব্যবস্থা ক'রো। অথচ, এমন মজা, কদিনেই ইরা একেবারে মা'র সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠল। এখন ও কাছে থাকবে না বললে মা-ই

আপত্তি করেন। কিন্তু এষা, এ-সব কথা থাক। যাদের তুমি চেন না তাদের কথা শুনতে ভাল লাগবে কেন, আমারই অন্যায়।'

'আমার শুনতে ভাল লাগে,' এষা চোখ থেকে ঘুম তাড়িয়ে বলল।

'কি?'

'সব।' এষা আস্তে বলল। তারপরই ঘুমিয়ে পড়ল চেয়ারের ওপর। এখন অনিমেষ দেখল এষার সমস্ত শরীর ঢেলে ঘুম নেমেছে, হাত ঝুলে পড়েছে পাশে। এখন ওকে এত ছোট দেখাচ্ছে, দেখলে মমতা হয়। ঠিক ছোট নেই, অথচ বড়ও হয় নি। উষা এবং প্রভাতের মাঝামাঝি সময়টির নিষ্পাপ সৌন্দর্যে এখন ওকে আরো সুকুমার, হালকা দেখাচ্ছে।

অনেক রাতে সতীশ এলেন। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা, চোখের নিচে কালি। বললেন, 'ছবি ভাল আছে অনী। ক্রাইসিস ওভার। তুমি অনেক করলে। আজ তুমি না থাকলে· · ···'

'স্নান করবেন মেসোমশাই?'

'স্নান? এত রাতে?'

সতীশ আশ্চর্য হলেন। তারপর অনিমেষের দিকে চাইলেন। হাসিতে জ্বলজ্বল করল তাঁর চোখ, ঘন ভ্রূ নেচে উঠল। বললেন, 'হোয়াই নট?'

'আমিও তো তাই বলি। স্নান করুন।'

জামাকাপড় ছেড়ে ফেললেন সতীশ। তাঁর মুখ এবং হাতের চেয়ে শরীর অনেক ফর্সা। শরীরে এখনো তারুণ্য লেগে আছে, মনে হল বয়সের ভার ঝরে গেছে অনেক।

'পাঁচ মিনিটে আসছি!' সতীশ চেঁচিয়ে বললেন। জল ঢালবার শব্দ পাওয়া গেল। অনিমেষের মনে পড়ল তার বাবা বলেন এক সময়ে সতীশ ছিলেন ভাল টেনিস খেলিয়ে, গান গাইতে পারতেন, মেলামেশার কায়দা জানতেন, তাতেও সুনাম ছিল, অথচ সবটাই

ছিল বাঙালীয়ানায় পরিপূর্ণ। যারা ভাবে ও-সব গুণ থাকা মানেই বিলিতী কেতায় মানুষ হওয়া তারা বড়ই অনভিজ্ঞ। জীবনের কম দিকই দেখেছে।

স্নান করে এলেন সতীশ। সাবানের গন্ধে ভুরভুর করছে, বড় তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে খেতে বসলেন, 'একি তুমি খাও নি?'

অবাক হলেন খুব।

'আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'সবাই ঘুমোচ্ছে!'

'হ্যাঁ। এষা অনেকক্ষণ জেগে ছিল।'

'জেগেছিল, তাই না অনী!'

'অনেকক্ষণ।'

'জেগেছিল!' অবাক হয়ে বললেন সতীশ। তাঁর চোখ সপ্রশ্ন বিব্রত। মৃদু ধিক্কারে বললেন, 'আমি আমার নিজের মেয়েকেই চিনি না। ওর মা'র অসুখ হলে ও জেগে থাকবে কি না তাও আমার অজানা।'

'অজানা হয়ে থাকতে হয়তো আপনার ভাল লাগে।'

'ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, সংসারে সবাই আমরা হয়তো অতিথি হয়েই বাস করি, কি যেন বইয়ে পড়েছিলাম, অতিথির মতো ভদ্র হয়ে বাস কর সংসারে, ভদ্রভাবে বিদায় নিও, তুমি নিজে ছাড়া কেউই তোমার আপনার নয়।'

'আমি জানি, কিন্তু আমার ভাল লাগে না।' অনিমেষ আস্তে বাটি টেনে নিল, মাংস এখনো গরম আছে।

'কি ভাল লাগে না?'

'এই অতিথি হয়ে ভদ্রভাবে বাস করা, বাইরের ঘরে, ইচ্ছে করে দেওয়াল সরিয়ে ভেতরে ঢুকে যাই।'

'যেমন আমি ঢুকেছি!'

'না, আপনার মতো নয়।'

'তবে !'

'আমার নিজের মতো।'

সতীশ ওর দিকে চাইলেন। বললেন, 'অনিমেষ, তোমার সঙ্গে আমি অনেক কথা বললাম।'

'সবাই বলে।'

'সবাই বলে !'

'হ্যাঁ।' অনিমেষ উঠে বাসনকোসন সরাতে লাগল। সতীশ দেখতে পেলেন ওর প্রতিটি কাজ সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন আঙুল নাড়াচাড়া অবধি ধীর স্থির, যেন নিজেকে ও আয়ত্তে এনেছে, শাসনে রেখেছে।

'সবাই আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে। দাদা, মেজদা, বউদিরা, মা, আমি সবচেয়ে ধৈর্য ধরে শুনি।'

'বাবা !'

'বাবা আমার সঙ্গে কেন, কারো সঙ্গে-ই বিশেষ কথা বলেন না।'

'আমি ওঁকে অনেকদিন দেখি নি !' সতীশ যেন ওর বাবার বিষয়ে সম্যক জানেন না. অথচ প্রশ্ন করে ফেলেছেন সে জন্যে মাপ চাইলেন অনিমেষের কাছে। তারপর অবাক হয়ে বললেন. 'অনী, তোমাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। এমন করে টেবিল পরিষ্কার করতে তুমি শিখলে কোথায় ?'

'নিজে নিজেই। ছোটবেলা থেকে করেছি তো !'

'ছোটবেলা থেকে !' সতীশের হঠাৎ যেন বুকে ধাক্কা লাগল, বেদনার অনুভূতি। এমন করে অনুভূতির প্লাবনে ভেসে যেতেন অল্প বয়সে, বন্ধুর জন্যে প্রাণ দিতে ইচ্ছে হত। সাধ যেত জগৎ সংসারের সব চোখের জল মুছিয়ে দেন। অনিমেষের দিকে চেয়ে এখন মনে হল ওকে যে সব সময়ে এত বড়, বয়স্ক, পরিণত মনে হয় তার পেছনে সংসারের কি নিষ্ঠুরতার ইতিহাস আছে তা তিনি জানেন না।

'ছোটবেলা থেকে। সংসারের কাজ তো কারুকে কারুকে করতে হবে মেসোমশায়। আমাদের বাড়িতে লোকজন অনেক। কিন্তু চালাবার কেউ ছিল না। তাই আমিই করতাম। অকর্মণ্যতা, ঢিলেঢালা ভাব কোনোদিন ভাল লাগে না আমার। কোনো বিষয়ে শিথিলতা বাবাও পছন্দ করেন না। কিন্তু আমাকে উনি বরাবরই অপছন্দ করেছেন, আশ্চর্য !'

দুজনে এসে বসলেন অনিমেষের ঘরে।

'অথচ আস্তে আস্তে বাড়ির অনেক ভারই আমাকে নিতে হয়েছে, এখন অবশ্য বড় বউদি আসবার পর আমি ছুটি পেয়েছি।'

'রণজয়ের স্ত্রী !' সতীশের ভাসা ভাসা মনে পড়ে, বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে বিজয় মিত্র খুব খুশি হন নি। যদিও, বউ বাছাই করে-ছিলেন নিজেই।

'হ্যাঁ। বেচারী বউদি ! আমাদের বাড়িতে সাত বছর ধরেও সকলের মন পাবার আশায় নিজেকে বদলিয়েছে। সর্বদা তটস্থ হয়ে থেকেছে ওর কোথায় ভুলচুক হল বলে। অথচ, এমন দুর্ভাগ্য ওর, বাড়ির কেউই ওকে মন থেকে নিতে পারল না, এক এই হতভাগা আমি ছাড়া।'

অনিমেষ হাসল। বলল, আমি ওকে বউভাতের দিনই বলেছিলাম, বউদি, বাড়ির সকলকে দেখে তুমি অবাক হয়ে গেছ তো? কিছু ভয় পেও না। তুমি যেমনটি আছ তেমনিই থেক। আমরা কিছুতেই তোমায় মন দেব না। একটুও আপন করে পাবে না তুমি আমাদের। মিছেমিছি চেষ্টা করে যদি নিজেকেও হারাও তা'হলে তোমার ডবল লোকসান। আমাকে সবাই ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল সেদিন। এখন বউদিকে আমি সেকথা মনে করিয়ে দিই আর হাসি।'

সতীশের বার বার মনে হল এত নিষ্করুণ ওদের বাড়ি, মায়া মমতাহীন ওরা, তা তিনি আগে জানেন নি কেন ?

তিনি শুধু অবাক হলেন, ও বাড়িতে অনিমেষ জন্মাল, বড় হল, এত অন্য রকম হল কেমন করে।

'আমার বাবার বয়স বাষট্টি মেসোমশায়, মা'র ছাপ্পান্ন। বড়দা'র বয়স ছত্রিশ, মেজদা'র চৌত্রিশ। ওঁরা সবাই এখনো কি ইয়ং আছেন। বাবা এখনো টেনিস খেলেন। মা'র মুখে একটি ভাঁজ পড়ে নি। বড়দা মেজদা দুজনেই রোজ আঠারো ঘণ্টা ছুটোছুটি কাজকর্মের উপর থাকেন। বউদির এতদিনে ছাব্বিশ বছর বয়স। কিন্তু ও বেচারাই বুড়িয়ে গেছে সবার আগে। কুণাল আর মায়া, ওর ছেলেমেয়ে পর্যন্ত তা বুঝতে পারে। অথচ ওরা তো কতই ছোট। কিন্তু আর কথা নয়, আপনি শুতে যান।'

'তুমি শুতে যাবে না?'

'এই তো যাই।'

'শুয়ে পড় অনী।' হঠাৎ কি মনে হল সতীশের। ওর পিঠে হাত রাখলেন। সসঙ্কোচে বললেন, তোমার যখন ইচ্ছে হবে আমার সঙ্গে কথা ব'ল।'

ওপরে উঠে এলেন সতীশ। নিজের বিছানায় শুলেন। এখন তাঁর ঘুমোনো দরকার। কিন্তু অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে যেন শরীরের ভেতরটা দপদপ করছে।

ছবির সাদা মুখ মনে পড়ল। ডাক্তারের অসন্তুষ্ট চাহনি, সতীশ লজ্জা পেয়েছেন। ভগবান জানেন কতবার সতীশ বলেছেন স্ত্রীর প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে। কিন্তু এখন, ছবি ভাল আছেন জেনে তাঁর উদ্বেগের অবসান হওয়া উচিত, চোখে ঘুম নেমে আসা দরকার, ঘুম নামতে আর বাধা নেই কোনো। কাল থেকে যতবার চোখ বুজতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর আর ঘুমের মাঝখানে স্থির হয়ে থেকেছে ছবির সাদা মুখের চেহারা। চোখের চারধারে হলদে, অসুস্থ আভা কপালে লেপটে থাকা চুল। তবু এখন ঘুম আসছে না।

অনিমেষ কেউ নয় তাঁর, রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু ওকে

ভালবাসতে ইচ্ছে করছে খুব, মনে হচ্ছে ওরও ভালবাসা দরকার।

জানেন না, তিনি জানেন না কিছুই। কেমন ওদের পরিবার, ঠিক কি ধরনের। শুধু এটুকু বুঝতে পারছেন অনিমেষের এখানে আসবার পেছনে কোনো কারণ আছে, হয় তো কোনো গোপন দুঃখ। কোনোদিন যদি জানতে পারেন, তবে সতীশ যথাসাধ্য সাহায্য করবেন ওকে।

এ-কথা মনে করতেই নিজেকে ঠাট্টা করে চেঁচিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে হল। তিনি সাহায্য করবেন! তাঁর নিজের জীবনটাই একটা মস্ত বড় গোলকধাঁধা। জটিল অঙ্ক, যে অঙ্কের জবাব সতীশ জানেন না। এখন নিঃশব্দ বাড়িতে ঘড়ির টিকটিক শব্দ, সময় চলে যাচ্ছে। সতীশ জানেন না তাঁর দোষে, অথবা দুর্ভাগ্যে, অথবা নিয়তির ষড়যন্ত্রে, কোনো একদিন তিনি সরে এলেন নিজের গড়া সংসার থেকে। এখন সে কথা ভাবলেই কষ্ট হয়, সময় চলে গেছে, ঘড়ির শব্দ। সময় চলে গেছে, ছবি অসুস্থ। সময় নেই, কিন্তু এখন ঘুম আসুক।

॥ ৫ ॥

অনিমেষ ঘুমোয় নি।

এমন না ঘুমিয়ে অনেক রাত কেটে যায় তার। রায়পুরের বাড়ির প্রশস্ত ছাতে, চাঁদের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় লম্বা ছায়া ফেলে ঘোরা তার অনেক দিনের অভ্যেস। সে হাঁটত, ছায়া লম্বা হত, সে বসত, ছায়া স্থির হত, আশ্চর্য ভাল লাগত তার। একদিন অমনি হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ চোখ পড়েছিল বাইরের দিকে, বাগানে। বাগানে জল দেবার কুয়োর পাড়ে বসে যে মেয়েটি কাঁদছিল তাকে অনিমেষ চেনে।

রাত তখন অনেক।

'বৌদি, ঘরে যাও, ওঠ। কেউ জানে না তুমি উঠে এসেছ।'

জানলে খুব মুশকিল হত। এ বাড়ির সবাই এমন ধাতুতে গড়া, যে এমন করে এত রাতে বসে থাকা যে খারাপ দেখায় তা কেউই বলত না। শুধু কাঁদতে দেখে অবাক হত সবাই। এ বাড়ির লোকরা কেউ কান্নায় বিশ্বাস করে না. এদের ধারণা বিহ্বল বা অভিভূত হয়ে পড়ার আরেক নাম দুর্বলতা। দুর্বলতাকে এরা বড় ঘেন্না করে।

'তোমায় কাঁদতে দেখলে···'

'তোমার দাদা আরো দূরে সরে যাবে। কিন্তু অনী, তুমিই বল, এমন করে কি চলে? দিনের পর দিন. মাসের পর মাস, দিনের পর দিন···'

'না, তুমি চোখ মোছ। এ-রকম প্যানপেনে মেয়ের সঙ্গে কথা বলা যায় না।'

'একা তুমি ছাড়া অনী···'

'সব দোষ তোমার। তোমাকে তো সেই কবে বলেছিলাম কিছুতে পালটিও না নিজেকে, ওদের মন পাবার জন্যে চেষ্টা করবার কোনো দরকার নেই। এখন দেখছ তো, নিজেকেও হারালে, এদেরও পেলে না।'

'নিজেকে হারাতে অনী, এতটুকু আপত্তি ছিল না আমার। হারাবার কথা কি বলছ, নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেও আপত্তি করতাম না আমি যদি···'

'নিশ্চিহ্ন তো করেই দিয়েছ বৌদি। তোমার নিজের বলতে আর কি বাকি আছে বল?'

'এখন শুনছি কুণাল আর মায়াকে হস্টেলে পাঠিয়ে দিতে চান মা। তোমার দাদা তো খুব খুশি।'

'হয়তো সে জন্যে আমিই দায়ী। যে ছেলে দুটো হস্টেলে ছিল তারা মানুষ হল, আমি হলাম অপদার্থ, মা'র কাছে শুনে থাকবে।'

'ওরা থাকবে না—ভাবলে আমার ভয় হয়। তখন আমি কি নিয়ে থাকব অনী? এত ক্লান্ত লাগে সব সময়, যেন কত বয়স হয়ে গেছে, মনে একটু আনন্দ নেই।'

'তা তো হবেই বউদি। সাত বছর হতে না হতেই সব উদ্যম ফুরিয়ে ফেললে, ভেবেছিলে জোরে ছুটলেই পথের শেষে পৌঁছবে। এখন দেখছ গোলকধাঁধা ধরে ঘুরছিলে তাই কোথাও পৌঁছও নি, বুড়ো তো হবেই!'

'অথচ আমার বয়স অনী···'

'আমারই বয়সী। তুমি ওঠ বউদি। কুণালদের হস্টেলে যেতে হবে না, আমি মাকে বলব।'

মাকে বলে অনিমেষ। নিলীনা বাগানে বসে তাঁর মাদ্রাজী চাকরকে কুকুরের স্নানের কথা বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর মাথার চুল কাঁচাপাকা, দীর্ঘ সবল গৌরবর্ণ শরীর নীল শাড়িতে ঢাকা, শুধু প্রসাধন নয়, স্বাস্থ্যও নিলীনা মিত্রকে সুন্দর রেখেছে। তাঁর আশে পাশে ঘাসের ওপর বড় ছোট এগারোটি কুকুর শুয়ে বসে ছিল।

'অনী!' তিনি অবাক হয়ে বললেন। 'সকালে আজকাল কোথায় থাক? চা-এর টেবিলে আস না?'

'ঘুমোই। তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

'ও, এক মিনিট।' চাকরকে আরো কি কি নির্দেশ দিলেন নিলীনা, বললেন, 'বল।'

'কুণাল আর মায়াকে হস্টেলে পাঠিও না মা। ওদের মা বড় কান্নাকাটি করছে।'

'কে লতা?' অবাক হয়ে গেলেন নিলীনা, 'কেন, কাঁদছে কেন?'

'বোধহয় ওদের ছেড়ে দিতে চাচ্ছে না হস্টেলে।'

'কিন্তু কেন? লতা এত গোলমাল বাধায়!'

'তবু মা, বউদি যখন চাচ্ছে না তখন থাক।'

'কেন চাইছে না, ওর যুক্তিটা কি?'

'ওর ভাল লাগে না।'

'কি ওর ভাল লাগে জানি না অনী। শুধু ভালবাসে বসে বসে কাঁদতে।'

'কেন কাঁদে তা কখনো ভেবে দেখ নি মা?'

'জানি না। রণির কোনো দোষ-টোষ নেই, নেশাও করে না।'

'হয়তো সেটাই সব নয় মা, হয়তো বউদি আরো কিছু চায়।'

নিলীনা চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'জানি, তুমি ভালবাসার কথা বলবে। কিন্তু অনী, রণি লতাকে ভালবাসে না সেটা কি আমার দোষ? আমি জানি, তুমি মনে কর সেটাও আমার দোষ।'

'তোমায় আমি দোষী মনে করি?'

'কর না? সব সময়ে বুঝতে পারি আমি, তুমি দোষ দিচ্ছ আমাকে, দোষ খুঁজছ আমার ব্যবহারে, কিন্তু কেন বলত? রণি, অজি তোমার দাদাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমায় এত 'কিন্তু' হতে হয় না।'

'তুমি ভাল করেই জান, আমি ওদের চেয়ে অনেক অনেক ভাল ছেলে!' অনিমেষ হাসল।

'তোমায় ছোটবেলায় তাই-ই ভেবেছিলাম!' নিলীনা মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

অচেনা, ছোট ছেলে তাঁর একেবারেই অচেনা, তাই ওর সঙ্গে কথা বলতে এত কষ্ট হয় তাঁর।

'আমার ছোটবেলার কথা তোমার মনে আছে?'

'আছে বই কি, ও অনী, বিরক্ত ক'র না, কি কি কাজের কথা বলব ভেবেছিলাম সব গুলিয়ে গেল।'

'বউদিকে তাহলে কি বলব মা!'

'লতাকে? ও, বেশ তো কুণাল মায়াকে যদি ও বাইরে পাঠাতে না চায়, না পাঠাল। আমি কেন জোর করতে যাব?'

'তুমি কি রাগ করলে, মা ?'

'রাগ করব কেন ?'

'করলে পারতে। আমার মনে হয় মাঝে মাঝে তুমি খুব রাগ করলে, খুব মন খারাপ করলে, আবার আনন্দও করলে—এরকম করলে পার।'

'আজ তোমার কি হয়েছে অনী ?'

'কার কি হল ?' ওদিক থেকে রণজয় জিজ্ঞেস করল, অনিমেষের দাদা। শিকার করতে গিয়ে তার কাঁধে লেগেছিল। এখনো একটা হাত ঝুলিয়ে বাঁধা, নইলে কাঁধে ব্যথা হবে। অল্প টাক পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফর্সা, বলিষ্ঠ চেহারা, ঠোঁট বড় বেশি পাতলা সোজা, একটু নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর দেখায়।

'কার কি হল ?' রণজয় আবার জিগ্যেস করল।

'আমার। মা জিগ্যেস করছেন আমার কি হয়েছে।'

'কি হয়েছে, তোমার ?'

'মাথা খারাপ হয়েছে, অথবা ইচ্ছে করে পাগল হয়ে দেখছি, বাড়িসুদ্ধ তোমরা সবাই বড্ড বেশি সুস্থ, স্বাভাবিক, এতটা স্বাভাবিকতাকে এক ধরনের অসুস্থতা বলতে পারি, ভুল হয় না।'

লতার কাছে গেল অনিমেষ। লতা ছেলেমেয়েদের খাওয়াচ্ছিল সামনে বসে, অনিমেষ সেখানে বসে পড়ল।

'কাকু !' কুণাল খুশি হয়ে বলল। অনিমেষ এ বাড়ির বড়দের মধ্যে একমাত্র লোক যার মনে থাকে এ বাড়িতে দুটো ছোট ছেলেমেয়ে আছে।

'কি কাকু ! শোন বউদি, কুণাল মায়া এখানেই পড়বে। বাবা স্কুলে এত টাকা দিচ্ছেন এত বছর ধরে, আমাদের বাড়ির কেউই সেখানে পড়ল না সেটা ভাল না, কি বল !'

লতা একটু হাসল। তারপরই ভয় পেয়ে বলল, 'মা রাগ করেন নি তো ?'

'না। আমার মা খুব ভাল, কখনো রাগ করেন না। রাগ করে সাধারণ লোক। মা কি সাধারণ? কিন্তু রাগ করলেন কি না, খুশি হলেন কি না, এসব আর ভেব না। মেজবউদি ইনা তোমার চেয়ে অনেক অনেক চালাক। যা হোক, এখন একটা কাজের কথা শুনবে?'

'কি?'

'আমাকে এ-সংসারের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি দাও বাপু, কিছু কিছু ভার নাও।'

'আমি ভার নেব!'

'হ্যাঁ বউদি। এ বাড়িতে সবাই চিরদিন সবকিছু চায় ঘড়ির কাঁটা ধরে চলুক, অথচ সেজন্যে এতটুকু পরিশ্রম করতে চায় না। এতদিন যে চলেছে সব, তার জন্যে ধন্যবাদ দিই চাকর-বাকর-গুলোকে। তৈরি লোক সব!'

'মা কি কিছু বলছেন?'

'মা কিছুই বলছেন না। আমি এখন কতটা দায়িত্ব নিয়েছি তা তিনি জানেন না। তুমি নিলেও জানবেন না। হয় তো, অনেকদিন বাদে চোখে পড়লে একটু ঠাট্টা করবেন। কিন্তু তাতে কি খুব এসে যাবে তোমার?'

'না অনী!'

'আমার এখন একটু ছুটিও দরকার।'

'কেন বল তো?'

'দেখ না, কিছুদিনের মধ্যে আমাকে নিয়ে কি অশান্তি বাধে এদের মধ্যে।'

'কেন অনী!'

বলতে গিয়েও বলল না অনী। অন্য কথা বলল, 'ভাগ্যে রাত জেগে জেগে ছাতে ঘুরে বেড়াই তাই তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম, কি বল!'

'হ্যাঁ।

'যে কাজ করতে গিয়েছিলে তা কখনো ক'রো না।'

'কি কাজ, অনী!'

'নিজেই জান। আমরা অতখানি ত্যাগের যোগ্য নই বউদি।'

আবার রাত জাগতে জাগতে একদিন তার কাছে উঠে এসেছিল ইরা। সে-রাতে অনিমেষের কাছে উঠে আসতে, কথা বলতে তার আশ্চর্য সাহসের দরকার হয়েছিল। ইরা জানত সে ও বাড়িতে আশ্রিত মাত্র। আশ্রিতের এতবড় স্পর্ধা নিলীনা মিত্র ক্ষমা না-ও করতে পারেন।

কিছু মনে রাখে নি সে। ছাদে উঠে এসেছিল, অনিমেষকে বলেছিল, 'তুমি কলকাতা যেও না অনী। আমার জন্যে তোমাদের সংসারে অনেক অশান্তি হবে, তার চেয়ে আমি চলে যাই।'

'কোথায় যাবে?'

'নিশ্চয় কোথাও না কোথাও জায়গা জুটবে। তা ছাড়া, আমি এখন কাজের চেষ্টাও করতে পারি। তোমার মা'র কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, কি বল।'

'আমার মা'র কাছে যা শিখেছ তার প্রয়োজন বাইরের সংসারে হয়তো খুব বেশি নেই ইরা।'

'তবু, আমার জন্যে তুমি···'

'বোকামি ক'রো না। যাও, নিচে যাও ইরা।'

'তুমি যাচ্ছ কেন?'

'তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই বলে। কথাটা তো খুব সহজ, বুঝতে পারছ না কেন?'

'দাঁড়াবার এমন কি তাড়া ছিল তোমার অনী?'

'তোমাকে বিয়েটা যখন করবই, অবশ্য তোমার যদি মত থাকে, সেটা অনেক দেরি ক'রে লাভ কি বল!'

'অনী !'

'ও, তোমায় বলতে ভুল হয়ে গেছে ইরা, ভুলে গেছি। এখন বলছি, তোমায় আমি ভালবাসি, বউদি জানেন।'

অনিমেষ হাসল।

'তুমি এখনো ঠাট্টা করছ। প্রায় সময়ে তুমি ঠাট্টা কর !'

'ঠাট্টা করি, হাসি, ব্যঙ্গ করি, কেননা এ বাড়িতে কারো সঙ্গে স্বাভাবিক হওয়া চলে না।

'ইনার সঙ্গে তো খুব গল্প কর।'

'নিশ্চয়। ইনা ভাল কথা বলে, দেখতে সুন্দর, চমৎকার টেনিস খেলে, এখানে প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানের ও প্রাণ !'

'জানি।'

'মা তোমায় সব সময়ে ইনার মতো হতে বলেন। কিন্তু আমি চাই না তুমি ইনার মতো হও।'

'কেন ?'

'তুমি তুমিই থাক। এ কথাটা আমি সবাইকে বলি। তাই তোমাকেও বললাম। কিন্তু তুমি নিচে যাও ইরা। এ ভাবে লুকিয়ে কথা বলতে আমার ভাল লাগে না।'

ইরা নেমে গেল। পরের দিন সকালে আর দেখা গেল না ইরাকে।

বউদি বললে, 'ওর ঠাণ্ডা লেগেছে অনী, জ্বর হয়েছে। ঠাণ্ডা লাগিয়েছে বলে মা ভীষণ রেগে গেছেন।'

'কেন ? জ্বরটা মা'র অনুমতি ছাড়াই হয়েছে বলে ?'

'তোমার যত উদ্ভটে কথা অনী। মা মোটেই ওরকম নন্ !'

'এই তো। যেই একটু নিজের মতো স্বচ্ছন্দ জীবন পেয়েছ অমনি আবার এদের মধ্যে ভাল ভাল গুণ আবিষ্কার করতে উঠে পড়ে লেগেছ।'

'যাকগে, আমি তোমার সঙ্গে কথায় পারব না। এখন আমার অনেক অনেক কাজ।'

'যেমন ?'

'শীতের জিনিস ধোয়াতে হবে। তোমার বাবা আজ ফিরছেন বম্বে থেকে তিন জন গেস্ট নিয়ে। তাঁদের জন্যে ঘরটর ঠিক করতে হবে।'

'নিজে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আমি তো চাকরদের ডেকে বলে দিয়েই কাজ সেরে দিতাম।'

'না, তোমার বাবা সব ঠিকমতো চান। নইলে রেগে যাবেন।'

'তোমায় কিছু বলবেন না। চাকরদের সবাইকে ধরে ছাঁটাই করবেন হয় তো !'

'বল না অনী, ভাবলে ভয় করে আমার।'

হেসে বউদি নিজের কাজে চলে গেল। অনিমেষ দেখছিল কয়েক দিনের মধ্যে ওর চেহারায় বেশ প্রফুল্লতা এসেছে, হাসি খুশি দেখাচ্ছে। 'কিন্তু বউদি, মা রাগ করছেন কেন তা বলে গেলে না ?'

ছুটে কাছে এল বউদি। এ বাড়িতে কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না কারো সঙ্গে, তাই সে বিপন্নমুখে বলল, 'কি কর !'

'বল না !'

'পরশু মা'র ফ্লাওয়ার শো আছে না ? কম কাজ পড়ে আছে না কি ?'

'ইনা কোথায় ?'

'ইনাকে মা বলেছেন বোধ হয়, কিন্তু ইরা সব ক'রে কর্মে দেয়, মা'র অসুবিধে হয় ওকে ছাড়া।'

অথচ, এখন অনিমেষ ভাবল, ইরাকে বাড়িতে আনবার আগে মা কত আপত্তিই করেছিলেন।

ইরাকে তার আগে খুব একটা দেখে নি অনিমেষ। ওরা থাকত
ালতে গেলে শহরের বাইরে। মাঝে মাঝে দেখা যেত সন্ধ্যার
অন্ধকারে ইরা বুকের কাছে ব্যাগ চেপে ধরে সন্তর্পণে বাজারের গায়ে
অনন্ত পূজারাদের বাড়ি যাচ্ছে।

পূজারাদের ছেলে যশপাল অনিমেষদের বন্ধু। তাকেই একদিন
জিগ্যেস করেছিল কে যেন, 'পাগলা কাপ্তেনের মেয়ে তোদের বাড়িতে
কেন আসে যশি ?'

'বেবিকে পড়ায়।'

'বেবি তো এখন বম্বেতে।'

'তবে হয়তো এটা সেটা বিক্রি করতে আসে। বাবাকে আঙ্কেল
বলে তো!'

'তোদের বাড়িতে এসে বিক্রি করে ?'

'নয়তো কি বাজারে হেঁটে হেঁটে বিক্রি করবে ?'

অনিমেষ অবাক হয়েছিল। কেন না অনন্ত পূজারা বেশ ধনী
কয়লা ব্যবসায়ী, কিন্তু তার চেয়ে তাঁর অনেক বেশি নাম দাতা
হিসেবে। সব রকম কাজে তিনি দান ধ্যান করেন। ছেলে যশপালের
ওপর যখনই রাগ হয় তখনই বলেন, 'দেব, সব চ্যারিটিতেই দেব। এ
শহরে এসেছিলাম আট হাত ধুতি পরে, জঙ্গলের রিঠাফল কুড়োবার
ঠিকাদারি নিয়ে! তোর জন্যে শেষ অবধি অমনি একটা আট হাতি
ধুতিই রেখে যাব।'

অনিমেষের বুঝতে বাকি থাকে নি আসলে অনন্ত পূজারা ক্যাপ্টেন
নন্দীকে সাহায্য করছেন।

সে নিলীনা মিত্রকে বলেছিল, 'এ শহরে এত লোকজন আছেন।
এত বাঙালী। কত জনের সঙ্গে তো ক্যাপ্টেন নন্দীর অনেক দিন
থেকে পরিচয়। কেউ সাহায্য করলেন না ওঁদের, শুধু অনন্ত পূজারা
সাহায্য করেন, এর মানে কি!'

'ব্রুট।'

একটি কথায় নিলীনা মিত্র ক্যাপ্টেন নন্দীর প্রতি রায়পুরের সব বাঙালীর মনোভাব জানিয়ে দিয়েছিলেন।

'ব্রুট। আরতিকে বলতে গেলে ও মেরে ফেলে!'

'মা!'

'তুমি জান না অনী,—আরতির মতো মেয়ে হয় না। সে আমাদের সকলের বন্ধু ছিল।'

রেগে গেলেই নিলীনা মিত্র ঘন ঘন উল বোনেন।

তাঁর কানের হীরে ঝিলিক দিতে থাকল, তিনি জোরে জোরে উল বুনতে লাগলেন।

'আমি শুনেছিলাম ওঁর স্ত্রী মারা যেতেই ক্যাপ্টেন নন্দী ও-রকম হয়ে গেলেন।'

'স্ত্রীকে যদি অতই ভালবাসবে সুধাংশু, তবে আরতি বেঁচে থাকবার সময়ে একটু বিবেচনা দেখালে পারত! কাজ ধরছে, ঝগড়া করে কাজ ছাড়ছে, যখন কাজ ছাড়া তোমার চলবে না, তখন তোমার অমন খামখেয়ালি করা উচিত নয়।'

'তা তো বটেই। স্বভাবের ওপর ওঁর হয়তো হাত ছিল না।'

'স্ত্রী যখন মারা গেল, তখন আবার অত ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়ে না ছাই! কাজ ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে মতো খ্যাপামি করবার ওটা একটা ছুতো। সকলকে দেখাতে চাইল, আরতিকে ও কতই ভালবাসত!'

'এখন ওদের চলে কি করে মা?'

'ভগবান জানেন!' মাথা নাড়লেন নিলীনা। তাঁর পাতলা অভিজাত ঠোঁট দুটি কঠোর হয়ে উঠল, বিচারক যেন পাপীকে শাস্তি দিচ্ছেন, 'ওদের কথা আমাদের চিন্তা করা উচিত নয়।'

'মা, এটা আমি বুঝি না।'

'কি বোঝ না?'

'ওরা হতভাগ্য, ওরা হয়তো খুব অন্যায় করেছে। কিন্তু আমরা না ভাবলেই সব ল্যাঠা চুকে গেল?'

'তা হলে কি করতে হবে? সুধাংশু আর তার মেয়েকে নিয়ে আসতে হবে এখানে?'

শহরে অন্যরা অবশ্য অনিমেষকে অন্য কথা বলল। ইরানে কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন নন্দী, যেখানে অয়েল ফিল্ড খোঁড়া হচ্ছিল। সেখানে বিস্ফোরণের শব্দে ওঁর মাথায় আঘাত লাগে, নার্ভাস ব্রেকডাউন মতো হয়। বেশ ভাল টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন।

তারপর কোনো কাজই আর করতে পারেন নি স্থির হয়ে। তাঁর শ্বশুর সুন্দর একটি বাড়ি দিয়েছিলেন মেয়ে জামাইকে। যতদিন কাজ করেছেন বা যখনই কাজ করেছেন, তখনই সুধাংশু নন্দী শৌখিনতার চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। এই রায়পুরে বসে তিনি নতুন মডেলের গাড়ি আনাতেন, স্ত্রীকে সাজাতেন নতুন নতুন শাড়িতে। ক্লাবের উৎসাহী সভ্য ছিলেন, সবাই ভালবাসত।

সবাই বলে, ওঁর স্ত্রী যখন মারা গেলেন তখন ওঁরও মারা যাওয়া উচিত ছিল। কেননা খুব তাড়াতাড়ি, প্রায় চার পাঁচ বছরের মধ্যে সব কিছু সুধাংশু নন্দীর দু'হাতের ফাঁক দিয়ে গলে পালিয়ে গেল। চাকরি, সঞ্চিত টাকাপয়সা। এমন কি নিজের স্বাস্থ্য।

আত্মীয়স্বজন আর কতদিন সাহায্য করতে পারেন! আস্তে আস্তে সবাই সরে গেলেন। তখন ইরা নন্দী ছোট ছিল, এখন বড় হয়েছে। রায়পুর শহরে উনিশ শো' উনচল্লিশ সালে বেরিয়ে গিয়ে রোজগার করবার কোনো পথই নেই।

এক স্কুলের কাজ ছাড়া। কিন্তু সিনিয়ার কেম্ব্রিজও পাস করে নি ইরা, কাজ করবে একটু বিদ্যে তার নেই। তাই সামান্য মেয়ে পড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই!

তাও করতে হয় লুকিয়ে। কেননা, অন্যদিকে কাপ্তেন নন্দী,

(শৌখিনতার জন্যে শহর তাঁকে 'কাপ্তেন' নাম দিয়েছিলেন, খ্যাপামির জন্যে 'পাগলা কাপ্তেন') ভয়ানক অহঙ্কারী মাথা গরম মানুষ। এই জন্যেই ইরাকে লুকিয়ে কাজ করতে হয়। এই জন্যেই সুধাংশু নন্দীর নিজের কাজও থাকে না। কেননা কথায় কথায় তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। চেঁচিয়ে বলেন, 'চ্যারিটি করছ ? ময়লা নোট দিয়েছ ?'

কেমন করে যেন তিনি ইরার কাজ করবার কথা জেনে যান। জেনে অনন্ত পূজারাকে তিনি প্রায় মারতে গিয়েছিলেন।

অনন্ত পূজারা বলেন. 'সুধাংশুবাবু, আপনার মেয়ে আমার মেয়ের মতো। বেবিকে ও একটু পড়িয়েছে···'

কিন্তু সুধাংশু নন্দী তখন চোখে অন্ধকার দেখছেন রাগের বশে। তিনি তার জবাবে ভয়ানক অপমান করেন পূজারাকে, এমন সব কথা বলেন যার কোনোরকম ক্ষমা হয় না।

'টাকা দিয়ে তোমরা সব কিনতে চাও, আমাদের মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা অবধি !'

জাত তুলে, বৃত্তি তুলে কথা বলেন সুধাংশু নন্দী। অনন্ত পূজারা শুধু আস্তে বলেন, 'আমার শিক্ষা দীক্ষা নেই সুধাংশুবাবু, বড় অশিক্ষিত আমি, তবে এখন দেখছি আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকের চেয়ে আমরা, অশিক্ষিতরা, অনেক ভাল। আপনি বাড়ি যান।'

বাড়িতে গিয়ে ইরা তার বাবার কথার প্রতিবাদ করে। রাগের মাথায় অনেক কথা বলে সে, কতদিন ধরে অনন্ত পূজারা তাকে সাহায্য করেছেন। কতকষ্টে সে চালায় সংসার, বাবা আর কতটুকু খবর রাখেন এইসব।

সব শুনে গুম হয়ে যায় সুধাংশু নন্দী। বোধ হয় এই প্রথম বুঝতে পারেন তাঁর অপরাধের গুরুত্ব। ভয়ানক অন্যায় করেছেন তিনি। ভেবেছিলেন আরতিকে ভালবাসেন, এখন দেখছেন সেটাও

তাঁর স্বার্থপরতা। আরতিকে ভালবাসলে আরতির মেয়েকে এত অবহেলা করলেন কেন! কেন দায়িত্ব পালন করলেন না।

চারদিকে চেয়ে দেখেন দেওয়াল জীর্ণ, অবহেলিত বাগান, ঘরের আসবাবপত্র সব কিছুতে অবহেলার ছাপ সুস্পষ্ট। বুঝতে পারেন হয়তো সময় আছে। আবার ফিরে চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তাঁর নিজের আর সে উদ্যম নেই, নিজেকে তিনি খরচ করে ফেলেছেন। বেরিয়ে এসে মেয়েকে বললেন, 'ঠিক বলেছিস ইরা। ভুল করেছি। সবই ভুল হয়ে গেছে।'

তারপর আত্মহত্যা করেন সুধাংশু নন্দী। বন্দুক তাঁর নিজেরই ছিল।

এই শেষ কাপুরুষতা, ভীরুতার ফলে ইরার জীবন আরো জটিল হল। তখন কিছুদিনের জন্যে তাকে নিয়ে আসেন নিলীনা মিত্র। তারপর একদিন ইরা ভয়ানক দরকারী হয়ে উঠল এ বাড়িতে! নিলীনা মিত্র আর ছাড়তে চাইলেন না তাকে। অবশ্য, ইরাকে ও বাড়িতে শুধু নিলীনা মিত্রই চান নি, আরেকজনও চাইল।

এখন সব মনে হল অনিমেষের। তাই দু'বছর বাদে সে কলকাতায়, এদের বাড়িতে। ইরাও এসেছে। বিভাদের বাড়ি। কিন্তু কেন এসেছে?

॥ ৬ ॥

'কিন্তু অনী, তুমি ইরার সঙ্গে দেখা করবে না কেন বলছ?' বিভা আস্তে প্রশ্ন করল, মুখ ফিরিয়ে। এষার ঘরে থাকাটা খুব পছন্দ করে নি বিভা, কিন্তু অনিমেষ আজকাল ওকে সামনে না রেখে কোনো কথা বলে না।

'এষাকে কি ও ঘরে যেতে বলব?'

বিভার গলা আরো মৃদু, গলায় কাতর অনুনয়।

'না। ও আমার, যাকে বলে···সেই রকম বন্ধু, যাকে আমি নিজের খুশি মতো গড়ব। ও আমায় রক্ষা করবে, বাঁচিয়ে চলবে!'

'নিজের খুশিমতো মানুষ গড়বে' অনী, এ পাগলামিটা তোমার এখনো গেল না!'

এ কথা বলতে এত কাতর হল কেন বিভা, এষা তাই বুঝে পেল না। বিভাকে দেখলেই তার ভেতরে কি যেন জমে শক্ত হয়ে ওঠে, অবিশ্বাসে, ঈর্ষায়। কিন্তু কেন! এষার চেয়ে অনেক বড় বিভা, এখন তার বয়স অন্তত একুশ, অনীদা তাই বলে। একুশ বছর বয়স মানে এষার চেয়ে সাত বছরের বড়। বিরাট ব্যবধান, একুশ বছর মানে বুড়ি হয়ে যাওয়া। ইদানীং এষা যে গল্পটি পড়ে, তারই নায়িকা কেমন করে যেন চোদ্দ বছরের হয়ে যায়। যে ছবিটি দেখে, তার নায়িকাকেও মনে হয় চোদ্দ বছরের।

শুধু গল্প, ছবি, কবিতা নয়, আরো যা কিছু যেখানে আছে, যা কিছু সুন্দর, ভাল লাগার সবই যেন এই বয়সের জন্যে। তাই বিভাকে সহ্য করতে পারে না এষা। অনিমেষের সঙ্গে ওর সামনে কথা বলা, মেশা, ওর প্রতিটি কাজে নিপুণতা, দক্ষতা দেখলে ওর শুধু মনে হয় যত চেষ্টাই করুক না কেন, কিছু কিছু জিনিস কোনোদিনই আয়ত্তে আসবে না তার। যেমন আভিজাত্য, হয়তো এর নামই আভিজাত্য, কথাটি বড় সুন্দর, কিন্তু এ ঘরের বালিশে ওয়াড় পরানো হয়ে গেল। এবার ওপরে যেতে হবে, 'যাচ্ছি অনীদা, বিভাদি চা খাবেন?'

বিভা মাথা নাড়ল। সকালের চাঁদের মতো একটু হেসে চলে গেল এষা।

'দেখতে খুব ভাল হবে বড় হলে, মনের মতো গড়বার মানুষটি তুমি মন্দ পাওনি অনী।'

বিভা বসল চেয়ারে। আজ তার চেহারা মলিন, বিষণ্ণ, 'রাতে ঘুম হয় নি, ভাল লাগছে না।'

'আমিও ঘুমোই নি।'

'কেন?'

'এ বাড়িতে একটা বিপদ চলেছে তো! তা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। নিজের পড়াশোনা আছে, এই সব নানা ঝামেলা বিভা।'

অনিমেষ একটু হাসল, গম্ভীর হল। ইদানীং বিভার সঙ্গে আর সহজভাবে মেশা যায় না। হঠাৎ এত বছর পরিচয়ের পর বিভা তার সামনে একটা আড়াল তুলে ধরছে। জীবনে কম জিনিসই সুন্দর থাকে, স্বচ্ছ। পেনঢোরা ঝর্ণার কাচের মতো জল কাচের পাত্রে রাখলে ভাল দেখাত, বেলা বাড়লে ঘোলা হয়ে যেত। তার আর বিভার বন্ধুত্বের বয়স হয়েছে, বেলা বেড়েছে।

'তুমি এবার কথা বলছিলে না বিভা?'

'হ্যাঁ, বলছিলাম বড় হলে দেখতে ভাল হবে।'

'এই কথাটা তুমি আগেও বলেছিলে একবার, মনে পড়ে?'

'কবে বল তো?'

'পেনঢোরায় পিকনিকে গেলাম আমরা। এটা তো চল্লিশ, সেটা প্রায় বছর পাঁচেক আগে হবে। সেই যে তুমি বললে বড় হলে অনী দেখতে খুব ভাল হবে।'

'আবার বছর পাঁচেক বাদে হয়তো আর কারুকে বলব, অভ্যেস দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'

বিভা চেষ্টা করে হাসল।

'কনকের খবর কি?'

'দাদার দিন একেবারে পরিষ্কার কয়েকটা রুটিনে বাঁধা।'

'যেমন?'

'সকালে ফ্রেঞ্চ শেখা, দুপুরে অফিস, সন্ধ্যায় শীলাদের ওখানে!'

'ভালই তো। ও যা চাইছে তাই করছে।'

'হ্যাঁ। যারা জানে কি চায় ঠিক তাই করতে পারে, তারা সুখী বই কি!'

'হিংসে হচ্ছে বিভা!'

'ওদের কথা ভাবলে আমার হিংসে হয় বই কি। তবে দাদাকে আমি হিংসে করি না।'

বিভা একটু হাসল, 'দাদা এত ভালমানুষ, আমায় এখনো এত ভালবাসে, ঠিক ছোটবেলার মতো। সব কথা বলবে, সব শুনতে হবে আমায়, না শুনলে রাগ করে। তা ছাড়া তুমি তো জানো দাদা এখনো কত অপটু, সব সামলাতে পারে না, এখনো ওকে কাঁদানো খুব সোজা।'

অনিমেষ একটু হাসল।

'কি মনে হয় জানো অনী, ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি···'

'বন্ধুত্ব!'

'হ্যাঁ, বন্ধুত্ব, সব ছড়ানো থাকে আশেপাশে, ঘন হয়ে, কেউ নিতে পারে কেউ পারে না।'

'বিভা! আজ তোমার কি হয়েছে?'

'জানি না। কিছুই হয় নি।'

'হলে আমায় ব'ল।'

'তোমায়!' বিভা তাকাল তার দিকে। গভীর চাহনি, একটু করুণ, ভাল লাগল না অনিমেষের। বিভা এমনিতে গর্বিত, অহঙ্কারী, সংযত। ওর সঙ্গে নিলীনা মিত্রের মিল আছে কোথাও। হয়তো সেই জন্যেই ওকে ভাল লাগে অনিমেষের। নিলীনা মিত্রের যা নেই তা-ও আছে বিভার, স্নেহ, বাৎসল্য, মমতা। কিন্তু মা-র কি তা নেই? না না, অনিমেষ মা-কে ছোট ভাবতে পারে না। আছে, সব আছে, মা-র, ওঁর নিজের মতো করে আছে।

সে থাকাটা অনিমেষের সঙ্গে মেলে না। না-ই বা মিলল।

নিলীনার সব কিছুই মস্ত বড় ছাঁচে ঢালাই করা! শিক্ষা, বুদ্ধি, হৃদয়ের আয়তন, বিলেত হলে তাঁকে সত্যিকারের 'লেডী' বলত সবাই। স্বভাবে আশ্চর্য সংযম, স্নেহমমতা প্রকাশ করতে লজ্জা পান কিন্তু বাৎসল্য আছে, সব আছে। বোঝা যায় বিপদে সংকটে! সেবার জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে যখন অনিমেষের হঠাৎ কলেরার মতো হয়, নিলীনা-ই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাকে ছত্রিশ মাইল। চারদিন চাররাত বসেছিলেন ওর শিয়রে। ডাক্তার যখন বলল আর ভয় নেই, তখন অবশ্য উঠে গেলেন বারান্দায়। স্বামীকে বললেন, 'অনী ভাল হয়ে গেল।'

অনিমেষ সেরে উঠতে অবশ্য ধমক দিয়েছিলেন খুব। এবার কলকাতায় আসবার আগে যেমন হঠাৎ এলেন ওর ঘরে। বললেন, 'সেবারকার মতো অসুখ বাধিও না অনী। আবার যেতে পারব না ছুটে। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে সাবধান থাকবে।'

'হ্যাঁ মা।'

'তুমি আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ অনী, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন নিলীনা। চোখের কোণ লালচে হয়ে উঠেছিল। কাঁচা পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা, গোল গোল হয়ে তাঁর সুগঠিত মাথাটি ঘিরে থাকে। গ্রীক পাথরের মূর্তির মতো চুল। গ্রীকদের সঙ্গে আরো কোথায় কোথায় মিল আছে তাঁর, সুগঠিত শরীর, শক্ত সমর্থ, নিখুঁত মুখ চোখ; প্রতিভা দীপ্ত নির্ভীক চাহনি।

নিলীনার সব কিছুই সেই রকম। মহান আদর্শে, বড় ছাঁচে ঢালাই, শ্বেতমর্মরে। অনিমেষের মন চিরদিন পলিমাটির নরম কোমল আশ্রয় চায়, স্নেহরেখা আঁকা চিরদিনের মায়ের মুখ। কালের প্রকোপে যা জীর্ণ হয়, অস্থায়ী, জীবনে সব কিছু এমন কি জীবনই অস্থায়ী। 'শুধু দু'দিনেরি খেলা', বড়বউদিকে গান গাইতে বলায় প্রথম গেয়েছিল। শ্বেতমর্মর অনেকদিন থাকে, কালের কপোল তলে অনেকদিন টিকতে জানে, কিন্তু নিলীনা কেমন করে নিজেকে

বদলাবেন, অনিমেষ যদি অন্যভাবে তাঁকে দেখতে চেয়ে থাকে বদলান না বলেই তিনি নিলীনা, তিনি হেঁটে গেলে সবাই সম্ভ্রমে মাথা নোয়ায়। সম্রাজ্ঞী।

'আমার ওপর রাগ করে দূরে যাচ্ছ অনী।'

'না মা।'

'রাগ করে চলে যাচ্ছ, কিন্তু তোমার বাবাকে আমি রাজি করাতে পারব না।'

'জানি।'

'ওঁর জেদ তুমি জান. আনবেণ্ডিং।'

'জানি। আমিও ওঁরই ছেলে।'

'ও ইয়েস।' কান্নার মতো বিলাপ করল নিলীনার গলা, শূন্য ঘুলঘুলাইয়াতে একটি নিশ্বাস শত গুণে প্রতিধ্বনিত হয় যেমন হাহাকার, 'তুমি একটু বুঝলে না, উনি বুঝলেন না।'

'তুমি কি বুঝেছিলে মা?'

'আমি তো বলেছি তোমায় কি মনে হয়েছে আমার। ভাল রক্তের সঙ্গে খারাপ রক্ত, সুধাংশু ভাললোক ছিল না অনী।'

ভাল রক্ত, খারাপ রক্ত. নিলীনা জানেন কি বলছেন। ঘোড়া, কুকুর, তিনি নিজে ব্রীডিং করান। কিন্তু এ কি অসম্ভব কথা, ভয়ঙ্কর দুরাশা। নিলীনা নিজের সন্তানের জীবনেও বিচারকের নির্মম হাত বাড়িয়ে তর্জনী তুলতে চান।

'আমি তোমার বিশ্বাস পালটাতে বলছি না। আমি ইরাকে ভালবাসি মা।'

'কতদিন ওকে দেখছ অনী, কতটুকু, ওকে কষ্ট দিচ্ছ। আমি বলছি ও খুব দুর্বল, ভীতু, তুমি ওকে ছেড়ে দিলে ও সুখী হবে।'

'তোমরা সুখী হবে বল।'

'আমি তোমার ভাল চেয়েছিলাম অনী।'

মাথা নাড়লেন নিলীনা। চিরদিন, চিরদিন বিদ্বেষ তাঁর ছোট

ছেলের সঙ্গে, কোথায় যেন ওর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েই চলেছে, কোন রণক্ষেত্রে, সেখানে সূর্য ডোবে, সূর্য ওঠে, দিন যায়, যুগ যায়, কেউ পরাজয় মানবে না অপরের কাছে। কিন্তু ওর সঙ্গে সংগ্রাম শুধু তাঁর নয়, ওর বাবারও! ভাবতে গেলে বুক ভেঙে যায়, কেন ও স্বীকার করবে না ও দুর্বল, ওর বড় প্রয়োজন তাঁদের, অনী, তুমি কেন অন্যরকম হলে না?

'যতদিন ছোট ছিলে...'

ততদিন যেন প্রয়োজন ছিল তাঁকে। এখন আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনী তাঁর সন্তান। আজ যদি পৃথিবীর শেষ কোনো অজানা প্রান্তেও চলে যায় তবুও ওর ছায়া দীর্ঘ হয়ে ঢেকে রাখবে তাঁর পথ, অনী কেন বোঝে না।

'কি ভাবছ অনী?'

বিভার কথা অনিমেষকে ধাক্কা দিল। রায়পুরে পুবের ঘর থেকে এখানে মন উঠিয়ে আনতে একটু সময় গেল, অনিমেষ হাসল, 'মায়ের কথা।'

'ও।'

বিভা নিস্পৃহ, বিস্মিত। অনিমেষের মাকে যতবারই দেখেছে, মনে মনে আশ্চর্য হয়েছে।

'মাকে তোমার কেমন লাগে বিভা?'

'তোমাদের বাড়িতে সবচেয়ে ভাল লাগে লতাকে।'

'ইনাকে?'

'খুব সুন্দর দেখতে নিশ্চয়ই।'

'ভাল লাগে না?'

'দেখতে চমৎকার। তবে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় কি?'

'দেখতে কত সুন্দর, বিভা, ইরার চেয়েও?'

'না। ইরার চেয়ে কেউই সুন্দর হতে পারবে না।'

'কেন ?'

'ওর হাতে কয়েকটা তুরুপের তাস আছে।'

'যেমন ?'

'ওর মা নেই, বাবা আত্মহত্যা করেছেন। ওকে যে দেখে নি সে-ও ওর দুঃখে আগে থেকেই দুঃখী হয়ে বসে আছে! তার ওপর ও দেখতে সত্যিই সুন্দর, মেয়ে খুব ভাল। তার ওপর তুমি ওকে ভালবাস বলে বাবা মার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছ। না, অনী, ইরার সৌভাগ্যকে সবাই হিংসে করবে বই কি।'

'তুমি ঠাট্টা করছ ?'

'না। বোধহয় লক্ষ্য কর নি তুমি, আজকাল আমি ঠাট্টা করি না একদম। কিন্তু আসল কথায় চলে আসা যাক। ইরার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাইছ না কেন ?'

'ও এসেছে কেন এখানে ?'

'মা ওকে আসতে লিখেছেন।'

'এতদিন তো লেখেন নি ?'

'না। এতাদন মা ওর সম্পর্কে সব দায়িত্ব সব কর্তব্য ভুলে দিব্যি ছিলেন। আরাত মাস ওঁর সম্পর্কে বোন এই মাত্র। যতদিন ওঁদের অবস্থা ভাল ছিল ততদিন অবধি আমরা গিয়েছি। রায়পুরে হইহই করেছি। চাঁদের আলোয় পিকনিক। আরো অনেকরকম হই-হুল্লোড় কিছুই বাদ থাকে নি।'

'সেই জন্যেই তোমাদের সঙ্গে আলাপও হয়।'

'ঠিক সে জন্যেই নয়। বাবার কোন একজন জ্ঞাতি বোনের ননদ তোমার মা। আসলে সম্পর্ক খুঁজতে চাইলে বেরোয় বই কি!'

'যা হোক, এবার বল ইরা কেন এসেছে।'

'তোমার মা যতদিন দায়িত্ব নেন নি ততদিন মা খোঁজও নেন নি ইরা কেমন আছে। কিন্তু এবার তাঁর টনক নড়েছে। তাঁরই বোনের মেয়ে, হল বা দূর সম্পর্কের মাসতুতো বোন, সে নিলীনা

মিত্রের কম্প্যানিয়ন-সেক্রেটারী হয়ে থাকবে সেটা তাঁর কাছে অসহ্য। তাই চিঠি লিখেছেন।'

'চিঠি পেয়েই ইরা চলে এল!'

'তাই তো দেখছি।'

'এখানেই থাকবে?'

'না। তুমি ভাল করেই জান, এখানে আসবার, তোমার সঙ্গে দেখা করবার প্রথম সুযোগেই ও চলে এসেছে?'

'জানি না। ইরা আমায় কিছু লেখে নি।'

'দেখা করে নেওয়াটা প্রয়োজন অনী।'

'হ্যাঁ বিভা। ও এখানে এসেছে তবু দেখা করছি না, এটা হয়তো একটু বোকা বোকা লাগবে তোমার কাছে। সত্যি বলতে কি নিজেকেও বোঝাতে পারছি না।'

অনিমেষ টেবিল ঢাকনির কোনাটা সমান করে রাখল। বিভা দেখল ওর নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে, চোখের পাশের শিরটা নড়ছে, হাতের আঙুল অস্থির, চঞ্চল। অত্যন্ত উত্তেজিত, বিচলিত বা আকুল হলে অনিমেষের এমন হয়, আজও, টাইফয়েড এক একজনের শরীরে এমনি এক একটা ছাপ রেখে যায়। শোনা কথা।

'তা হলে তোমায় বলতে হয় বিভা।'

অনিমেষ মাথা ঝাঁকাল। এখন সে স্থির, ধীর, নিজেকে সামলে এনেছে।

'তা হলে তোমায় বলতে হয়—মা, বাবা, দাদা, মেজদা, সবাই বলেছিল এটা একটা ঝোঁক, চোখের নেশা। বাবা বললেন দু'বছর দেখাশোনা না করে, কোনো যোগাযোগ না রেখে তারপর যদি এসে বলতে, তবে বুঝতাম সত্যিই ভালবাস। আমি চাই না, আমার ইচ্ছে করে না এর থেকে ইরাকে বা আমাকে হাল্‌কা ভাববেন ওঁরা, অসংযত, সেই জন্যে আমার ইচ্ছে ছিল না বিভা!'

বিভা নিশ্চুপ। ভুরু কুঁচকে অনিমেষকে দেখছে। বিভার

শাড়ির রঙ বড় বেশি উজ্জ্বল, পাকা পাতিলেবুর মতো হলুদ। জর্জেট আশ্চর্য নরম হয়ে লেপটে থাকে শরীরে। জামার গলা নিচু, তে-কোনা, ডান হাতে ঘড়ি, বিভা মাথা নাড়ল।

'ছেলেমানুষী।'

'ছেলেমানুষী।'

'হ্যাঁ। ইরাকে তুমি ভালবাস বুঝলাম। কিন্তু এমন কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়, হাজার হলেও অনী, পৃথিবীতে প্রতিদিন বহু হাজার, বহু লক্ষ নরনারী ভালবাসছে।'

'বিভা। এও কি তোমার খবরের কাগজের খবর।'

'না। খবরের কাগজে থাকে অঙ্ক, যুদ্ধের খবর, আমেরিকার বড়দিনের হইহল্লায় এত হাজার লোক আহত, প্রতিদিন এত লক্ষ বিয়ে, জন্ম, মৃত্যু আত্মহত্যার অঙ্ক। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি মৃত্যুর পেছনে কোনো না কোনো রকম ভালবাসা থাকে। ভালবাসার রকমফের। হ্যাঁ, বলতে পার বটে ভালবাসার খবর কাগজে বেরোয় না, কিন্তু তা বলে অনী. তুমি বড় বেশি আশা করছ। আমার ভয় হয় তুমি আবার একটা আঘাত পাবে বলেই তৈরি হচ্ছ।'

'তুমি রাগ করেছ বিভা।'

'আমি তোমার জন্যে চিন্তিত অনী।'

'কেন ?'

'বোধহয় আমিও তোমায় ভালবাসি. ও না, ভুল ক'র না. বাংলা ভাষায় শব্দ বড় কম।'

বিভা কাঁধ ঝাকিয়ে থেমে গেল।

'ভুল করব না !'

'না করলেই তোমার আমার দু'জনের পক্ষে মঙ্গল। যাকগে, কাজের কথাটা বলি। এখানে আমাদের বাড়িতে চিরদিন থাকবার পড়াশোনা করবার অথবা কিছুই না করে এমনি থাকবার প্রস্তাব

রেছিলেন মা। ইরা প্রত্যেকটি প্রত্যাখ্যান করেছে। উপহার রত দিলে মা বেজায় চটে যান জান তো?'

'কেন?'

'ওই তোমায় বলবে। দিন পনেরো না হোক একমাস না হোক মাস বাদে ও ফিরে যাবেই। নানারকম ভুল ধারণায় ও কষ্ট পাচ্ছে না! বেচারী!'

'কি রকম?'

'যেমন ওর জন্যে তুমি যখন আত্মত্যাগ করছ, ওরও কষ্ট করা উচিত। যেমন তোমার বাবা মা'র কাছেই ওর ফিরে যাওয়া উচিত, না হাজার হলেও ওঁরা দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছেন সেটি ভোলা উচিত নয়।'

'কি আশ্চর্য, ইরা এসব কথা কোনোদিনই আমায় বলে নি।'

'সবচেয়ে খারাপ লাগছে আমার, ও সবটাই করছে কর্তব্যের ভারে বিবেকের দায়ে। তুমি হুম করে আত্মত্যাগ করে বসলে, তাই ও আর না বলতে পারল না। আমার কেবলই মনে হয় ইরা ছেলেবেলা থেকে নানারকম বাধ্যবাধকতায় বাস করে ক্লান্ত। ওর ওপর থেকে সব ভার সরিয়ে নিলে ও হালকা হতে পারত।'

'না না, এ তুমি কি বলছ বিভা। কোনো রকম বাধ্যবাধকতা নেই ওর, ও যা করেছে খুব বুঝেশুনেই, তুমি জান না।'

'হলেই ভাল।'

বিভা ভুরু কুঁচকে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল, ঘড়ি দেখল।

'তোমার কথা কিছু তো বললে না বিভা।'

'বলবার কিছু নেই অনী।'

'কনক বলছিল…'

'দাদা এখনো ভাবে ওর সেই বন্ধুটি উৎপলাকে বিয়ে করল বলে আমি কষ্ট পাচ্ছি, ব্যথা ঢেকে রাখছি, ইত্যাদি।'

'বিভা!'

'অথচ ও জানে না, কিন্তু এখন এ-সব কথা থাক না অনী। জরু
কথা, এখনি সেরে ফেলতে হবে এমন কোনো তাড়াহুড়ো তো নেই।

'না, পরে দশ বিশ বছর ধরে যখন খুশি তখনই কথা বল
পারব আমরা কি বল ? আমার তো তাই ইচ্ছে করে।'

'প্রস্তাবটা মন্দ নয়, যদি আমরা ততদিন বাঁচি।'

'ততদিন আমরা বাঁচব কি না বুঝতে পারি না মেসোমশায়।'

অনিমেষ সতীশের সঙ্গে কথা বলছিল। তার পাশে ব
এষা। এখন রাত। আকাশে চাঁদ, ছাতে মোড়া, আরামকেদা
ছেটানো। ছবিকে আনা হয়েছে আজ বিকেলে। তাই সতী
আপাতত নিশ্চিন্ত। নিচে সংসারের সব কাজ মিটে গেছে। ছ
ঘরে ঘুমোচ্ছেন, ছোটরা বিছানায়। সতীশ ও অনিমেষের খাওয়
সময় দেরিতে। অনিমেষের সঙ্গে একটু বসে কথা কইতে পাব
জন্যে সতীশ তাঁর কাজের সময়কে সুদক্ষ দর্জির মতো ছেঁটে মাপস
করে নিয়েছেন।

'ততদিন আমরা হয়তো বাঁচব না।'

'কেন, অনী ?'

'আপনার কি মনে হয় না, আমার মতো ছেলেরা এই সময়ে, এ
যুগে এমন কিছুই পাবে না যা চিরস্থায়ী, যা ধরতে পারি হাতে
মুঠোয়। সুস্থ রাজনীতি, সাহিত্য, খেলাধুলো, আপনারা অনে
ভাগ্যবান। আমাদের হাতের আওতার মধ্যে কিছুই নেই। কিছু
পেলাম না বলেই হয়তো আমাদের ছিটকে চলে যেতে হবে
তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে হবে। তারপরে যারা আসবে···আজ
মেসোমশায়, এর পরের পৃথিবীর মানুষ যোগ্যতর হবে, সুখী হবা
অধিকার নিয়ে আসবে, এ-সব কথা বোধহয় বহুবার বলা হ
গেছে, তাই না ?'

'তুমি মেন্টাল টাইপ অনী !'

'হ্যাঁ মেসোমশায়, বেশি ভাবি, বেশি কষ্ট পাই। আমি যখন
ন আমার মতো ছেলেরা কিছুই পেল না, তখন আমার টাইপের
লেদের কথাই ভাবি।'

'এত বেশি ভাব কেন অনী?'

'কি জানি!'

'তুমি এত বেশি চিন্তা কর সব বিষয় নিয়ে, যে আমার ভাল
গে না।'

'কেন? আপনি ভাবেন না?'

'ভাবতাম অনী, একসময়ে ভাবতাম!'

ভাবতেন, যখন মন ছিল তরুণ, সূক্ষ্ম, সময়ের ঘষা লেগে সেই
ই ভোঁতা হয়ে গেছে এখন আর ভাবেন না এ-কথা বলতে লজ্জা
সতীশের।

'অনেক প্রত্যাশা নিয়ে যারাই জীবন শুরু করে অনী, তারাই
পর্যন্ত প্রচণ্ড সব দাম দিয়ে দিয়ে আপস করে।'

সতীশ মৃদুস্বরে বললেন। আপস করে, রফা করে চলতে চলতে
নেক রকম নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অনিমেষ আবার
কে হাত ধরে টেনে আনছে। কিন্তু নিজের সংসারে স্ত্রীর কাছে,
নদের কাছে ফিরে আসতে হলে অনেক হাঁটতে হবে তাঁকে।
ক দিন ধরে একটু একটু করে দূরে সরে গেছেন, ফিরতেও
কদিন লাগবে। হয়তো কোনোদিনই ফেরা হবে না। অনিমেষ
কোনো শর্টকাট জানে? প্রত্যাশা ভরা চোখে তিনি চাইলেন।
অল্পদিন আগে এসেছে অনিমেষ, কত তাড়াতাড়ি জড়িয়ে গেল
দের সঙ্গে।

'ছবিমাসিকে হইচই করতে দেবেন না এখন কিছুদিন।'

'বলব।' সতীশ মৃদু, ছোট জবাব দিলেন।

'মা শুনবে না অনীদা...'

'শুনবেন না বল এষা!'

'মা শুনবেন না অনীদা, আবার মাসিরা, মামারা কেউ এ হইচই করবেন,' এষা ঘুমঘুম গলায় বলল।

'এবার ওঁকে ইচ্ছেমতো হইচই করতে দিচ্ছে কে?'

অনিমেষ ঘড়ির দিকে চাইল। আজকের রাত যাবে, কাল সকালে, বিকেলে ইরার সঙ্গে দেখা হবে।

॥ ৭ ॥

বিকেলের আলো তখনো গাঢ় হয় নি, ইরা উঠে সোজা দো এল।

ছোটরা পার্কে গেছে, ছবি বিছানায়। এষা চুল বেঁধে সবে ধুতে যাবে, অবাক হয়ে চাইল।

ইরার সম্পর্কে যত কথা সে ভেবেছে, কল্পনা করেছে, ইরা সব কিছুর চেয়ে অন্যরকম। সিঁড়ি দিয়ে এত আস্তে উঠে যেন ভেসে চলে এল, রেলিঙে হাত রেখে বলল, 'তুমি এষা!'

এষা মাথা নাড়ল।

'অনী কোথায়?'

'এখনো আসেন নি।'

'ও, এখন আসবে তো?'

'তাই তো বলেছেন!'

ছবি ডাকলেন, 'সেই মেয়েটি এসেছে এষা? ভেতরে আয়। চা করতে বল।'

চটি খুলে ইরা ঢুকল, বলল, 'আপনি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ, তুমি বস। অসুখের ঘরে বসতে ভাল লাগবে না হয়

'কেন?'

'অসুস্থ লোকের কাছে কি কেউ বসতে চায়?'

'আমার মা তো অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন, আমার কিছু খারাপ লাগে না।'

ইরা একটু হাসল, হেলান দিয়ে বসল। ঘরে ক্রমশ-ই তার মায়া ছড়িয়ে পড়ছিল। চীনেধূপের মোটা কাঠি থেকে যেমন সুগন্ধ ছড়ায়, সবুজ ধোঁওয়া।' ছবি পর্যন্ত অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। না একে বোধ হয় সুন্দরী বলে না। কিন্তু সুন্দরী হবার দরকার নেই ইরার। তার ধপধপে ফর্সা রঙ, রোগাটে মুখ, প্রসাধন বর্জিত চেহারা' নাক একটু ছোট, হাঁ, মুখ একটু ছড়ানো, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চাহনি। অত্যন্ত কালো চোখের মণি, একটু বিস্ফারিত যেন সর্বদা শারীরিক যন্ত্রণা পাচ্ছে ও, অথবা অন্য কোন উদ্বেগ ওর সাথের সাথী, কোন বিরাট আতঙ্ক।

'আপনার আর আর ছেলেমেয়েরা কোথায় ?'

'বেড়াতে গেছে।'

'ও

ইরা যেন নিরাশ হল। আস্তে হেসে বলল, 'ছোটদের আমি খুব ভালবাসি।'

'তোমার কি ছোট ভাইবোন আছে আরো ?'

'না, আমি একা মাসিমা !'

ইরা একটু ভেবে বলল, 'শুনেছি আমার একজন দিদি ছিলেন, কিন্তু আমার কিছু মনে নেই।'

'বিভা তোমার কে হয় ?'

'মাসিমার মেয়ে।'

ইরার গলা সরু, ক্লান্ত, এখন এষা দেখল ওর চোখের নিচে কালি, ক্লান্তি, যেন কতদিন ঘুমোয় না।

'ছোটদের ভাল লাগে আমার,' ইরা আবার বলল, যেন এতক্ষণ এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছে! চারদিকে তাকাল। বলল, 'আপনাদের বাড়িটা খুব সুন্দর।'

'তোমার ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ। অনেক লোকজন, ছেলেমেয়ে, হইচই-এর বাড়ি ভাল লাগে আমার।'

'কি যে বল!'

অল্প হাসলেন ছবি। বললেন, 'আমিই অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি, অনীর হয়তো খুব কষ্ট হয়।'

এষা মার দিকে তাকাল। শুয়ে শুয়ে বলা খুব সোজা, কিন্তু মার বোঝা উচিত, এ-সংসার এমন সুশৃঙ্খলে কোনোদিনই চলে নি।

'অনীর কষ্ট হয়?'

ইরা অবাক হয়ে তাকাল 'অনী তো লিখছে জীবনে কোথাও সে এমন আরামে বাস করে নি, এষার কথা কত লিখল। ওর চিঠি দেখে তবে ওর মা নিশ্চিন্ত হলেন।'

'ভাল লাগলেই ভাল। আমার তো সর্বদা মনে হয় ওরু কত ভালভাবে থেকে অভ্যেস, কষ্ট হয় বোধহয়।'

ছবি আস্তে পাশ ফিরলেন। যন্ত্রণা হচ্ছে এখনো। ভগবান জানেন সুস্থ হবেন কবে, কবে চলে ফিরে বেড়াতে পারবেন। আগেকার মতো হইচই, না, এবার আর অতটা অসাবধান হবেন না।

'তোমরা বাইরের ঘরে বস, এষা, ওকে চা দে।'

ইরা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ঐ যে অনী এসেছে। আমি ওর চটির শব্দ চিনি।'

চটির শব্দ চিনি! সিঁড়ি ধরে নেমে গেল ইরা, এষা নামতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। চেনে, সে-ও চেনে অনীদা'র চটির শব্দ, কড়া নাড়বার বিশেষ ভঙ্গীটি, কিন্তু মা ইশারা করে ওকে নেমে যেতে বারণ করলেন।

ওরা পার্কে বসে কথা বলছিল।

'বিভা বলেছিল, ইরা, তুমি না কি ফিরে যেতে চাও।'

'নিশ্চয়। তুমি কি ভেবেছিলে আমি থাকতে এসেছি?'

'না কিংবা হ্যাঁ কি বলব বল। তোমার কোনো প্ল্যানই জানি না তো!'

অনিমেষ ইরার দিকে তাকাতে পারছে না। অসুবিধে হচ্ছে তার। এমন মিইয়ে গেছে ইরা. ঠাণ্ডা, নম্র, নিষ্প্রভ।

'জানবার আর কি আছে বল? হঠাৎ মাসিমা চিঠি লিখলেন।'

ইরা তার দিকে চাইল। বলল, 'মাসিমা বলছেন ইচ্ছে হলে আরো পড়তে পারি। এখন কেরিয়ারের নানারকম পথ হবে, কিছু শিখতে টিখতে পারি। আমি রাজি হই নি।'

সে মাথা ঝাঁকাল।

'রাজি হই নি আমি,' পার্কের লোকজন, শিশুদের দিকে চেয়ে বলল, 'কেন রাজি হব বল! কে আমায় আশ্রয় দিয়েছে এমন দুর্দিনে, কে ডেকেছে কাছে, এক তোমার মা ছাড়া?'

'মা-র জন্যে তুমি ওখানে ফিরে যাবে, ইরা?'

'হ্যাঁ অনী। আমি অকৃতজ্ঞ হতে পারব না।'

'বিভা বলছিল...'

বিভা যা বলছিল তবে তাই কি সত্যি? কর্তব্যের বোধ। বিবেকের দায়, এইসব বাধ্যবাধকতার জন্যেই কি ইরা তাকে গ্রহণ করেছে? সংশয়, ভয়, কে অনিমেষকে বলে দেবে কোনটা সত্যি!

'বিভা বলছিল, আমিও মনে করি ইরা, মা-র কাছে যাওয়াতে তোমার ওপর জোর নেই কিছু। আমার সম্পর্কেও তোমার কোনো দায়িত্ব নেই। তুমি হয়তো ভাবছ, যেহেতু তোমার জন্যেই আমার সঙ্গে ওঁদের মনান্তর হল, আমি চলে এলাম, সেহেতু তোমাকে আমার কাছেই আসতে হবে!'

অনিমেষ ইরার দিকে তাকাতে ভয় পেল। যদি ইরা স্বস্তি পায়, নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, 'বাঁচলাম অনী। আমি তোমার এ আত্মত্যাগ চাই না, আমাকে আমার পথে যেতে দাও।'

ইরা একটু হাসল। বলল, 'বিভা বলেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ওঁদের কাছে যেতে চাই, কেননা আমি তোমার মা'কে ভালবাসি অনী।'

'ভালবাস!'

'এমন অবাক হচ্ছ কেন?'

'তুমি ওঁকে ভালবাসবে এমন কোনো সস্নেহ ব্যবহার উনি তোমার সঙ্গে করেছেন কি?'

'আমাকে আশ্রয় দিলেন, বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়ে দিলেন। আমাকে এতরকম সাহায্য করলেন, এগুলো কিছুই নয় বুঝি?'

'তা বলছি না. কিন্তু এরকম তো মা আজ প্রথম করছেন না।'

'যাদের সঙ্গে এমন ভাল ব্যবহারই করেছেন, তারা যদি ওঁকে ভাল না বেসে থাকে, সেটা কি আমারও করা অনুচিত? না অনী. তুমি আমার কথা বুঝবে না।'

'বুঝতে যে চাই. ইরা!'

'চাইলেই সব বোঝা যায় না।'

'তুমি আমায় কষ্ট দিচ্ছ।'

'বেশ করছি, তোমার ভাল-র জন্য করছি।'

'আমার ভালর জন্যে?'

'হ্যাঁ অনী। তুমি বুঝবে না। কারণ, তুমি জান না আমি কি অবস্থা থেকে তোমাদের বাড়িতে আসি। বাবা মারা গেলে কি বলছ. বাবা থাকতেই আমাদের দিন চলা ভার হয়েছিল। সব সময়ে একটা অনিশ্চিত অবস্থায় দিন কাটত। এই সব সময়ে একটা বিপদের ভয়ে দিন কাটানোর দুঃখ তুমি কি করে বুঝবে অনী!'

'ইরা!'

'তোমার মা আমাকে যা দিয়েছেন সেজন্যে আমি খুব কৃতজ্ঞ। আমি ওঁকে ভালবাসি। সেইজন্যে অনী, আমার ভাবতে ইচ্ছে

করে না যে আমার জন্যে তুমি অশান্তি বোধ করছ। ওঁরা জানবেন এমন ব্যবহারের প্রতিদানে আমি ওঁদের ছেলেকে সরিয়ে নিয়েছি। ভাবলে আমার দুঃখ হয় অনী।'

'যদি তোমায় মা সত্যি ভালবাসেন তাহলে আমার স্ত্রী হিসেবে স্বীকার করবেন না কেন?'

'হয়তো ওঁর নিজের কাছে কোনো যুক্তি আছে। লতা, ইনা, দুজনেই ওঁর বেছে আনা বউ, বংশ আরো কি সব দেখে শুনে···

'যুক্তিটা কি জঘন্য ইরা, তোমাকে কোথায় নামিয়ে দেবার চেষ্টা!'

'কিন্তু অনী, হয়তো এবিষয়ে উনি মনে করছেন এতেই তোমার ভাল হবে।'

'তুমি বলছিলে ওঁদের ব্যবহারের বদলে তোমাকে যা করতে হবে, তাকে হয়তো অকৃতজ্ঞতা বলে মনে হবে। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

ইরা আস্তে বেঞ্চে হেলান দিল। বলল, 'কেউ অশান্তি ভোগ করছে কষ্ট পাচ্ছে ভাবলেই আমার খারাপ লাগে।'

'সকলকে তো তুমি সুখী করতে পার না ইরা। যেমন ধর বউদিকে!'

'লতার কথা বলছ।'

'হ্যাঁ।'

'লতা কেন সুখী নয় অনী? আমার তো মনে হয় এখন মায়া, কুণাল ওদের নিয়ে ও খুব সুখী।'

'বউদিকে তুমি অবশ্য এই দেখে আসছ, আমি কতদিন দেখি না, তুমিই জানবে।'

'যার যা আছে তাই নিয়েই সুখী হতে চেষ্টা করা উচিত, তাই না?'

'যেমন?'

'তুমি বল তোমার দাদা লতাকে ভালবাসে না, তোমার মা ওকে অবহেলা করেন, তাই না?'

'আমি পরে বলব, এখন তুমিই বল।'

'তা যদি বা হয় অনী, তবু তো লতাকে তাই নিয়েই থাকতে হবে! হাজার হলেও ওর কুণাল মায়া আছে। সেটা কি কম সান্ত্বনার কথা?'

'না ইরা। আমি মনে করি মায়া আর কুণাল থাকা বউদির পক্ষে মস্ত একটা ভরসার কথা। যদিও, বড় হলে ওদের আর কাছে কাছে রাখতে পারবে কিনা বউদি, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।'

'তোমার মা বুঝি ওদের আবার সরিয়ে দেবেন?'

'না। মেরিন ইঞ্জিনীয়ার রণজয় মিত্র। ভুল ক'র না ইরা, দাদা মেজদা বা আমি নয়। ওঁর মধ্যে একটা আশ্চর্য নিষ্ঠুরতা আছে।'

'আমার সঙ্গে উনি সব সময়ে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন।'

'ও ইয়েস, এভার কার্টিয়াস, শিভ্যালরাস্, রণজয় মিত্রের তুলনা নেই। যারা রণজয় মিত্রকে বিশ্বাস করে তাদের আমি সব সময়ে পেনঢোরা রিজার্ভ ফরেস্টে সে বছর মে মাসের ঘটনা বলি। গল্পটা শুনবে?'

'বল।'

'মে মাসে সেবার দাদার ছুটি। দাদা এখানে। পেনঢোরা রিজার্ভ-এ জীবজন্তু মারা হয় না। জানই তো মা এখনো কনফারেন্সে যান, তখন তো উনি রীতিমতো কাগজের সম্পাদিকা, জীবজন্তু মারা হবে না।'

'এখনো কি সব করেন-টরেন বোধ হয়।'

'অনেক কম। তার কারণ হচ্ছে মা যখন মিটিং করছেন, বলছেন পোচিং বন্ধ করতে হবে, লুকিয়ে জীবজন্তু মারা চলবে না, তখন পেনঢোরার আশপাশের গ্রাম থেকে খবর আসতে লাগল। কেউ একজন এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও গুলি চালিয়ে চলেছে। অথচ হরিণ, চিতাবাঘ, বনশুয়োর বা অন্য কিছু জন্তুকে গুলি মেরেই সে

পালায়। আহত হলে জন্তুদের ক্ষমতা যায় কমে। তখন তারা মানুষের ক্ষেত নষ্ট করে, গরু ছাগল ধরে। নয়তো যন্ত্রণা পেয়ে পচে পচে মরে।'

'তারপর।'

'তারপর সর্ষের মধ্যে ভূত। অন্যায় কাজটি করেছিলেন স্বয়ং রণজয় মিত্র। এরকম আরো কয়েকটা রেকর্ড ওঁর আছে। আমার তো মনে হয় ও এখন চুপ করে থাকে বাবার দাপে, মা-র ভয়ে।'

'মাকে উনি ভয় পান?'

'পাবে না? মা'র মধ্যে তো কোনো ভীরুতা নেই। দাদার নাম বেরুবামাত্র উনি অমনি গেলেন ওঁদের অফিসে। বললেন—সম্পাদক হতে পারব না আমি। আমার ছেলেই অন্যায় কাজ করেছে। দাদা এতটা সাহস পছন্দ করে না ইরা। মা'র ভয়ে ও ভাল ব্যবহার করে বউদির সঙ্গে।'

'তুমি যখন বলছ, তখন তাই হবে। তবু অনী, আমি বলব, আমি হলে ওতেই সুখী থাকতাম।'

'ওতেই!'

অবাক হল অনিমেষ, কোথায় আঘাত লাগল যেন। ওতেই খুশি থাকত ইরা, অতটুকুতেই। অত অল্পেই যদি সন্তোষ পায় ও, তবে ওকে কেন অনিমেষ মিছেমিছি ভারাক্রান্ত করছে?

'ওতেই। সুখী আমি খুব সামান্য পেলেই হতে পারি, সেজন্যে অনেক আয়োজনের দরকার নেই।'

'ইরা।'

'এই দেখনা আমার বাবাকে। তোমরা সবাই কি মনে করতে জানি না, আমি কিন্তু বুঝতাম উনি মনে করতেন এক বিরাট আয়োজন করে উনি মা'র জন্যে শোক করছেন। নিজের জীবন নষ্ট করে, সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, মা'র মৃত্যুতে উনি আঘাত পেয়েছেন সেটাই যেন জানাচ্ছিলেন।'

অনিমেষ আশ্চর্য হল। হ্যাঁ, ইরার বাবার ব্যবহারের আরেকটা মানেও পাওয়া যাচ্ছে এখন। সুধাংশু নন্দী 'মাতাল, দায়িত্বহীন, অবিবেচক।' বিজয় মিত্র মৃত্যুসংবাদ পাবার পরেও নরম হন নি।

'ক্রুট।' নিলীনা মিত্র বলেছিলেন; শহরের সবচেয়ে সম্মানিতা মহিলা।

দাদা, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? অথবা কাপ্তেনের কাপ্তেনী কোথায়? অথবা, এমন মানুষটা কি হয়ে গেল। এধরনের মন্তব্য করত শহরের সবচেয়ে ওঁছা ছেলেছোকরারা।

'ইরার দিকে চাইছ?' রাতের রায়পুরকে জিগ্যেস করতে করতে সুধাংশু নন্দী পথ দিয়ে যেতেন, লাঠি ঠুকে ঠুকে, রোজউডের দামী লাঠি। 'ইরাকে আমি এখানে রাখব না। শী উইল ম্যারি এ প্রিন্স।'

সানন্দে শুভসংবাদ জানাতেন তিনি, সবাই শুনতে পেত।

কিন্তু সব ঘটনারই একাধিক দিক থাকে. এক একজন এক একভাবে দেখে। ইরা তার বাবার কথা বলে না বটে, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে ওর মনে কোনো ক্ষোভ নেই।

'দুঃখ জানাবার জন্যে বাবার সে কি আয়োজন। নিজের জীবন নষ্ট করে, ছত্রখান করে তিনি জানাচ্ছেলেন যে মহান দুঃখ জানাচ্ছেন। অথচ সবাই ভাবত তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর, মদ্যপ, অবিবেচক। এ আমার নিজের চোখে দেখা; তাই অনী. আয়োজন করে সুখী হওয়াও যায় না। আমি সহজেই সুখী হব।'

'আমার বাবা মা'র কথা বলছিলে তুমি ইরা, তাই বলি, আমাকে সুখী দেখলে ওঁরাও মন থেকে আমাদের ক্ষমা করবেন।'

'হয়তো।'

ইরা ছোট নিশ্বাস ফেলল, উঠে দাঁড়াল।

'চল বাড়ি চল অনী। বিভা হয়তো আমায় নিতে আসবে, কনকদা, ওরা অপেক্ষা করবে।'

'চল। তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ইরা, কলকাতা তোমার ভাল লাগছে না?'

'লাগছে বই কি।'

'বিভা কিছু বলেছে?'

'না না। এই তো পরশু আমায় কত টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে দিলেন মাসিমা, জুতো, ব্যাগ, কত কি। আমার মনে হচ্ছিল এর চেয়ে অনেক কম টাকার জন্যে আমার মা'র চিকিৎসা হয় নি অনী। অথচ এঁরা সেদিনও ছিলেন। এঁদের সকলকে লেখা হয়েছিল পর্যন্ত।'

'ওসব ভেবে আর লাভ কি ইরা?'

'ভাবি না তো!'

ইরা স্মিত হাসল। তারপর বলল, 'দেখছি এখানকার পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ খুব।'

'খুব।'

'ভয় করে না অনী?'

'কিসের ভয়?'

'যদি আঘাত পাও, আঘাত দাও?'

॥ ৮ ॥

ইরার প্রশ্নে অনিমেষ অবাক হয়ে যায়।

সে আঘাত পাবে, আঘাত দেবে, কাকে? এ বাড়িতে মানুষ কোথায়?

'এষা আছে, অনী।'

'এষা?'

এতক্ষণে স্বচ্ছন্দ হল অনিমেষ। হাসল গলা তুলে। বলল, 'ও বড্ড ছোট না ইরা?'

'এখন ছোট, একদিন তো বড় হবে,' ইরার গলা মিহি সুরেলা বাঁশির মতো শোনাল, 'ভারি আদরকাড়া মুখ মেয়েটার, তাই না ?'

'পুতুল পুতুল।'

'বিভা বলছিল তুমি ওকে ছাত্রী বানিয়েছ।'

'বিভা ঠাট্টা করেছে।'

'তোমার এই মাস্টারগিরিটা, যদি ছাড়তে পারতে অনী !'

'ইরা, তোমার আজ কি হয়েছে ?'

'সব কিছুকে নিজের ছাঁচে ঢালতে চাও কেন ? এত খুঁতখুঁতে তুমি, মানুষকে এমন বিচারের চোখে দেখ সেইজন্যেই হয়তো তোমার কাছে সহজ হতে পারে না কেউ।'

'তুমিও পার না, তাই না ইরা ?'

'আমার কথা বাদ দাও। বিভা বলছিল··'

'কি বলছিল ?'

'বলছিল এষা তোমাকে খুব মানে, তোমার কথা শোনে। কিন্তু এখন চল, সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বাড়িতে বিভা বসেছিল, কনক, সতীশ ওদের সঙ্গে গল্প করছেন।

'মেসোমশায়, এই যে ইরা,' ইরা ওঁকে নমস্কার করল নিচু হয়ে।

'এসো মা', সতীশ ইরার দিকে ভাল করে চাইলেন। ইরাকে অনী ভালবাসে, আর অনী এখন তাঁর প্রিয়, অতি প্রিয়।

'তোমরা আসতে দেরি করলে আমরা অনেক ভাল ভাল জিনিস খেয়েছি।'

বিভা মিষ্টি হেসে বলল। চা-এর সরঞ্জাম এখনো ছড়ানো, এষা অনীর দিকে চাইলে সগর্বে। অতিথি সেবার কোনো ত্রুটিই হয় নি।

'এখন ক'দিন থাকবে তো ?'

ছবির প্রশ্নের জবাবে ইরা বললে, 'ইচ্ছে ছিল মাসিমা, তবে রায়পুর থেকে যেমন তাগাদা আসছে কি হবে বলতে পারি না।'

'ইচ্ছে না হলে থেকে যাও না, কলকাতায় তো সব সময়ে আসা হয় না।'

'নিলীনা মাসিমা বলছিলেন…'

'যাই বলুন না কেন, ইচ্ছে না হলেও যেতে হবে এত কি বাধ্য-বাধকতা আছে তোমার?'

'একটু ঘনিষ্ঠ হলেই দায় এসে পড়ে কনকদা, তাই না?'

সতীশ দেখলেন ইরার চোখের মণি বিস্ফারিত, যেন সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে সে, নয়তো শারীরিক যন্ত্রণা পায়, অথবা বিরাট কোনো উদ্বেগের মধ্যে বাস করে। যা তাকে ভয় দেখায় যন্ত্রণা দেয় তা যেন তার ধারণার বাইরে। তাই চোখের মণি অমনি সদাই বিস্ফারিত চেয়ে থাকে।

মনে আশ্চর্য মমতা বোধ করলেন, কোমল হাত বুলিয়ে দিল কে, কিন্তু ঐ মেয়েটি, ঐ বিভার চোখে কি বিদ্রূপ ভরা চাহনি। সতীশ নিজের ভাবান্তরে ভারি অবাক হলেন। কিন্তু ইরা বেশ কথা বলে।

'তা বই কি, প্রত্যেক সম্পর্কেরই দায় আছে, সে দায় নিতেই হয়।'

'শুধু দায় কেন', বিভা এতক্ষণে মুখ খুলল, 'অনীর মা ওকে ভালবাসেন, খুব ভালবাসেন। সেই জন্যেই বোধ হয় ও ফিরে গেলেই খুশি হবেন।'

'আমরা কিন্তু ইরা থাকলেই খুশি হব।'

কনক এক গাল হাসল, যেন এই কথাটি সে বলবে তবে সবাই আসর ভেঙে উঠবে।

ওদিকে নিলীনা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ইরা তাঁর কাছে এতটা অপরিহার্য হয়ে উঠবে তা কেউ ভাবে নি।

বিজয় মিত্রর সময় বড় কম, তাঁর সময়ের দাম অনেক। খুব কম সময়ই স্বামী এবং স্ত্রী বসে গল্প করবার সময় পান। নিলীনা

মিত্র সব সময়ে বলেন, 'তোমার সঙ্গে যে একটু কথা বলব, সময় পাই না।'

সেইজন্যে মাঝে মাঝে গরমের সময় দু'জনেই পাহাড়ে অথবা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যান। সেখানে গেলে আবার এত এত সময় নিয়ে কি করবেন তা ভেবেই পান না। বিজয় মিত্রকে ডাক্তার প্রতিবারই বলে দেন, 'নিজেকে আলগা করে দেবেন, একেবারে কোনো কাজ করবেন না।'

নিলীনা মিত্রকে বলেছেন, এমনি মাথার কাজ করে যারা তারা বিশ্রাম না নিলে কি কি অসুখ হতে পারে।

বাইরে গিয়ে তাই বিজয় মিত্রও চেষ্টা করেন ডাক্তারের কথা শুনে চলতে।

'কোনো কাজের মধ্যে পাবে না আমাকে। আমি শুধু খেতে আর ঘুমোতে এসেছি' বার বার বলেন।

দ্বিতীয় দিনই উসখুস করেন। তিনদিনের দিন রীতিমতো অধীর চঞ্চল; 'এইরকম বসে বসে কেউ সময় কাটাতে পারে?'

তাই, হোটেলের ম্যানেজার অথবা আর কোনো ভদ্রলোক এসে যখন বলেন, 'স্যার, আপনার সময় নষ্ট হবে জানি, কিন্তু আমার এ কাজগুলো যদি দেখতেন একটু...'

তখন তিনি রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, 'ও ইয়েস, না না, সময় আছে বই কি! শরীর আমার খুব ভাল আছে, নিয়ে আসুন।'

সেদিন বলেন 'কাগজ নিয়ে আসুন', পরের দিনই ম্যানেজারকে বলেন, 'কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে। একটা ভাল টেবিল, রীডিং ল্যাম্প পাঠিয়ে দিন। আপনার কাগজপত্রের যা অবস্থা দেখছি, সব টাইপ করিয়ে ফেলা দরকার। এখানে টাইপিস্ট পাব না?'

তারপরই অনিমেষকে তার করেন, 'অমুক অমুক বই নিয়ে চলে এস, সেহোড় কলিয়ারীর ফাইলটাও এনো।'

এই রকমই হয়ে চলে বছরের পর বছর। অনিমেষ, কি আশ্চর্য যখন বাবা মা'র কাছে যায়, তখন দেখতে পায় বাইরে গিয়ে ওঁরা দুজনেই কত সহজ কত অন্তরঙ্গ।

বাড়ির সংসারে নিলীনা এসে লোকজনকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন, বা রান্নাবান্নার খোঁজ নেবেন এ আশাই করা যায় না। সব তিনি লতার ওপর ছেড়ে রাখেন। লতা জানে তাঁর সংসারে কে কখন কি খায়, বাগান থেকে ফল এনে বছর বছর কেমন করে আচার, মোরব্বা, সিরাপ করে রাখা হয়, মালী ও জমাদার-এর পরিবারকে রোজ সিধে দেওয়া হয় কি হিসেবে।

এখানে এসে অনিমেষ দেখে নিলীনার কাছে সবাই যেন কেমন করে জড়ো হয়েছে। ম্যানেজার সকালেই কুশল-সংবাদ নিতে আসেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন কাল অমুক রান্নাটা কেমন লাগল, অমুক ঘরের ভদ্রলোক ভারি পেটের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁকে কি দিলে ভাল হয়।

আরো অনেক রকম কথা, নিলীনা কি জানেন কেমন করে আলু রাখা চলে। এবার ম্যানেজার আলু, ডিম যা রাখছেন তাই-ই তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েকে কোন্ ইস্কুলে দিলে ভাল হয়, হোটেলের উন্নতির জন্যে আর কি কি করলে ভাল হবে এইসব।

দেখে অনিমেষ অবাক হয়, যতবার দেখে ততবারই।

'মা, রায়পুরে তো তুমি কক্ষনো এসব সংসারের কথা নিয়ে মাথা ঘামাও না?'

নিলীনা বলেন, 'অনী, তুমি কিছু বোঝ না। ওখানে লতা আছে তবু আমি কেন ও সবের মধ্যে যাব?'

'তা বটে।'

'অনী, সব কথা নিয়ে তুমি এমন মাথা ঘামাও কেন বলত? লতা কি করছে না করছে তা নিয়ে কথা বলতে যাই না সেটা

আমার স্বার্থপরতা নয়। ওর কাছ থেকে ও-কাজটুকু কেড়ে নিলে ও কি নিয়ে থাকবে বল ?'

'কিন্তু মা', অনিমেষ রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে বলে 'লতাকে এমন করে সব কাজের ভার কিন্তু আমি দিয়েছি।'

'তাই হবে।'

নিলীনা আর কথা বাড়াতে চান না।

নিলীনা ব্যস্ত হয়ে পড়েন রান্নাবান্না বাগান ইস্কুলের সমস্যা নিয়ে। বিজয় মিত্রকে খুশি খুশি দেখায়, কেননা এদিকে যেমন তিনি কাগজপত্র, হিসেব দেখে-টেখে লোকদের অনেক টাকার কাজ করে দেন, ওদিকে তেমনি আশ মিটিয়ে সকলের ওপর শাসন চালান।

ডাক্তারকে বলেন কিভাবে ডিসপেন্সারি রাখা উচিত, সেক্রেটারীকে বলেন ক্লাব চালাবার নিয়ম কি কি। তা ছাড়া যা যা পরিকল্পনা মাথায় থাকে সবই বলে যান, 'এ রাস্তাটা চওড়া করে ফেলা উচিত, ঐ স্কুলবাড়িটা উড়িয়ে দিয়ে একটা বড় পার্ক। শহরের একদিকে হবে জনবসতি। সেখানে আর কিছুই থাকবে না। শুধু স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, দোকান দুটো একটা।'

তিনি বলেন আর শহরের গণ্যমান্য লোকরা শোনেন। কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা যা শোনেন তা নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

'যা বললেন তা চমৎকার! সত্যি, এত সব আপনার মাথায় আসে তো!' তাঁরা বলেন।

বিজয় মিত্র ভারি গলায় বলে যান অন্য দোকান, বাজার, সব থাকবে মাঝখানে। শহরের অন্যদিকে থাকবে হোটেল, সিনেমা, খেলার মাঠ। জনবসতির সঙ্গে তার কোনো যোগ থাকবে না।

তিনি কথা বলেন, তাঁর চশমার কাঁচে আলো চকচক করে, ভারি গলার আওয়াজে সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। অনিমেষের কেবলি মনে হয়

বিজয় মিত্র সর্ব-শক্তিমান হতে চাইছেন, ঈশ্বরের মতো। বাড়ি, বাজার, পার্ক, যেন তিনি বললেন আর এ শহরের ম্যাপের ওপর টুপ টুপ করে বসে যাবে যেখানে যেটি মানায়। কিন্তু ঈশ্বর যারা হতে চায়, তারা বোধহয় সব সময় এগিয়ে ভাবে, বড্ড বেশি এগিয়ে ভাবে। দেশের অবস্থা, দারিদ্র্য, অসহায়তা, কিছু তাদের মনে থাকে না। মনে থাকে বলেই যারা ভাবে, অনিমেষ জানে বিজয় মিত্র তাদের দলে নন।

এইরকমই প্রতিবার ঘটে।

আসলে নিলীনা অথবা বিজয় মিত্র কেউই অবসরের মানুষ নন, তাই অবসর ওদের কাছে ক্লান্তিকর ঠেকে।

অনিমেষ বলে, 'আসলে ওঁরা একা একা থাকতে ভয় পান, তাই মানুষ খোঁজেন।'

ইরা বলে, 'তুমি যা বলছ তা সত্যি নয়। হয়তো কাজ করতে ওঁদের ভাল লাগে।'

এইরকমই হয়। এ পর্যন্ত দেখা গেছে অনিমেষের মা বাবার সম্পর্কে কোনো কথা শুনতে ইরা একেবারে নারাজ।

তা রায়পুরে, নিজের বাড়িতে, বিজয় মিত্রের সময় যত দুর্মূল্যই হোক না কেন, এবার ইরা যখন কলকাতায় দেরি করতে লাগল তখন নিলীনা আর স্থির থাকতে পারলেন না।

তিনি বিজয় মিত্রকে ডেকে পাঠালেন, সকালে চা খাবার পর।

বিজয় মিত্র অবাক হলেন। নিলীনা ভাল করেই জানেন ব্রেকফাস্টের পর তাঁর সময় কত কম, কি পরিমাণ কাজ থাকে, তবু ডাকলেন কেন?

'ও ইয়েস্' বলে চটিতে পা গলাতে গলাতে হঠাৎ মনে পড়ল নিলীনাই একদিন তাঁকে সময়ের ব্যবহার শিখিয়েছিলেন। কিসের পরে কি করতে হবে, সময় নষ্ট করা চলবে না, না, বিজয় মিত্র স্ত্রী-র কাছে ঋণী। এ ঋণ শোধ হবার নয়।

আশ্চর্য, এ সময়ে নিলীনা বাগানে থাকেন। কিন্তু লতা বললে.
'মা ঘরে আছেন।'

এটাও রুটিনের ব্যতিক্রম। ব্যাপারটা কি, বিজয় মিত্র মনে মনে ভাবলেন।

নিলীনা বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। সব সময়ে কাজ করেন তাই কিছু না কিছু কাজ থাকে। এখন তিনি কাঁচি হাতে বারান্দার টবের গাছগুলো ছাঁটছিলেন। তাঁর কাঁচাপাকা খোলো-খোলো আঙুরের মতো চুলে রোদ, সাদা শাড়ি লুটিয়ে পড়েছে, সূর্য কিরণকে মনে হচ্ছে মাথার মুকুট।

'ওরা ক্যাকটাসে জল দিয়েছে।'

'কি বললে ?'

বিজয় মিত্র ভারি অবাক হলেন। কে গাছে জল দিয়েছে সেই জন্যে তাঁকে ডেকে আনা, এর মানে কি ?

'জল দিয়েছে।'

নিলীনা আস্তে বললেন। তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়েছেন।

'তাতে কি হয়েছে ?'

'গাছটা মরে যাবে। ইরা জানে এ গাছে জল দিতে নেই।'

'আমি কি করব নিলীনা ?'

'এ জন্যে তোমায় ডাকি নি আমি। দরকারি কথা আছে।'

'বল।'

নিলীনা স্বামীর দিকে তাকালেন। বললেন, 'ইরা আসছে না কেন, আমার চিন্তা হচ্ছে।'

'হয়তো কলকাতায় ভাল লাগছে ওর।'

'ওর ভাল লাগছে কিনা জানি না। তবে বিভার মা লিখছে ওর সঙ্গে অনীর দেখা হয়েছে। ওরা একসঙ্গে বুঝি পার্কেও গিয়েছিল' নিলীনা ঠোঁট কামড়ালেন।

'গেলই বা, তুমি ও নিয়ে ভেব না।'

'আমি ভাবছিলাম…'

'কি, নিলীনা?'

'ভাবছিলাম অনীর বিষয়ে হয়তো আমরা খুব সুবিচার করি নি। তুমি এত রেগে উঠলে, যে কিছু বলাই গেল না।'

'এখন এ-সব কথা থাক, নিলীনা।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এর ফল ভাল হবে না। অনীকে আমি জানি ওর বড্ড জেদ।'

'ও ইয়েস। অনীর জেদ, অনীর মতামত, সব জানি আমি। এ-ও জানি অন্য দুটো ছেলের চেয়ে ওর মধ্যে পদার্থ অনেক বেশি আছে। কিন্তু তা বলেই আমি তার সব কথা মেনে নিতে পারি না। সে আমার ছেলে!'

বিজয় মিত্র এগিয়ে এলেন। এমনিতে যে মানুষ সংযমের আদর্শ, ছোটছেলের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি ধৈর্য হারান। প্রায় চীৎকার করে বললেন, 'সে আমার ছেলে! ইয়েট হি ডেয়ার্স ট্যু জাজ মী! সে আমার সমালোচনা করে, আমাকে সন্দেহ করে, অ্যাকিউজ করে, আমাকে।'

তিনি টেবিলে হাত রাখলেন, নিলীনার হাত ধরলেন। বললেন, 'অথচ নিলীনা, আমি খারাপ ফাদার নই। মদ খাই না, সুধাংশু নন্দীর মতো বে হিসেবী নই, অন্যায় করি না। তবু ও আমায় বিশ্বাস করে না। ইয়েস, আমার ছোট ছেলে। সে জন্যে নিলীনা, আমি তোমায় দায়ী করব। তুমি ওকে স্নেহ দিয়েছ, বেশি স্নেহ দিয়েছ, প্রয়োজনের বেশি।'

'প্রয়োজনের বেশি স্নেহ দিয়েছি আমি, অনীর মা!'

নিলীনার কণ্ঠের তীব্র বেদনা, অপার অবিশ্বাস রায়পুরের বাড়ির সর্বত্র ছুটে গেল। কোনোদিন নিলীনার গলা এত জোরে শোনা যায় নি। তাঁর চরিত্রে সংযম, আশ্চর্য শোভনতা, বুক ফেটে গেলে-ও বাইরে প্রকাশ করেন না।

আজ শোনা গেল। রায়পুরের বাড়ির সবাই ছুটে এল। দুই ছেলে, তাদের বউ, কাজ করবার লোকজন, সবাই শুনতে লাগল নিলীনার কথা। বড় আশ্চর্য হয়েছেন নিলীনা। কেন না সন্তানকে বেশি ভালবাসার জন্যে কেউ মা'কে অভিযুক্ত করে না, অন্তত তাঁর মতো মাকে।'

'আশ্চর্য। আজ তোমার কাছে এ কথা আমায় শুনতে হল।'

'আমার কথা কি মিথ্যে?'

'তোমার কথা মিথ্যে না সত্যি তা নিয়ে আমি কোনোদিন প্রশ্ন তুলি নি, আজও তুলব না।'

নিলীনা ঘাড় ফেরালেন, একটি কথায় জানিয়ে দিলেন কে সত্যি বলছে কে মিথ্যে বলছে তা নিয়ে প্রশ্ন করা, প্রশ্ন মনে আনা তাঁর স্বভাব বিরোধী। ছোট বা সংকীর্ণ কোনো জিনিস তিনি চিন্তাতেও আনতে পারেন না, তাঁর সবটুকুই নিখাদ মর্মর, যেমন শ্বেত পাথরে, নিখাদ মর্মরে দেবদেবীদের মূর্তি হত। তাঁর মধ্যে কোনো ফাঁক নেই।

'তবে তোমায় জানিয়ে রাখি, অনী যদি তোমায় অ্যাকিউজ করে থাকে, আমাকেও সে ছাড়ে নি। তুমি বলছ আমি অধিক স্নেহ দিয়েছি। সে বলে আমি স্নেহহীন, পাষাণ।'

'ইডিয়ট।'

'ও নো, অনী বোকা নয়। অনী সব বোঝে জানে, কিন্তু ওরও তো অভিযোগ করবার আছে, নালিশ আছে আমাদের বিরুদ্ধে।'

'কি নিয়ে নালিশ।'

'ও ইরাকে বিয়ে করতে চাইল, আমরা সে কথায় আমলই দিলাম না। অনী বুঝল, না, ইরাকে আমি যত স্নেহই করি, তবু সুধাংশুর স্বভাবের কথা মনে হয়, ওর মা'র অসুখের কথা মনে হয়। বিয়েটা বড় সিরিয়াস জিনিস, অনী বুঝল না।'

নিলীনার গলা ভেঙে গেল, ভারি হল। দুঃখ হলে তিনি কাঁদেন না, কাঁদতে পারেন না।

এ বাড়িতে অনেক সময় বড় বড় বিপদ এসেছে। রণজয়ের অসুখ হয়েছিল, মেনিঞ্জাইটিসে মরমর, নিলীনা ঠায় বসেছিলেন রুগীর পাশে। লতা কাঁদছিল, সবাই কাঁদছিল, তিনি শুধু নিচু হয়ে বলেছিলেন 'বড় খোকা, ভেব না, লতাকে আমি বুকে করে রাখব।'

তাঁর গলা ভেঙে গিয়েছিল, তা ছাড়া ঐ 'বড় খোকা' বলে ডাক চোখের আকুল আতঙ্ক এখনো বিজয় মিত্রের মনে আছে।

এ গলার স্বর সবাই চেনে। বিজয় মিত্র অবাক হলেন। নিলীনা এত অভিভূত হয়েছেন তা তিনি আগে বোঝেন নি।

তিনি বললেন, 'অনী যা বলবে তাই তাকে করতে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই তা ছাড়া সে আমাকে কথা দিয়েছে, কলকাতা থেকে কাজ শিখে পরীক্ষা দিয়ে এখানে আসবে। এখনি কিছু বিয়ে করবার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না। আসল কথা হল তুমি ইরাকে চাও কি না!'

নিলীনার হঠাৎ মনে হল স্বামী বলবেন, 'বউ হিসেবে চাও কি না!'

তিনি চোখ তুলে তাকালেন। মন থেকে এ প্রস্তাবে সায় দেওয়া তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। কিন্তু স্বামী যদি বলেন তবে তিনি ভেবে দেখতে পারেন, তাঁর পক্ষেও মেনে নেওয়া সহজ হয়। স্বামী যদি তাই বলেন, নিলীনার মনে প্রত্যাশা জ্বলে উঠল, এ বাড়িতে অনীর হাত ধরে সুখ আসুক, শান্তি আসুক, সহজ হয়ে থাক সব।

তাঁর প্রত্যাশা নিভে গেল।

'ইরা থাকলে তোমার কাজকর্ম এসবে সুবিধে হয় সেইজন্যেই রাখা। নইলে, সুধাংশুর মেয়েকে চ্যারিটি করবার জন্যে এখানে তুমি নিশ্চয়ই রাখ নি!'

'না।' নিলীনা, নিজের সম্পর্কে অন্যদের মনে খারাপ ধারণা হবে তা জেনেও সত্যি ছেড়ে মিথ্যে বলতে পারলেন না।

এ বাড়িতে দান হয়, সাহায্য হয়, তবু একেবারে চ্যারিটি কখনো করা হয় না। প্রতিটি দানধ্যানের পেছনে কোনো না কোনো লক্ষ্য থাকে বিজয় মিত্রের। তার মানে এই নয় যে তিনি অর্থলোভী। অমন দু একহাজার টাকাকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

নিলীনার কথা অবশ্য আলাদা। বাপের কাছে থেকে পাওয়া সম্পত্তি আছে তাঁর। গরিব দুঃখীকে দেবার জন্যে তিনি স্বামীর মুখাপেক্ষী হন না। তাঁর সহৃদয়তার কথা সবাই জানে।

তবু, তিনিও ইরাকে ঠিক সাহায্য করবার জন্যে রাখেন নি।

'ও থাকলে আমার সুবিধে হয়। ওর ওপর আমি নির্ভর করতে পারি। ও থাকলে কেউ এই ক্যাকটাসটায় জল দিত না।'

তিনি সুন্দর গাছটাকে উপড়ে ফেললেন। বললেন, 'মরে যাবে।'

বিজয় মিত্র বললেন, 'ওকে আসতে লেখ। বল তোমার দরকার আর অনীকে একটা চিঠি লিখে দিও। জানিয়ে দিও ও আমায় কথা দিয়েছিল কলকাতায় থাকবার সময়টা আমার ইচ্ছার অন্যথা করবে না।'

'সে তুমি লেখ। আমি পারব না।'

'বেশ আমিই লিখব। আর, ইরার জন্যে তোমরা কেউ চিন্তিত হয়ো না। বরঞ্চ ওর বিয়ের চেষ্টা দেখ। তাতেই ওর উপকার করা হবে।'

'ইরা রাজি হবে কেন।'

'এইজন্যে রাজি হবে যে ও জেনে গিয়েছে ওকে বিয়ে করলে অনী ডিসইনহেরিটেড হবে।'

'সবাই কি টাকার জন্যে ভাবে!'

'না না। ও অনীর শুভার্থী হলে এত বড় অনিষ্ট হতে দেবে না। আমি বিশ্বাস করি মেয়েটি ভাল।'

বিজয় মিত্র বেরিয়ে গেলেন।

॥ ৯ ॥

ইরাকে নিলীনা মিত্র চিঠি লিখলেন। এদিকে রণজয় লতাকে বলল, 'তুমি বোকা, একটি আস্ত বোকা। ইরা এ-কয়দিনেই মাকে হাত করে ফেলল, আর তুমি পারলে না?'

'হাত করে ফেলবার কি আছে? মা ইরাকে ভালবাসেন।'

'হ্যাঁ, এদিকে অনী, ওদিকে ইরা, হয়েছে বেশ।'

লতা আর কিছু বলল না। অনী আর ইরাকে সে-ও ভালবাসে। অনীর কাছে তার ঋণের শেষ নেই। এ সংসারের মানচিত্রে সে যেটুকু জায়গা দখল করে আছে, তা সবই অনীর দেওয়া। সে তাকে দেখিয়ে দিল কেমন করে এ সংসারের একজন হতে হবে।

রণজয়ের বউ হয়েছে সে, নিলীনা মিত্রর পুত্রবধূ, কুণালের মায়ার মা। তবু যেন এদের কারো মন পায় নি, কারো সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি তার। লতা কারণ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। এরা সবাই ভাল, অতি ভদ্র তবু কেন এরা আপন করে নিতে জানে না তাই ভেবেছে।

অনী তাকে বুঝিয়ে দিল এমন করে মন গুমরে কোনো লাভ নেই। এরা ভাল বাসল কি না বাসল সে জন্যে অপেক্ষা না করে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা অনেক অনেক ভাল।

'অবশ্য যদি বাঁচতে চাও, তবে!' অনী ওর দিকে হাসিভরা চোখ তুলে বলেছিল। একমাত্র অনীই বুঝেছিল লতা যে ভাবে দিন কাটাচ্ছে তাতে ওর জীবনীশক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে। সে ছাড়া আর কে জানে লতা মনে মনে কি ভীষণ ইচ্ছে নিয়ে সেই চাঁদিনীরাতে বাগানে গিয়ে কুয়োর পাশে দাঁড়িয়েছিল?

রণজয় শিকারের ইংরেজী পত্রিকা ওলটাচ্ছিল, লতা ওর পায়ের ব্যথায় মালিশ করছিল।

'আচ্ছা, তোমার বাবা এই যে অনীর সঙ্গে ইরার বিয়েতে বাধা দিচ্ছেন তুমি কিছু বলছ না যে ?'

'কি বলব ?'

'এটাকে ভাল মনে কর, না মন্দ, একটা কিছু বলবে না ?'

'অনী বিয়ে করতে চায়, ঠিক আছে, ও নিজের মত অনুযায়ী কাজ করছে। বাবা বাধা দিচ্ছে, হি ইজ করেক্‌ট, তাঁর মত অনুযায়ী কাজ করছেন।'

'তুমি কি এর চেয়ে বেশি কিছু বলবে না ?'

'না। যতদিন ওল্‌ডম্যান রাজত্ব করছেন আমি কিছুই বলব না। লেট হিম ডাই, আমি তখন জানতে দেব আমারও মতামত আছে।'

'ততদিন কি অনী-ইরার সমস্যাটা দাঁড়িয়ে থাকবে ?'

'না, তা থাকবে না। তবে আমরা অনীকে নিয়ে না ভাবলেও পারি। মা ভাবছেন, বাবা ভাবছেন, অনীর ব্যাপারটা এখন সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী ভেবেচিন্তে ঠিক করুন। আমি সামান্য লোক, আমি কেন মাথা গলাতে যাব ?'

'কি যে বল, তোমার বাবা তো রেগে গেছেন।'

'লতা, তুমি বড় বোকা, রণজয় বন্দুকের ছবিতে চোখ রেখে বললে, 'অনীর সঙ্গে বাবার অন্য ব্যাপার। এই দেখনা, এই যে আমি এত বাধ্য, অজয় এত বাধ্য, বাবা আমাদের বিশ্বাস করেন কি ? অনীর সঙ্গে যে এত মনকষাকষি, একমাত্র ও বললে ওর হাতেই ছেড়ে দেবেন ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, সম্পত্তির হিসেব।'

রণজয়ের কথা খুব মিথ্যে নয়। লতা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'কি জানি কোনটা মিথ্যে, কোনটা সত্যি ভেবে পাই না।'

'ভাবতে চেষ্টা কর না। আমি ভাবতে চেষ্টা করি না, দেখে শিখতে পার।'

'অনীর জন্যে চিন্তা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে সেটা তো অস্বীকার করতে পারি না।'

বিব্রত হয়ে লতা ইনার ঘরে গেল। রণজয় ভাবল ইরা চলে এলে সে-ও কম খুশি হবে না। আছে, এমন কিছু আছে ইরার মধ্যে, যা রণজয়ের মনকে এবং চোখকে টানে।

ইনা ঘরের মেঝেতে একগাদা জামাকাপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। রঙিন এবং সাদা রেশম, জরি, ব্রোকেড। শাড়ি জামার স্তূপ থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'সবুজ শাড়িটা পাচ্ছি না।'

'একটা শাড়ি তো কাল দর্জিকে পাঠালে রিপু করে দেবার জন্যে।'

'সর্বনাশ! ঐ শাড়িটা পাচ্ছি না বলেই তো চাকরটাকে বকছিলাম, মা শুনে ফেললেন।'

'কখন!'

'সকালে। তারপর গিয়ে গাছে জল দিলাম তাতে আরো চটে গেলেন।'

ইনা বিব্রত হয়ে শাড়ির রঙীন স্তূপের মধ্যে বসে রইল।

'অজয় কোথায়?'

'এই তো!'

খাটের নিচ থেকে অজয় মুখ বের করলে। হেসে বললে, 'গুডমর্নিং বউদি, যদিও চা খাবার বেলা নয়, তবুও কেন যেন মনে হচ্ছিল ইনা এবার চা করবে।'

'ওখানে কি করছ?'

'খাটের কতকগুলো ফুটোতে ছারপোকার ওষুধ দিচ্ছি।'

গেঞ্জি এবং পাজামা পরে অজয় পিছলে বেরিয়ে এল। বললে, 'কি ব্যাপার?'

লতা আস্তে বললে, 'তোমার দাদা তো কিছু বলবেন না। তুমি একটু বাবাকে বলবে!'

'কি?'

'অনীর কথা।'

'অনীর কি হল ?'

'এই, অনী যে ইরাকে বিয়ে করতে চায়……'

'মাপ কর বউদি, এ নিয়ে অনেক কাণ্ডই বাড়িতে হয়ে গেছে। হয়তো এ কথা তুললে আবার অশান্তি বাধবে !'

'শুধু অশান্তির ভয়ে অজয়, ও ছেলেটার সুখশান্তি নষ্ট হয়ে যাবে তা বসে বসে দেখবে ?'

'কেন, শুধু সে কথা কেন, বাবা যা বলেছেন ভেবেচিন্তে বলেছেন এ কথা ভাবতে পার না ?'

'ভেবেচিন্তে, না জেদ করে বলেছেন অজয় ?'

যে ভাবেই বলুন, আমাদের কি ওঁদের কথার ওপর কথা বলা উচিত হবে ?'

ইনা এতক্ষণে মুখ খুলল, 'তোমারও এ সব কথা চিন্তা করা উচিত নয় দিদি। কেন না ইরাকে আমার একটুও বিশ্বাস হয় না।'

'কেন ?'

'ও কি কম চালাক ? মা'র মন গলিয়ে ফেলেছে, এখন অনীকে বিয়ে করে জমিয়ে বসতে পারলেই হয় আর কি !'

'ইনা।'

অজয় ধমক দিলে। লতার দিকে চেয়ে বললে, 'ওর কথা শুনো না বউদি।'

'যদিও ইরা এ বাড়ির বউ হলে আমি খুশি হব, খুব খুশি হব' ইনা এবার হাসল।

লতা কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। অজয় বললে, 'এই যে বলছিলে, তুমি ইরাকে বিশ্বাস কর না !'

'করি নাই তো !'

ইনা ঠোঁট উল্টে আবদেরে মেয়ের মতো মুখ করলে, 'এখন যে বড়দি খুব ইরার কথা ভাবছ, ও এলে সবাই ওকে ভালবাসবে,

তোমার কথা ভুলে যাবে। আমি তো সবচেয়ে আগে ভুলে যাব, কেন না ইরাকে আমার খুব ভাল লাগে।'

'এমন ছেলেমানুষের সঙ্গে কথা বলবার কোনো মানেই হয় না।' একটু হেসে লতা বেরিয়ে এল।

নিলীনার ঘরে ঢুকবার আগে সে একটু দাঁড়াল, দরজায় টোকা দিল।

'এস লতা।'

নিলীনা কি লিখছিলেন, মুখ তুলে চাইলেন। লতার ঘন কালো চুলের মধ্যে সিঁদুরের গাঢ় লাল রেখা অতি ক্ষীণ, চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত, চুল উস্কখুস্ক, তবু ওকে দেখে ওঁর খুব ভালো লাগল।

'কিছু বলবে লতা।'

লতা একটু হাসল। বলতে চায় সে, কিন্তু সাহস হারিয়ে ফেলেছে অনীর সঙ্গে ইরার বিয়ে দিন, এ কথা কেমন করে নিলীনাকে বলা যায়? অথচ না বললেও নয়। আজ শ্বশুরের মুখে একটা কথা শুনে সে ভয় পেয়েছে। উনি যখনই বলেছেন 'তার চেয়ে ইরার বিয়ের চেষ্টা দেখ,' তখনই ওর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

তখনই মনে হল কাল অবধি যা মনে হচ্ছিল ধোঁয়া ধোঁয়া, হেঁয়ালি 'আজ তা স্পষ্ট হয়ে গেল। বিজয় মিত্র নিশ্চয়ই অন্য কারো সঙ্গে ইরার বিয়ের চেষ্টা করছেন। তাঁকে সাহায্য করছে রণজয়, তার স্বামী। চেষ্টা করেছেন, অনেকদূর এগিয়েছেন, অথচ নিলীনাকে কথা বলবার সময়ে মনে হল যেন এইমাত্র তিনি কথাটা ভাবলেন, এখনি মনে এল।

লতা জানে। লতা কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে গিয়ে ইরার সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেওয়া এমন একটি চিঠির খসড়া দেখেছে, যাকে বিয়ের প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই মনে করা চলে না। লতা জানে,

কেননা তাকে বউ করে আনবার আগে তার বয়স, স্বাস্থ্য, চেহারা, বংশপরিচয়, শিক্ষা, গুণ, যোগ্যতা, প্রাপ্য টাকাপয়সা, অলঙ্কারের হিসেব সব জানাতে হয়েছিল, তবে বিজয় মিত্র মেয়ে দেখতে রাজি হয়েছিলেন।

নিলীনা কলমটা থামিয়ে তার দিকে চেয়ে আছেন। শান্ত সংযত মুখের চেহারা, চোখের দৃষ্টি গভীর অথচ উজ্জ্বল।

'অনীর কথা বলছিলাম,' লতার গলা মৃদু।

'অন্য সময়ে বললে হত না?'

নিলীনা কোমল স্বরে বললেন, তার দিকে তাকালেন। যেন তাঁকে ঘিরে অনেক, অপার সময়। সময়ের চলামানতা যেন এ ঘরের বাইরে এসে চৌকাঠ থেকেই অন্যপথে চলে গিয়েছে। তাই এ ঘরে বসে নিলীনা টের পান না কিছু।

তিনি নিজে অটুট, কঠিন আছেন, তাই জানতে পারেন না এ বাড়ির অন্যত্র সময় তার কাজ করে চলেছে। দেখতে পান না লতার চুলে পাক ধরে গেল এ সংসারের কাছ থেকে সাদামাটা ভালবাসা চেয়ে চেয়ে। দেখতে পান না রণজয়ের কপালের রগে চোখের শিরায় উচ্চাশা দপদপ করে সবসময়ে, সবসময়ে রণজয় এ-বাড়ির একচ্ছত্র অধিপতি হতে চায়। দেখতে পান না বিজয় মিত্রও আশ্চর্য কোনো উচ্চাশায় ভুগছেন। টাকা, আরো টাকা, প্রতিপত্তি, আরো প্রতিপত্তি, এসব তাঁকে আর তেমন করে টানে না। এখন তিনি অনীর আনুগত্য চাইছেন। অনীর ভালবাসা নস্যাৎ করে দেবার, এক কথায় মানুষের ভাগ্য গড়ে দেবার চেষ্টা করছেন, যা তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে। মানুষ যখন মানুষের ভাগ্য গড়ে দেবার চেষ্টায় স্বেচ্ছাচার খাটায়, তার ফল ভাল হয় না। এমনি করে বলেই ইতিহাসের রাজাদের পিঠে গুপ্তঘাতকের ছুরি এসে বেঁধে।

নিলীনা জানেন না, কিছুই জানেন না। তাঁর জগৎ আলাদা

চিন্তা অন্য বৃত্তে ঘোরে। তিনি কুকুর পোষেন, গাছপালাকে যত্ন করেন, ইস্কুল, আশ্রম, হোম, হাসপাতাল, নানারকম কাজ নিয়ে থাকেন। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, যা কিছু মানুষকে ক্ষয় করে, জীর্ণ করে সবকিছুকে তিনি বাইরে রেখেছেন, ঐ নীল পর্দার বাইরে।

'লেডী, এ গ্রেট লেডী,' সায়েবরা বলে যায়। গরিবরা বলে যায়। গরিবরা বলে 'মাইজী গরিবের মা বাপ!' গৃহস্থরা ওঁর কথা উঠলে অভিভূত হয়ে থাকে। ওঁকে যারা শুধু শৌখীন, বিলাসী, শখের সমাজসেবিকা ভাবে তারা ভুল করে। নিলীনা মিত্রের চরিত্রে কোথাও ভান নেই। যে অনুভূতি হৃদয় থেকে আসে না তাকে তিনি আমল দেন না। প্রতিটি কাজের পেছনে তাঁর আন্তরিক উৎসাহ, সমর্থন থাকে।

কিন্তু, লতার মনে হয় এত নিখুঁত হওয়া ভাল নয়। এমন অটুট, মহিমায় অচল থাকা যেন জীবনের ধর্মকে অস্বীকার করা। জীর্ণ হওয়া স্বাভাবিক, পৃথিবীতে প্রতিটি জিনিসই জীর্ণ হয়।

এ সব কথা নিলীনাকে বলা যায় না। উনি বুঝতে পারেন না। অনেক কিছুই বোঝেন না, যেমন অনীর কথা। অনী এই প্রথম একটা কিছু নিজে নিজে করতে চেয়েছে। লতা জানে সে তা করবেই। অনীর ভালবাসার, তীব্রতা দেখে লতা ভয় পেয়ে গেছে। নিলীনা কেন বুঝছেন না এটা একটা ছেলেখেলার বিষয় নয়? এত না বুঝে, এত না জেনে থাকা ভাল নয়। লতার এখন কেবলই মনে হয়, ঐ উন্নত সুন্দর শরীর, বড় বড় চোখের অচঞ্চল দৃষ্টি দেখে মনে হয়, এত নিখুঁত হওয়ার জন্যে, এমন অনন্য হবার জন্যে নিলীনা একদিন ভয়ানক শাস্তি পাবেন।

'পরে বললে হত না লতা!'

নিলীনা আবার অস্ফুটে বললেন। অনেক সময়ে তাঁর লতাকে বলতে ইচ্ছে হয় তিনি ওর কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা ও অনীকে ভালবাসে। বলতে ইচ্ছে হয়, বলতে পারেন না। তাঁর কাছে অনেকে

কৃতজ্ঞ, এ-কথা তিনি প্রায়ই শোনেন। তিনি যে অন্যের কাছে কৃতজ্ঞ, এ-কথাটা বলতে গেলেই কোথায় যেন বাধে। লতা যদি মনে করে তিনি সাজানো কথা বলছেন ?

'না।'

লতা একটু জোরেই বলল, কাছে এল। নিলীনার হাঁটুতে হাত রাখল লতা, নিচু হয়ে বসল। মিনতি করে বলল,

'অনী যদি ইরাকে বিয়ে করে সুখী হয়, তা হতে দিন মা। নইলে, আমার মন বলছে, এত জেদাজেদির ফল ভাল হবে না। অনীর জেদ ভীষণ, ও যা মনে করেছে তা করতে না দিলে খারাপ হবে। হয়তো এমন কিছু হবে যা শুধরে নিতে সময় পাব না আমরা। আপনি শ্বশুরঠাকুরকে একটু বুঝিয়ে বলুন।'

এত কাছে এসে এমন করে কথা বলা লতার এই প্রথম। অবাক হয়ে রইলেন নিলীনা। লতা বেরিয়ে গেল।

লতা বেরিয়ে গেল, কিন্তু কোন একটা দরজা যেন খুলে দিয়ে গেল। সে দরজা দিয়ে অনেক কিছু ঢুকে পড়ল নিলীনার ঘরে। নানারকম উদ্বেগ, অশান্তি, দুশ্চিন্তা।

লতা অনীর কথা বলতে এসেছিল! এখন মনে পড়ল, মায়া আর কুণালকে দূরে পাঠালে ওর কষ্ট হবে, সে-কথা লতা অনীকে দিয়ে বলিয়েছিল। নিজে বলতে সাহস পায় নি। অথচ অনীর কথা সে নিজে এসেই বলল। তা হলে লতা অনীর শুভাশুভের কথা ভেবে এতখানি উদ্বিগ্ন হয়!

লতা বলে গেল অনী যা করতে চাইছে, তা করতে না দিলে খারাপ হবে। হয়তো এমন কিছু হবে, যা শুধরে নিতে সময় পাওয়া যাবে না।

নিলীনা মিত্র ভেবে পেলেন না, এ-কথাটা শোনবার পর থেকেই তাঁর কেন কেবলই মনে পড়ছে পেনচোরা রিজার্ভ ফরেস্টে বন্যার দৃশ্য। কানে আসছে আর্ত চীৎকার, 'মাতাজী! মাতাজী!'

বন্যা, জলের ঘূর্ণি, 'মাতাজী' ডাক, এক বৃদ্ধের ভয়ার্ত মুখ। নিলীনা কলম বন্ধ করলেন, সোজা হয়ে বসলেন।

বৃদ্ধের মুখ, জলের ঘূর্ণি, 'মাতাজী' ডাক, বন্যা, তিনি অস্ফুটে বললেন 'শুকদেব, শুকদেব, শুকদেব !'

মনে পড়েছে, মনে পড়েছে সব।

তখন রণঞ্জয়, অজয় ছোট, অনী হয় নি। হঠাৎ খবর এল পেনচোরা নদীতে বন্যা, বাঁধ ভেঙে গেছে, সাবুই ও বর্‌হই গ্রাম ভেসে যাচ্ছে।

তাঁরা ছুটে গেলেন, গাড়ি নিয়ে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, আরো কয়েকজন। নিলীনার সঙ্গে শুকদেব ছিল, তাঁর বিশ্বস্ত চাকর।

সবাই ভাবছিলেন কেমন করে হল, ইঞ্জিনীয়ার গুপ্তে মাথা নিচু করে বসেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট শুধু বললেন, 'এমন একটা লোককে পাঠালে না গভর্নমেণ্ট, যে আগে ড্যাম করেছে, যার অভিজ্ঞতা আছে? গুপ্তেকে পাঠালে !'

'কি করে হল !'

বিজয় মিত্র আস্তে প্রশ্ন করেন। কেননা ম্যাজিস্ট্রেটের কথা শোনবার পর তবে সবাইয়ের মনে হল গুপ্তে-র কোনো বিচ্যুতি ঘটেছে, তার অভিজ্ঞতার অভাবে কোনো ক্ষতি হয়েছে।

ততক্ষণে তাঁরা পৌঁছে গেছেন। নিলীনা মিত্র দেখলেন পেনচোরা নদী বর্ষায় ফুলে ফেঁপে সগর্জনে সাবুই ও বর্‌হই ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কোথায় বাঁধ, আর কোথায় নদী। নদী যে পথে যায়, সে-পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঁধ দেওয়া হচ্ছিল। ছোট পাহাড়ী নদী, কিন্তু তাকে তার পথে যেতে না দেবার শোধ নিলে বর্ষাকালে।

সেই বন্যাতেই ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান, তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে শুকদেব ভেসে গিয়েছিল। শুকদেব তাঁর বাপের বাড়ি

থেকে এসেছিল, অনেকদিনের লোক। কিন্তু তার জন্যে শোক করেন এমন সময় নিলীনার ছিল না। বন্যাপীড়িতদের জন্যে তখন কাজের বিরাম নেই, সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হত।

তবু মনে আছে।

এখন কেন সে কথা মনে পড়ল? অনী যা চায় তা করতে না দিলে কি ঐরকমই কোনো অনিষ্ট হবে, কোনো সর্বনাশ! না, তা হতে দিতে পারেন না নিলীনা।

ভেসে যেতে যেতে শুকদেব আর্ত চেঁচিয়ে উঠেছিল। যেন অনীও কোন সর্বনাশের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। হয়তো নিলীনা তাকে বাঁচাতে পারেন।

কলম তুলে নিয়ে তিনি চিঠি লিখতে লাগলেন।

ঠিক তখনই, কলকাতায়, ইরা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ হতে পারে না, এ অসম্ভব।'

॥ ১০ ॥

অনিমেষের মা যখন ইরাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন, অনিমেষকেও, অনিমেষের বাবা যখন বড় ছেলের সাহায্যে ইরার বিয়ে ঠিক করে ফেলতে চাইছেন, ঠিক তখনই, কলকাতার বিভাদের বাড়িতে ইরা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দেখছিল ওর জীবনটা অনিবার্য একটা পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে।

সেই একটি ঘটনা অনড়, অচল একটি ছায়ার মতো ওর, অনিমেষের আর এবার জীবনকে চিরদিনের জন্যে অন্ধকার করে রাখবে তা ও বোঝে নি। তবু ওর ভয় হয়েছিল, খুব ভয় পেয়েছিল ইরা। মনে হচ্ছিল ওকে সবাই মিলে জোর করে অনিমেষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সে প্রস্তুত হবার অনেক, অনেক আগে। ভবিষ্যৎ

জীবনকে মনে হচ্ছিল অন্ধকারে এগিয়ে আসা ইঞ্জিনের লাল, ঘোলাটে, প্রমত্ত চোখ !

'তোমরা আমাকে এমন ক'রে ঠেলে দিও না !' ইরা চেঁচিয়ে উঠেছিল।

সেই তার প্রথম প্রতিবাদ, এবং শেষ। বাকী জীবনে সে আর কোনোদিন ভাগ্যের হাতকে বাধা দিতে চেষ্টা করে নি।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটে দুঃস্বপ্নের মতো।

বিভাদের সংসারে সে যখন এসেছিল, তখন তার মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না এরা তাকে সত্যিই ভালবাসে। বিভার মা তার মাসিমা। সম্পর্কটা কাছের নয়। কিন্তু একেবারে দূরেরও নয়। ইরার নিজের কোনো ভাইবোন জীবিত ছিল না, মার অকালমৃত্যু, তার বাবা সুধাংশুর মদ খাবার অভ্যাস, ইরাকে আগলে রাখবার চেষ্টা, সবকিছু তাকে বড় বেশি নিজের মধ্যে ঠেলে দেয়। মানুষের সঙ্গে গলাগলি হয়ে মিশতে সে লজ্জা পেত, অপছন্দও করত।

নিলীনাকে সেই জন্যেই তার পছন্দ হয়।

যে যে কারণে অনিমেষ তার বাড়ির লোকদের দেখতে পারত না, সেই সেই কারণেই ইরা ওঁদের পছন্দ করেছে। কৃতজ্ঞ হয়েছে ওঁরা গায়ে পড়া নন বলে, তাকে যথেচ্ছ একলা থাকতে দেন বলে।

এইভাবে থাকলেই সে সুখী হতে পারত। হয়তো আস্তে আস্তে স্বেচ্ছায় ভালবাসলেও বাসতে পারত অনিমেষকে। কিন্তু অনিমেষ এমন গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলল যে ইরা দেখল সে যা চায় তা হবার নয়। অস্থির, চঞ্চল, বিশৃঙ্খল জীবনের পর নিশ্চিন্ত আরামের আশ্রয়ে যে বিশ্রাম করবে ইরা, তা যেন হবার নয়। তাকে নিয়েই অনিমেষের সঙ্গে ওর বাবার যত গোলমাল।

ইরা কোনোদিন কারুকে বলতেই সুযোগ পেল না, অনিমেষের এই আত্মত্যাগ, প্রেমের জন্যে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কাটাবার সংকল্প, এ-সব ও চায় নি। সত্যি বলতে কি ও অনিমেষকে ভালবাসে কি

না তা কেউই জানতে চায় নি, অনিমেষও না। অথচ, অনিমেষ এমন হইচই বাধিয়ে তুলল যে, ইরাকে বাধ্য হয়ে অনিমেষের আত্মত্যাগের দাম দেবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে হল। কিন্তু কোথায় যেন কি গেল শক্ত হয়ে, অনড় হয়ে. কি যেন বিমুখ হয়েই রইল ভেতরে। সব ফুলে সকলের মালা গাঁথা যায় না, সকলের পথ এক হবার নয়, কিন্তু ইরার কথা কেউই ভেবে দেখে নি। সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল অনিমেষের ভালবাসা, ত্যাগ, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা।

ইরা চেষ্টা করতে প্রস্তুত ছিল। সে শুধু চাইছিল যা হবার স্বাভাবিক ভাবে হোক, নিলীনার জন্যে তার সব সময়ে মন কেমন করছিল, ওঁর আশ্রয় হারাতে হবে এ যেন ভাবতে পারছিল না ইরা। অনিমেষরা কি জানে, আড়ালে, সবাইয়ের চোখের আড়ালে নিলীনা তাকে মাথায় হাত রেখে আদর করেন, 'সুধাংশুর মেয়ে!' অস্ফুটে বলেন। তার বাবাকে উনি বাইরে যাই বলুন, আসলে ঘেন্না করেন না তা ইরা বুঝতে পারে। তার হতভাগ্য, জীবনে ব্যর্থ, মদ্যপ অথচ স্নেহান্ধ বাবাকে নিলীনা করুণা ও মমতার চোখে দেখেন তাতে ইরার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ইরার আর একজনের কথাও মনে হয়, কিন্তু সে-কথা সে সঙ্গোপনেই রাখতে চায়।

এখানে, কলকাতায় এসে, বিভা আর কনককে সে বন্ধুভাবেই নিয়েছিল। সত্যি বটে ওরা ওর ভাইবোন হয় সম্পর্কে, কিন্তু যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক এত দূরের, যাদের ও এত কম দেখেছে, তাদের সঙ্গে ও নিঃসঙ্কোচে মিশতে পারে নি। বরঞ্চ বিভার সঙ্গেই ওর ভাব হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বিভা যেন ওকে কিছুতেই আপন করে নিতে পারল না।

ও আসাতে, এখানে থাকাতে, এদের জীবনেও যে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে তা ইরা বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারলেই

বা সে কি করত? সে তো দেখছিল এদের জীবন সুন্দর। এদের কোনো সমস্যা নেই, মেসোমশায় কৃতী, মাসিমা সুগৃহিণী। বিভা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত, কনক নিজের কাজ নিয়ে আর শীলার সঙ্গে আসন্ন বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। সুখী পরিবারের ছবি।

হঠাৎ যেন ছবির ওপর থেকে রঙ তুলে নিল কে, দেখা গেল আসল ছবি ছিল নিচে, প্রতিটি মুখ যন্ত্রণায় দীর্ণ, আবেগে অন্ধ।

তাই ইরা চেঁচিয়ে উঠেছিল।

কেন না, হঠাৎ বিভার মা তার ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। বলেছিলেন 'ইরা, তুমি এই করলে?'

'কি করেছি মাসিমা?'

ইরা অবাক হয়ে যায়। কি এমন কাজ করেছে সে, যে জন্যে বিভার মা'র মুখ বিভ্রান্ত, অসহায়, রাগে লাল!

'শীলা এসেছিল।'

তা ইরা জানে। শীলা এসেছিল, ওঁর সঙ্গে কথা বলছিল, ইরা মনে করেছিল ওঁদের কথাবার্তা তার শোনা উচিত নয়, সে সরে আসে।

বিছানায় শুয়ে সে আপন মনে, অলস মনোযোগে, বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছিল। তার চোখের নিচে কালি, হাতের নীল শিরার জাল সাদা চামড়ার ওপর ভেসে আছে, দেখলেই মনে হয় ইরা বড়ই ক্লান্ত।

কিন্তু বিভার মা ওকে করুণা করেন নি। তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন, হিসহিস করে নিচু গলায় বললেন, 'শীলা বলল কনক ওর কাছে অনেক দিন যায় না, দেখা হলেও পাশ কাটিয়ে যায়। শীলার মা চিঠি লিখেছেন কনক এরকম করলে ওঁরা সম্বন্ধ ভেঙে দেবেন।'

'মাসিমা, আমি কিছু জানি না।'

'জান না? কনক রোজ কোথায় যায়। তুমিই বা কোথায় যাও, কিছুই জান না?'

'না মাসিমা। আমি তো ঐ পার্কটায় গিয়ে বসে থাকি। সেদিন অনীর সঙ্গে লেকে গিয়েছিলাম একটু···' ইরার গলা প্রায় বুজে এল শুকনো কান্নায়।

'আমি জানি না ইরা তুমি সত্যি বলছ কি না, তবে এ কথা জেনে রেখ, যা মনে করছ তা হবে না।'

'যা মনে করছি!'

'তা হবে না, আমি হতে দেব না। কনক, কনক তোমার ভাই! ছি ছি, আমাদেরই আত্মীয়, পরের বাড়িতে পড়েছিলে, উপকার করতে গিয়ে এই হল? একেই বলে রক্তের দোষ! সুধাংশুর মেয়ে আর কত ভাল হবে?'

'আপনি প্রত্যেকটি কথা মিথ্যে বলছেন, একেবারে মিথ্যে! আমার বাবাকে আপনি অমন কথা বলতে পারেন না কিছুতে··· আমি কনকদা'কে ডাকছি। সে এসে বলে যাক এর প্রতিটি কথা মিথ্যে।'

ইরা ছুটে গিয়েছিল কনকের খোঁজে। কনক একা বসেছিল, তার ঘরের কোণে, মাথায় হাত রেখে। কনকের মাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিলেন।

'কনকদা, তুমি বল সব মিথ্যে!'

ইরা কনকের হাত চেপে ধরে। কনক আস্তে মুখ তোলে, তার দিকে তাকায়, ইরা পাথর হয়ে যায়।

'মিথ্যে নয় ইরা।'

'মিথ্যে নয়!' ইরা যেন আর কোনো কথা খুঁজে পায় না।

'কনক! তুই এত নির্লজ্জ হতে পারলি?' তার মা চেঁচিয়ে ওঠেন।

'দাদা, তুমি পাগল হয়ে গেছ।' বিভা অস্ফুটে বলে।

'হ্যাঁ, পাগল হয়েছি। ইরা এ বাড়িতে এল কেন?'

কনকের কথা জ্বরগ্রস্ত বিকারের রোগীর মতো। এখন যেন আর

লাজ-লজ্জা, বিচার-বিবেচনা করবার দরকার নেই তার। প্রতিটি কথা মনে হয় অসংলগ্ন, কে যেন ছুঁড়ে দিচ্ছে, আগুনের গোলার মতো, সে-কথার আঘাতে ইরার চেনাজানা পৃথিবী জ্বলতে লাগল। আবার অশান্তি, দুর্নাম, আবার নিরাশ্রয় হতে হবে।

বিভার চোখে অগাধ বিস্ময়। আবেগে কতটা অধীর হলে কনকের মতো ভীরু দুর্বলচিত্ত ছেলে এভাবে কথা বলতে পারে তাই ভেবে সে অবাক হচ্ছিল।

'ইরা, তুমি যদি একবার বল···'

'কনক!' ওর মা ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

'তুমি যদি একবার বল ইরা, আমি সমাজ, সংসার কিছুই মানব না। তুমি যদি একবার হ্যাঁ বল।'

'না।'

'একবার তুমি হ্যাঁ বল ইরা। বিভা, তুই ইরার চোখ দেখেছিস? ইরাকে একবার যে দেখে সে কি আর···ইরা, তুমি কাকে ভালবাস ইরা? যদি অনেক, অনেক চেষ্টা কর···'

'দাদা, তুমি অসুস্থ।'

'হ্যাঁ, আমি অসুস্থ। আমি এখন অসম্ভব অসুস্থ বিভা। ইরা যতক্ষণ এ বাড়িতে আছে···'

'চুপ কর কনকদা, আমি আজই চলে যাব এখান থেকে, এখনি যাব!'

ইরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিকে ওদিকে তাকায়, কোথায় যাবে! কে বলে দেবে তার জায়গা কোথায়? সে চেয়ারে বসে পড়ে, মুখ ঢেকে, কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কনক বেরিয়ে যায়। বিভা তার হাত ধরে তোলে। ঘরে নিয়ে যায়। ওর মা'র ঘরের দরজা বন্ধ, কনক বাইরে, বিভা ওকে কাঁদতে দিল।

কাঁদবার সময়ও ইরাকে আশ্চর্য দেখাচ্ছিল, মোহনীয়, জানি না

ও সুন্দর কি না, কিন্তু আশ্চর্য, সেইজন্যেই বোধ হয় ওর আকর্ষ ছেলেরা এড়াতে পারে না, বিভা নিজেকেই বলল।

'আমি কোথায় যাব বলত বিভা ? রায়পুর থেকে কেন তোমরা আমাকে নিয়ে এলে ? ছি ছি, এখন দুর্নাম নিয়ে, কলঙ্ক নিয়ে কেমন করে সেখানে যাব ?'

'শুধু সেখানে যাবার কথাই মনে হচ্ছে তাই না ইরা ?'

বিভাও সময় হলে নিষ্ঠুর হতে পারে। তার গলা বরফের মতো ঠাণ্ডা, শক্ত।

'আর কোথায় যাব ?'

'ওখানে কে আছে ইরা, অনীর দাদা রণজয় ?'

'বিভা !'

'আমি আগেই বুঝেছিলাম। রণজয় ! যে অনীর পায়ের নখের যোগ্য নয় ! সেই জন্যেই তুমি এখানে চলে এলে, সেই জন্যেই অনীর প্রস্তাবে রাজি হলে, তাই না ?'

'আমি এ বিষয়ে একটি কথাও বলব না বিভা। তুমি জান না ওঁরা আমাকে সবাই স্নেহ করেন। আমি চাই না এ-কথা অনীর দাদার কথা ওঁরা কেউ জানেন। জানলে পরে…'

'জানলে পরে কি করবে ?'

'যা একবার করতে চেয়েছিলাম, তাই-ই করব। মরে যাব বিভা, আর কিছুতে আমার লজ্জা ঢাকবে না।'

'তার চেয়ে ইরা আমি বলি তোমার সামনে একটাই পথ আছে।'

ইরা চোখ তুলল।

'অনীকে বিয়ে কর। জানি তুমি অনীকে হয়তো আজও সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পার নি। কিন্তু ও সত্যিই ভাল ছেলে। ওর দাদাদের চেয়ে অনেক, অনেক ভাল।'

'জানি।'

'তবে ওকে বিয়ে কর ইরা, আর কিছুতে তোমার মুক্তি নেই।'

'তোমরা আমাকে এমন করে ঠেলে দিচ্ছ কেন? এমন করে বাধ্য করছ কেন? কেন সময় দিচ্ছ না? কেন আমাকে একটার পর একটা দায়িত্বে জড়িয়ে ফেলছ?'

ইরা চেঁচিয়ে ওঠে।

কিন্তু সেই তার প্রথম এবং শেষ প্রতিবাদ। কেননা বিভার পরের কথাগুলো শুনে সে আরো ভয় পেয়ে যায়।

বিভা চেঁচিয়ে বলেছিল, 'কেন তুমি অনীকে বিয়ে করবে না!— তুমি নিজেকে কি মনে কর: সবাই তোমায় ভালবাসবে আর তুমি সবাইয়ের ভালবাসা হেলা করে চলে যাবে?'

তখন এক মুহূর্তে ইরা বিভার গোপন কথাটি জেনে ফেলে।

অথচ, বিভার কথা যদি সত্যি হয় তা হলে কনকের এ উন্মত্ততার নামও ভালবাসা।

ভালবাসা!

হ্যাঁ, কনকও তাই-ই বলেছিল। ইরার জীবন থেকে চিরতরে মুছে যাবার আগে। না, বিষ খায় নি কনক, আর কোনো প্রমত্ততা করে নি। সেদিন রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঘুরে অসুস্থ হয়ে সে বাড়িতেই ফিরে আসে।

রোগমুক্তির পর একদিন কলকাতার বাইরেও চলে যায়। যাবার আগে অনেক পাগলামি সেরে গিয়েছিল তার, তবে শীলার সঙ্গে ভাঙা সম্পর্কের ছেঁড়া সুতো তুলে নিয়ে আর সে গেরো বাঁধে নি। ও অধ্যায়টা যেন শেষই করে দিয়েছিল, কারো সঙ্গে একান্ত সম্পর্ক পাতাবার অধ্যায়।

আর, ইরাকে যে সত্যিই ভালবাসত, সে কথাটাকে সে ভোলে নি। এই দুটি বিষয়ে সে আশ্চর্য জেদ দেখায়।

যাবার আগে সে বিভাকে বলেছিল, 'ইরাকে আর অনীকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিস। ওর সম্পর্কে আমার ভালবাসাটার

অনেক কদর্থ হয়েছে, তাই সব কথা তোকে জানিয়ে যাব। আমার খাতাটা পড়ে নিস। আর শোন্, আমি ইরাকে ভালবেসেছি, তুই ভালবেসেছিস অনীকে, আমি তা জানি। কিন্তু ওদের ভুলে যা। ওর লোক ভাল নয় রে। তোর আমার মতো লোককে কাছে টানে কেবলই কাছে টানে, কিন্তু আসলে ওরা মানুষ নয়, দানব। কেননা ওরা নিজেদের নিয়েই শেষ অবধি সুখী থাকে। আমাদের ওরা নিজেদের সুবিধেয় ব্যবহার করে। আবার ভুলে যায়, ফেলে দেয়। তোর মধ্যে আমার চেয়ে অনেক বেশি পদার্থ আছে বিভা, নিজের জীবনটাকে নষ্ট করিস না।'

'দাদা, বম্বে থেকেই চিঠি লিখো।'

'বিয়ে করিস বিভা, জীবনটাকে নষ্ট করিস না।'

বিভা হেসে সায় দিয়েছিল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে কনককে লাঠি ধরে ধরে যেতে দেখেছিল, যতক্ষণ দেখা যায়।

হ্যাঁ, ততদিনে কনকের একটা পা পঙ্গু, দুর্বল। লাঠির ওপরই ভরসা।

কেননা একবার মাত্র, সে-ও দুর্বল চেষ্টায় ভাগ্যকে বাগ মানাতে বাধ্য করতে গিয়েছিল, গাড়িটাকে ল্যাম্পপোস্টের দিকে যেতে দিয়ে, স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে নিয়ে।

কিন্তু ঐখানেই মজা। ইচ্ছে করে দুর্ঘটনা ঘটানো যায় না। কনক মরলে ট্রাজিডী হত, বেঁচে গেল বলে মানুষ হাসবার সুযোগ পেল। ট্রাজিডী আর প্রহসনের মাঝখানের সীমারেখাটা মানুষ আঁকতে পারে না।

কনক লিখেছিল ইরাকে ভালবেসে ও অন্যায় করে নি।

'তুই জানিস বিভা, সম্পর্ক যা ছিল তা যৎসামান্য। আর, অনেকদিন বাদে ওকে যখন দেখলাম, তখনই আমি বুঝতে পারি ওর দিক থেকে সম্মতি থাকলে সমাজকে অবহেলা করতে আমার বাধত না।

ইরার প্রভাবটা খুব সুস্থ নয়। ও ক্যানসারের মতো ভেতরের রক্তমাংসে কাজ করে। আমার মনে হয় অনীও সুখী হবে না। ইরা কাউকে সুখী করতে পারবে না। কেননা ওকে যেই ভালবাসবে, সেই আচ্ছন্ন হবে, মোহগ্রস্ত। ভাবতে গেলে ওর জন্যেও আমার দুঃখ হয়। ও যতই নির্দোষ হোক, মানুষের জীবনকে ধ্বংস করবার অভিশাপ ও চিরদিন নিজের মধ্যে বহন করবে।

তাই মনে হয়, ওকে আমি কাছ থেকে দেখবার সুযোগ না পেলেই ভাল হত। আমার জন্যেই ঘটনাগুলো ঘটতে থাকল। আমরাই ওকে বাধ্য করলাম অমন তাড়াতাড়ি অনীকে বিয়ে করতে।'

কনকের কথাও সত্যি। ভালবাসা, সে যতই মোহান্ধ হোক, অথবা সর্বনাশা, কনককে স্বচ্ছদৃষ্টি দিয়েছিল। ভালবাসা, ভয়ঙ্কর জ্বরের মতো অনেক সময়ে স্নায়ুতে স্নায়ুতে আশ্চর্য সতর্কতা আনে, জাগিয়ে তোলে, অনেকদূর অবধি দেখবার চোখ দেয়। তাই বোধহয়, যে ভালবাসে সেই বুঝতে পারে কখন অপরপক্ষ তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে, কবে সে অপরকে মন দিল, কবে তার ক্লান্তি এল, সব বুঝতে পারে।

ইরা অনিমেষের কাছেই ছুটে গিয়েছিল।

ততক্ষণে বিজয় মিত্রের আদেশও এসে গিয়েছে। তিনি ইরার বিয়ে স্থির করেছেন এ কথা অনিমেষকে লিখে তিনি আশ্চর্য উল্লাস বোধ করেছিলেন। অনিমেষ হাসতে হাসতে সতীশকে বলেছিল 'মেসোমশায়, আমাদের যুদ্ধ কোনোদিন ফুরোবে না। আমি বাবার প্রতিচ্ছায়ার বিরুদ্ধে লড়ছি, উনি চেষ্টা করছেন আমার ছায়াকে ভেঙেচুরে দিতে। এ ছায়ায় ছায়ায় যুদ্ধ মেসোমশায়, আমার ছায়া ওঁর জীবনে, ওঁর ছায়া আমার জীবনে, এখন বাবা ভাবছেন এমনি করে আমার আনুগত্য আদায় করবেন।'

তার হাসিটা পরাজিতের হাসি নয়, বিজেতারও নয়, তিক্ত ব্যঙ্গ-ভরা একটা বিদ্রূপ।

'সব সময়ে সজাগ থাকতে হবে, নইলে, অজান্তে, ওঁর প্রতিচ্ছায়ার বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে আমিই সে ছায়ার সঙ্গে এক হয়ে যাব, আর একটা বিজয় মিত্র !'

সতীশ ওকে ইরার অসুস্থতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। একটির পর একটি উত্তেজনা ইরার সয় নি। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বরের ঘোরে সে শুধু অনীর মা-কে ডেকেছিল।

'ইরাকে আমি বুকে করে আগলে রাখব মেসোমশায়, আপনি কিছু ভাববেন না।'

'কি করবে ?'

'ওকে বিয়ে করব।'

'এত তাড়াতাড়ি ক'র না অনী, ওকে সময় দাও।'

'আমি কেমন করে দেব মেসোমশায় ? ওদিকে বিভার মা ওর দুর্নাম রটাচ্ছেন এদিকে আমার বাবা—! বাবাকে আপনি জানেন না মেসোমশায়, তিনি যখন ঠিক করেছেন তখন ওর বিয়ে দেবেনই।'

'ও রাজী না হলেও ?'

'নিশ্চয়। বাবা তো ওর ওপর জোর খাটাবেন না, ওকে বোঝাতে থাকবেন এ বিয়ে ওর করা উচিত। বাবা মা-র প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত করা উচিত, ইরার যদি কৃতজ্ঞতা থাকে ··কোন্ সুড়ঙ্গে কোন্ দুর্গে ঢোকা যায় তা উনি খুব ভালই জানেন মেসোমশায়।'

'তোমার মা ! তোমার মার ওপর ইরা যে ভারী নির্ভর করে অনী।'

'আমার মা !'

অনিমেষ হাসল, 'উনি বিভার মা'র চিঠি পেলে কিছু ভাববেন না ভেবেছেন ? ওঁর যা ভাববার তা ঠিকই ভাববেন। তা ছাড়া বাবা যা ঠিক করেন মা তাতে বাধা দেন না। মা অনেক ওপরে থাকেন মেসোমশায়, ইরার মতো সামান্য মানুষের দুঃখকষ্ট ওঁর চোখে পড়ে না।'

সতীশ কি বলবেন ভেবে পেলেন না। এ-কথা সত্যি বটে বিজয় মিত্রের চিঠি পেয়েই তিনি অনীকে কাছে রাখতে রাজী হন। কিন্তু দিনে দিনে অনী, তার সুখদুঃখ, ইরাকে ভালবাসা, সবকিছু নিয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি সত্যি হয়ে উঠেছে। কেমন করে উনি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন ?

'ইরা সেরে উঠুক। আর তোমার, তোমার একটা কাজকর্মের চেষ্টা দেখতে হয় অনী, যদি ওকে বিয়েই করতে চাও।'

কিন্তু তখনো তাঁর মনে হয়েছিল ইরাকে বড় বেশি ব্যস্ত করা হচ্ছে। ওর জন্যে তাঁর কেন যেন মায়া হচ্ছিল, মমতা।

ইরা শুধু বলেছিল ও একবার নিলীনাকে সব কথা জানাতে চায়।

নিলীনাকে ও সব কথাই জানিয়েছিল। কিন্তু ওর চিঠির কোনো জবাবই পায় নি। ও লিখেছিল, 'আপনি বলে দিন আমি কি করব ?'

চিঠির জবাব না পাওয়াটাকে ও ভাগ্যের শেষ আঘাত বলেই ধরে নেয়, তাই অনিমেষের কোনো চেষ্টাতেই ও আর বাধা দেয় নি।

ইরা জানত না ওর চিঠি পেয়েই 'আমাকে কলকাতা যেতে দাও' বলে নিলীনা মিত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এতটা উত্তেজনা ওঁর রক্তচাপ সয় নি। ওঁর জ্ঞান হতেই অবশ্য বিজয় মিত্রকে কথা দিতে হয় রণজয়ের সঙ্গে ওঁকে কলকাতা যেতে দিতে হবে।

তখন ওঁর সবকথাতেই রাজী হবার সময়। ডাক্তারের কঠোর নির্দেশ ছিল ওঁর কথার অন্যথা যেন না করা হয়।

ইরা তা জানত না।

তাই অনিমেষ যখন তাকে বিদ্রূপ করে বলল, 'তোমাকে উনি উপদেশ দিয়েও সাহায্য করবেন এ-কথা কেমন করে ভাবলে ইরা ?'

তখনও ইরা বলতে পারে নি, একবারও বলতে পারে নি, চেনেনি অনী তার মা-কে। বলে নি 'অনী, তুমি চাও মানুষ মানুষের কাছে

আসুক, কিন্তু তোমার মা, তোমার বাবার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক একেবারে ভুল বোঝাবুঝির ওপর গড়া অনী।'

বলে নি সেগুলো সহজ না হলে ইরাকেও সে কোনোদিন বুঝবে না।

না, কিছুই বলে নি ইরা।

কনক আর বিভাকে একবার প্রতিবাদ জানিয়েই যেন তার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল।

তাই সে রোগক্লান্ত, শীর্ণ দেহে চুপ করে বসে থাকত বিছানায়। কাছে থাকত এষা।

ততদিনে এষাও ওর আশ্চর্য কাছে টানবার শক্তির কাছে, একটু একটু করে ধরা দিয়েছে।

একা এষারই মনে হচ্ছিল বড্ড ভুল করছে বড়রা, অনীদা, বাবা।

ইরার জন্যেই তার কষ্ট হচ্ছিল বেশি। মনে হচ্ছিল অনীদা, যে অনীদা সব বুঝতে পারে সে কেন বুঝছে না ইরার এখন অনেক, অনেকদিন বিশ্রাম দরকার। ইরাদিকে এখন সকলের ভুলে যাওয়া দরকার।

॥ ১১ ॥

ইরার চোখের ক্লান্তি, আশ্চর্য বেদনা, মানুষের সংসারের দুর্বোধ ব্যবহার বিষয়ে আকুল প্রশ্ন এষার চোখে পড়ত।

তার কথা শোনে এমন অবসর একটি লোকেরও ছিল না। মা আর বাবা অনীদা আর ইরাকে নিয়ে তর্কে, বাদ প্রতিবাদে প্রতিটি প্রহরের শান্তি ছিঁড়ে ফেলছিলেন।

অনীদা সারাদিন কাজের চেষ্টা করত, আর সন্ধ্যাবেলা এসে ছাতে ইরার পাশে বসত।

'ইরা, তুমি কিছু ভেব না।'

'ইরা, তোমাকে আমি আগলে রাখব...'

'আমি আর তুমি প্রমাণ করে দিয়ে যাব ইরা...'

শুনতে শুনতে ইরার চোখের দৃষ্টি ক্রমেই উদাসীন হয়ে যেত, ান্ত বেদনায় ভারী।

অনিমেষের চোখে তখন আর একরকমের প্রমত্ততা, অন্ধ াবেগ। সে কিছুই দেখে নি।

বাড়ির অশান্তি তখন ক্রমেই চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। 'তাড়াও, াড়াও ওকে, ঐ ইরাকে, ওর মধ্যে তুমি কি দেখছ?'

ছবি কুৎসিত সন্দেহে স্বামীকে আক্রমণ করতেন।

তাড়াবার আগেই সতীশ একদিন অনিমেষ আর ইরাকে নিয়ে লে গেলেন।

আর তার পরদিনই এষাদের বাড়িতে নিলীনা মিত্র এসে ামলেন। প্রায় অসুস্থ দেহেই।

পরে, অনেক পরে এষা যখন ভাবত করে, কেমন করে তার ীবনটা এমন জটিল হয়ে উঠল, কেন সে ভালবাসা নিতে পারল না, দিতে পারল না, তার শুধু মনে হত সেই একটা ঘনমেঘের দুপুর, ানালায় বসে বসে তার উধাও চোখ, আর আকাশে একটা রঙিন ুড়ি। ঘুড়িটা উড়ে যাচ্ছে ওপরে, আরো ওপরে, এষার চোখকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার শুধু সে-কথাই মনে পড়ত।

এষা জানত না সেদিনই তার কাছ থেকে শৈশব বিদায় নয়।

সেদিনই তাদের বাড়িতে অনিমেষ এসেছিল, জোরে জোরে কড়া নেড়েছিল।

শুধু অনিমেষ নয়, সেদিনই যেন বড়দের জগতের দুঃখ যন্ত্রণা, ভালবাসার বেদনা, সব হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে এষাদের বাড়িতে, ক্রমে দিনে দিনে এষা অদৃশ্য জালে জড়িয়ে পড়ে।

তাই বর্ষার আকাশে রঙিন ঘুড়ির মেলা দেখলেই এষা অন্যমনস্ক হয়ে যেত।

সে অবশ্য অনেক পরে। এষা যখন বড় হয়ে গেছে, ওর মা আর বাবা যখন এক বাড়িতে বাস করেও এষার জীবনের বৃত্ত থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন, আরো ছোট বড় অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে সংসারে।

ততদিনে সংসারের কাছে অনিমেষ আর ইরা দুটো নিষিদ্ধ নাম ওদের নাম মুখে আনা বারণ। ততদিনে, অর্থাৎ বড় হয়ে যাবার পর এষার সঙ্গে বিভার ভাব হয়ে গেছে।

অন্যরা তো বটেই, বিভাও বলত 'ওদের নাম ক'র না এষা, ওরা দুজনেই এত ভাল, অথচ যেন ওদের মধ্যে সর্বনাশ আছে।'

এষা চুপ করে শুনত।

'নইলে ওরা এতজনকে দুঃখ দিল, এত দুঃখ দিল!'

এষা এ-কথাটারও প্রতিবাদ করে নি। ততদিনে সে জেনে গিয়েছিল প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হয় না। যে যার বিশ্বাস নিয়ে চলে এ-সংসারে, প্রতিবাদে শুধু সময় নষ্ট হয়।

হয়তো এ-কথাটা ইরার কাছেই, ইরাকে দেখেই শেখা।

ওর মতো বিনা প্রতিবাদে প্রতিটি আঘাত গ্রহণ করতে এষা কাউকেই দেখে নি। ওর বাবার অবিবেচনা দায়িত্বহীন ব্যবহার ও নীরবে সয়েছে। অনিমেষের দাদা রণজয় লতার চোখের আড়ালে ওকে বার বার ভালবাসা জানিয়েছে তাও ইরা কাউকে বলে নি। অনিমেষ ওকে ভালবেসে ওর মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া করুক, বিজয় মিত্রের ঐশ্বর্যের দাপট আর আভিজাত্যের উত্তাপ থেকে পালিয়ে আসুক তাও ইরা চায় নি। শেষ অবধি কনক যতদূর সম্পর্কেরই হোক, তার ভাই কনক, তাকে ভালবেসে, আঘাত পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাক তাও চায় নি ইরা।

অথচ তার এমনই দুর্ভাগ্য, যে কেউ এ সংসারে বিশ্বাস করে নি

ইরাকে কেন্দ্র করে যতগুলো ঘটনা ঘটেছিল তার একটির জন্যেও সে দায়ী নয়।

ইরা ভাগ্যের কৌতুক, দুরন্ত খেয়াল। ভাগ্য এক একজনকে এমনি করেই গড়ে, এমনি করেই নিয়ে খেলা করে। তাদের মধ্যে কোনো পাপ থাকে না, থাকে না কোনো অসাধুতা, দুর্নীতি, আসলে তারা নিষ্পাপ।

অথচ তাদের কেন্দ্র করেই অন্য অনেক জীবন সম্মোহিত পতঙ্গের মতো ঘুরতে ঘুরতে মরে।

এষার তাই মনে হত ইরার মতো দুর্ভাগ্য কম লোকেরই হয়। না চাইতে উন্মত্ত, প্রবল, অজস্র ভালবাসা পাওয়া একটা দুর্ভাগ্য।

একজনের, শুধু একজনের ভালবাসা চেয়েছিল ইরা।

নিলীনার ভালবাসা।

নিলীনার কাছে অত অল্পদিন বাস করে সে যে তাঁর কি পরিচয় পেয়েছিল তা কেউ জানে না। অন্তত নিলীনার ছেলেরা তাঁকে অমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে নি, বিশ্বাস করে নি।

সংসারে সবাই মনে করত নিলীনা বড্ড দূরের মানুষ, একা ইরা তাঁকে তার বঞ্চিত জীবনের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল।

সেইজন্যেই বোধহয়, বিভাদের বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার পর অনিমেষ যখন তাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে তখন সে আকুল হয়ে নিলীনাকে চিঠি লিখেছিল।

সে চিঠির জবাব আসে নি বলে অনিমেষের সে কি নিষ্ঠুর ঠাট্টা!

ইরা যে নিলীনাকে অত ভালবাসত তা হয়তো অনিমেষ চায় নি। সে চেয়েছিল ইরার জীবনে সে একমাত্র হয়ে থাকবে। বিপদে, সঙ্কটে, ইরা অন্য কাউকে মনে করবে না।

অথচ কেউ জানে নি, জানতে চায় নি, 'আমায় কলকাতা যেতে দাও' বলে নিলীনা মিত্র অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ জানে নি

রায়পুরের বাড়িতে তখন কতদিন ধরে কেউ জোরে কথা বলত না, পা টিপে টিপে হাঁটত। রণজয়, অজয়, দুই ছেলে ডাক্তারদের কথা শুনে ওষুধ বদলাত, নার্সকে সব বলে দিত।

ইনা অজয়ের বউ, লতার ছেলেমেয়ে কুণাল আর মায়াকে নিয়ে বাড়ির পেছনে. তার ঘরে থাকত, ওদের আটকে রাখাই ছিল তার কাজ।

লতা, বাড়ির বড় বউ, নিলীনার কাছে বসে থাকত। নার্সরা তার ফরমাস খাটত শুধু। লতা নিলীনাকে ফলের রস খাওয়াত, চুল আঁচড়ে দিত, হাত ধরে বসে থাকত।

'তুমি যেওনা লতা, তুমি আমার কাছে থাক।'

নিলীনা ফিসফিস করে বলতেন।

'এই তো আমি। কোথাও যাই নি তো!'

'তুমি আমার কাছে রাতেও থাকবে তো?'

'আমি তো আপনার পাশের খাটেই থাকি মা।

'লতা, অনী আর ইরাকে আমার চিঠি লেখা হল না।'

'আমি লিখে দেব?'

'না না, ইরা আমাকে বিপদের সময়ে ডাকল, আমি যেতে পারলাম না।'

মাঝে মাঝে নিলীনার ঘরের পর্দাটা দুলে উঠত, বিজয় মিত্র এসে দাঁড়াতেন।

'কেমন আছে আজ?'

তাঁর গলা শুনলেই নিলীনা যেন শিউরে উঠতেন। বলতেন, 'চলে যেত বল ওঁকে লতা!'

বিজয় মিত্রের মুখটা অপমানে কালো হয়ে যেত। তিনি তবু দাঁড়িয়ে থাকতেন।

'তবু তুমি গেলে না?'

'নিলীনা, আমি তোমার খবর জানতে এসেছিলাম।'

'না, আমার খবর তুমি জানতে চাইবে না। তোমার জন্যে অনী পর হয়ে গেল, তোমার জন্যে ইরা…!'

তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। তখন নার্স ছুটে আসত।

বিজয় মিত্র মুখ কালো করে বাইরে চলে যেতেন। মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, 'শত্রু, শত্রু সবাই! অনী আর তার মা আমার শত্রু!'

রণজয় আর অজয় বলত 'সত্যি, মা অসুস্থ হয়েছেন বলে বলছি না। কিন্তু ইরাকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কেন যে হচ্ছে তা বুঝি না।'

দুই ভাই চোখ চাওয়াচাওয়ি করত। অনিমেষের নামটা ওরা ইচ্ছে করেই করত না। যেন অনিমেষ নামে ওদের কোনো ছোট ভাই নেই, কোনোদিন ছিল না।

শুধু মাঝে মাঝে অন্য একটা গলা গর্জন করে উঠত, 'এসব কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না।'

গলাটা বিজয় মিত্রের চেয়েও গম্ভীর, অথচ অমন রুক্ষ নয়।

নিলীনার দাদা জাস্টিস বরেন দত্ত, ওরফে বুড়ো দত্ত বম্বে থেকে চলে এসেছিলেন।

কি হয়েছিল না হয়েছিল, প্রত্যেকের কাছে তিনি শুনলেন। রণজয়, অজয়, বিজয় মিত্তির, লতা, ইনা সকলের কাছে। জজ মানুষ, তিনি বিশ্বাস করেন সব মানুষেরই কিছু না কিছু বলবার আছে।

সব শোনা হয়ে গেলে তিনি গম্ভীর হয়ে রইলেন। টেবিলে রুটি, মাখন, চীজ, ডিম, চা, থরে থরে সাজানো। বড় কাঁচের বাসনে আপেল, আঙুর, পীচ।

নিলীনার দাদা নিত্য আসেন না। তাঁর খাতির যত্ন যাতে ঠিকমতো হয় সে জন্যে বিজয় মিত্র নিজেই টেবিলে উপস্থিত।

নিলীনার পাগলামি, অনিমেষের অবাধ্যতা, এ-সব বিষয়ে বুড়ো দত্ত কি বলেন তা জানবার জন্যে সবাই ব্যগ্র হয়ে চেয়ে রইল।

'লতা, আমাকে আরেকটা টোস্ট দাও।'

'টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে বুড়ো দত্ত বলেন, 'সমস্যা এক মিনিটেই চুকে যায়।'

'কি করলে ?'

বুড়ো দত্ত হঠাৎ বিজয় মিত্রের চোখের ওপর চোখ রাখলেন। তাঁর দৃষ্টি একাগ্র, তীক্ষ্ণ, কঠিন। এমনি চোখে তিনি আসামীদের দিকে, সাক্ষীদের দিকে তাকান। জাস্টিস দত্তের চোখে চোখ পড়লে না কি বাঘা বাঘা আসামীও সত্যি কথা বলে ফেলে।

তিনি বললেন, 'বিজয়, তুমি নিলীনার সুখ চাও ?'

ঠিক এমনি গলায় তিনি আসামীকেও প্রশ্ন করেন।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়···তাতে সন্দেহ আছে নাকি আপনার ?'

'তাহ'লে মাত্র দু'তিন টাকার ব্যাপার।'

'দু' তিন টাকার ব্যাপার ?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। একটা টেলিগ্রাম পাঠাও অনীকে। জানিয়ে দাও ইরাকে নিয়ে চলে আসুক, বিয়েতে তোমার মত আছে।'

'আপনি এ কি বলছেন ? ইরা ইরার বাবা একটা স্কাউণ্ড্রেল ! একটা বদমায়েস !'

'বিজয়, সুধাংশু নন্দী পরে কি হয়েছিল আমি তা জানি না। কিন্তু আগে তার কোনো দোষই ছিল না। যাইহোক, তোমাদের যা ইচ্ছে তোমরা কর। আমি আমার বোনকে নিয়ে যাব।'

'নিয়ে যাবেন ?'

'হ্যাঁ। এখানে ওর কষ্ট হচ্ছে, ও মনে কষ্ট পাচ্ছে। আমি ওকে সাথে নিয়ে যাব। সেখানে, ও সুস্থ হ'লে আমি অনীকে লিখব। ইয়েস, আই লাইক দ্যাট বয়।'

'আপনি যা বললেন তা করলে···'

'কি করবে ?'

'অনীকে আমি ত্যাগ করব।'

বরেন দত্ত গলা তুলে হাসলেন। বললেন, 'ত্যাগ করবে? তাতে কি হয়েছে? অনীয় নিজের যথেষ্ট মনের জোর আছে। তাছাড়া আমি থাকতে নিলীনার ছেলে আর যাই হোক, টাকার কষ্ট পাবে না।'

তিনি নিলীনাকেও সেই কথাই বললেন।

'দাদা, সুধাংশু আমাকে ইরার ভার নিতে বলেছিল। নিলীনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

'বলেছিল বুঝি? বেশ তো, ভার নিবি তুই। একটু সুস্থ হয়ে ওঠ, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

একা বরেন দত্ত ছাড়া আর কেউ জানত না একদিন নিলীনা সুধাংশু নন্দীকে চিনতেন। কেউ জানত না, আত্মহত্যা করবার দিন সন্ধ্যায়, লুকিয়ে এসে সুধাংশু নন্দী বলেছিল, নিলীনা, একদিন বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলে, ভালবেসেছিলে এমন কথা বলব না, তাই বলছি ইরাকে তুমি দেখ।'

ইরাও সে কথা জানত না।

বম্বে থেকে বরেন দত্তের টেলিগ্রাম যখন কলকাতায় পৌঁছল ইরা আর অনিমেষ তখন কোথায়?

॥ ১২ ॥

ইরাকে নিয়ে অনিমেষ হঠাৎই চলে গিয়েছিল।

বম্বের উপকণ্ঠে, পালিহিলের গাছঘেরা বাড়িটায়, নিলীনা তখন প্রায় সুস্থ হয়ে উঠছেন।

বরেন দত্ত তখন ব্যস্ত, বড়ই ব্যস্ত। বিচারক হিসেবে তাঁর সুনাম, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা, সৎসাহস, প্রত্যেকটি গুণ, উন্নতির সিঁড়ি তৈরি করছিল। তাই দিল্লী থেকে তাঁর ডাক পড়ে। সবাই জানত

আজ না হোক কাল, তিনি ক্যাবিনেটে ঢুকবেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিলীনার কথা ভোলেন নি।

নিলীনাকে এসে স্ত্রী'র জিম্মা করে দিয়ে তিনি বললেন, 'বিজয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তোকে নিয়ে এলাম। এখন বউদির সেবাযত্নে খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ, তা নইলে আমার মুখ থাকবে না।'

স্ত্রীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'প্রভা, ওর শরীরটা ভাল করে দাও দেখি। বিজয় তেমনই রয়ে গেল, নিজের জেদ ছাড়া কিছু বোঝে না। নিলীনার দিকে চেয়ে অনীর বিয়েটা মেনে নিলে কি হত?'

'অনী কাকে বিয়ে করতে চায়!'

'সুধাংশুর মেয়েকে।'

'সুধাংশু!'

প্রভাবতীর সব মনে পড়ল। সুধাংশু, যৌবনের সুধাংশু, নিলীনার সঙ্গে টেনিস খেলতে আসত।

'সুধাংশুর মেয়ে কি দেখতে খুব সুন্দর?'

'এই দেখ! আমি কি করে জানব বল?'

'সুধাংশুর মেয়ে নিলীনার কাছে থাকত?'

'হ্যাঁ। ও আত্মহত্যা করবার পর নিলীনা ওকে নিয়ে আসে।'

'কি জানি, ঠাকুরজামাই কেন আপত্তি করলেন! ওদের বংশ তো খারাপ নয়। টাকাপয়সা না থাকল তাতে কি? ওঁর তো টাকার অভাব নেই।'

'বিজয়ই জানে কেন ও জেদ করছে।'

'নিলীনা নিজেও তো অনীকে জানাতে পারত।'

হঠাৎ অসুস্থ না হলে হয়তো জানাত।'

'যাক্‌গে এখন ও ভাল হয়ে উঠুক, তারপর সব হবে।'

'হ্যাঁ প্রভা, আমারও তাই মনে হয়।'

প্রভা স্বামীর দিকে সস্নেহে চাইলেন। ছেলে নেই, মেয়ে নেই,

স্বামী তাই তাঁর সবটুকু ভালবাসা পেয়েছেন। বোনকে বরেন দত্ত যে কতটা ভালবাসেন তা তাঁর মতো আর কে জানে।

'তুমি কিছু ভেবনা গো, সব ঠিক হবে যাবে।'

প্রভার দিকে চেয়ে বরেন দত্তর মনে হল তখনি সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আর যেন কোনো ভাবনা নেই। প্রভা তাঁর জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু, প্রভা তাঁর আশ্রয়, আশ্বাস, শান্তি।

সত্যি সত্যিই নিলীনা ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন।

পালিহিলের ছায়াঘেরা বাড়িতে, দাদা বউদির স্নেহে, তাঁর শরীর ও মনের গ্লানি কেটে যেতে দেরি হল না।

তখনি ইরা আর অনিমেষকে আনবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বরেন দত্তর প্রস্তাবটা খুব খারাপ লাগে নি। তিনি বললেন, 'বিজয়কে জানাতে হবে কিন্তু।'

'জানাব, দাদা। আমি ওঁকে না জানিয়ে এত বড় কাজ করতে পারি ?' নিলীনা দাদার জামায় বোতাম লাগাচ্ছিলেন। তাঁর ক্লান্ত করুণ মুখের দিকে চেয়ে বরেন দত্তর কেন হঠাৎ মনে হল নিলীনা এখনো অসুস্থ, অসহায়, একলা ?

'হ্যাঁ রে, তোর মনে কোনো দুঃখ নেই তো ?' জিগ্যেস করতে গিয়েও তাঁর মুখে আটকে গেল। ভুরু কুঁচকে তিনি ভেবে দেখলেন নিলীনার বিয়ে হয়েছিল বাইশ বছর বয়সে, এখন বাহান্ন বছর হয়েছে, না না, চুয়ান্ন. বত্রিশ বছর বাদে হঠাৎ এমন কথা জিগ্যেস করা যায় না।

সুখী হয় নি, ও সুখী হয় নি, এ ভয় তাঁর মনে প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু নিলীনা আর বিজয় মিত্রের বিবাহিত জীবন সব দিক থেকেই এমন সার্থক হয়ে ওঠে যে বরেন দত্ত ওঁদের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করা ছেড়ে দেন। নিলীনা যেখানে যাবেন, সেখানেই সম্রাজ্ঞীর আসন পাবেন, এ তিনি জানতেন।

তাছাড়া, টাইয়ের গেরো বাঁধতে বাঁধতে বরেন দত্ত ভাবলেন,

অসুখী হওয়া, শূন্যতা বোধে কষ্ট পাওয়া, এ-সব ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর বা নিলীনার পরিচয় নেই। বিয়ে মানে এমন একটা জিনিস যা ব্যক্তিগত ভালবাসার ওপরে, কর্তব্যের আদর্শে গড়া, সমাজের প্রয়োজনে নিজেকে দায়িত্ব নিতে শেখানো।

তবে কেন নিলীনাকে অসুখী মনে হয়?

'দাদা, কি ভাবছ?'

বরেন দত্ত একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোর কথা।'

'কি কথা?'

'তুই কি এখনো নিজে যেতে চাস্ কলকাতা?'

'তুমি যদি মানা না কর!'

'তোর শরীর যেন এখনো শক্ত হয় নি মনে হয়। সইবে তো? কলকাতা যাবার ধকল কম নয়। তাছাড়া বিজয় হয়তো রাগ করবে।'

'ওঁর কথা আমি সবসময়ে আগে ভেবেছি দাদা, বড্ড বেশি ভেবেছি। কিন্তু এবার আমাকে অনীর কথা ভাবতে দাও।'

'আমি গেলে হয় না?'

'আমি যেতে পারব দাদা।'

'বেশ, আগে একটা তার করে দিই।'

বরেন দত্ত হঠাৎ হাসলেন। অনেক অনেকদিন বাদে তাঁর নিলীনার অল্প বয়সের কথা মনে পড়ছে। সুধাংশু নন্দী নিলীনার সঙ্গে টেনিস খেলতে আসত। সে-ই সুধাংশু নন্দী যখন আরতিকে বিয়ে করতে চাইল নিলীনা তাঁর কাছেই এসে বলেছিলেন, 'ব্যবস্থা করে দিতে হবে দাদা।'

চিরদিন পরের কথা ভাবা, পরের দুঃখকে নিজের বলে মনে করা, সেই নিলীনা।

'এ ক'দিন খুব বিশ্রাম নে। শরীর ভাল রাখ। প্রভা কোথায় গেল? ওগো, আমি বেরুচ্ছি।'

প্রভাকে ডাকতে ডাকতে বল্লেন দত্ত বেরিয়ে গেলেন।

নিলীনা ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। ক্লান্তি আসে, আজকাল বড় সহজে ক্লান্তি আসে।

দাদা বললে কি হয়, তাঁকেই কলকাতা যেতে হবে।

সুধাংশু তাঁকে ইরার ভার নিতে বলেছিল।

সুধাংশু! এখন ভাবলে তার বয়ে যাওয়া, বাজে খরচ ক'রে ফেলা জীবনের জন্যে, নিঃসঙ্গ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা করবার জন্যে কি দুঃখই হয়।

কেন সুধাংশু আরতিকে অত ভালবেসেছিল? কেন সুধাংশু ইরার ভার তাঁকে অনেক, অনেক আগে দিয়ে দেয় নি? আরতির মেয়ের জন্যে, হ্যাঁ, আরতির মেয়ের জন্যে কেন তাঁর মনে এমন ভালবাসা জেগে উঠেছিল? কেন বিজয় মিত্র চিরদিন অনিমেষকে অমন ক'রে দুঃখ দিলেন? অনীর কথা ভাবলে বুক ফেটে যেতে চায়। তিনি মা হয়েই কি সব কর্তব্য করেছিলেন? তাঁর কি আরো অনেক নরম হয়ে ওর মন বোঝা উচিত ছিল না? অনী তাঁকে নিষ্ঠুর জেনে গেল, কিন্তু নিলীনার যে কেবলই অনীর ছোট-বেলার কথা মনে হয়। সেই নরম হাতে গলা জড়িয়ে ধরা, না না, অনীর কাছে তিনি নিজে যাবেন। অনীর বাবাকে বুঝতে হবে, সব বুঝতে হবে। কেন নিলীনার কেবলই মনে হচ্ছে বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে?

কিন্তু কলকাতায় তিনি যখন গেলেন, তখন অনিমেষ আর ইরা সেখানে নেই।

'ওরা চলে গেছে', সতীশ যেন অসহায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ঝুলে পড়া কাঁধে আশ্চর্য দোষী দোষী ভাব। উচিত ছিল, তবু তিনি অনিমেষদের আটকে রাখতে পারেন নি।

'চলে গেছে—অনী চলে গেল?'

নিলীনা যেন আর কথা খুঁজে পেলেন না। বড্ড বেশি চুপ হয়ে গেলেন। বরেন দত্ত বিব্রত হয়ে সতীশের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, কোথায় গেলে অনীর খোঁজ পাওয়া যায়?

'আমাদের টেলিগ্রাম পায় নি অনী?'

'পেয়েছিল।'

তারপর আর কিছু বলবার থাকল না। হঠাৎ বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেলেন নিলীনা, রোগের ক্লান্তি সারা শরীরে নেমে এল, 'দাদা ফিরে চল।' তিনি আস্তে বললেন।

'একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে যান।'

সতীশ হাত জোড় করলেন।

'বিশ্রাম!' নিলীনা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ল সতীশকে অনিমেষ ভালবাসে, উনি ওকে স্নেহ দিয়েছেন, এখানে ও শান্তি পেয়েছে, যে শান্তি বা স্বস্তি নিলীনা অনীকে দিতে পারেন নি।

'বেশ তো! এস দাদা।'

নিলীনাকে নামতে দেখে বরেন দত্তও স্বস্তি পেলেন। এতখানি শরীরের ধকল, তারপরেই মনের এই আঘাত, বিশ্রাম একটু দরকার বই কি নিলীনার।

'তুমি এষা!'

নিলীনা যেন অবাক হয়ে এষার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এই ছোট মেয়েটিও অনিমেষকে আপন করতে পেরেছিল, তিনি পারেন নি। কেমন করে একজন আরেক জনকে আপন ক'রে নেয়?

'এখানে থাকতে আপনার ভাল লাগছে?'

সতীশ বড় ব্যাকুল হয়ে জানতে চেয়েছিলেন। ভাল লাগছিল, খুব ভাল লাগছিল নিলীনার। হঠাৎ মনে হচ্ছিল এখানে অনীর থাকতে ভাল লেগেছিল, সেই জন্যেই বোধহয় তাঁরও ভাল লাগছে। বড় আরাম পেয়েছিল তাঁর ক্লান্ত শরীর, অবসন্ন মন।

কিন্তু থাকবার উপায় ছিল না।

বরেন দত্তর ফিরবার তাড়া ছিল। নিলীনাও ভাবছিলেন হয়তো, হয়তো অনী বম্বেতেই চলে যাবে ইরাকে নিয়ে বম্বে অথবা রায়পুরে, নিজের জায়গায় না গেলে তিনি ওঁদের খোঁজ করবেন কি করে?

সতীশ আর ছবি, এ-বাড়িতে নিলীনাকে কেমন করে আরামে রাখবেন, কি যত্ন করবেন, ভেবে কতই ব্যস্ত হয়েছিলেন।

নিলীনাই অবশ্য সহজ করে দেন সব। অতি সহজে তিনি মিশে গেলেন এ-বাড়ির ছোট সংসারে, কখনো মনে হল না তিনি এদের করুণার চোখে দেখছেন। সামান্য কয়েক ঘণ্টার পরিচয়েই তিনি এদের মন কেড়ে নিলেন। তাঁর আশ্চর্য সুন্দর মুখ, রুপোলী চুল, চোখের অতল বিষণ্ণতা, রানীর মতো সহজ আভিজাত্য এষার মন নিমিষে কেড়ে নিল।

এষাকে সঙ্গে নিয়েই নিলীনা বিভাদের বাড়ি যান।

হয়তো মনের দুঃখে, হয়তো কনক চলে যাবার বেদনায়, বিভা বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাই ইরার নামে অনেকগুলো অভিযোগ ক'রে সে কাঁদতে শুরু করে।

নিলীনা চুপ করে বসে বসে ওকে দেখলেন। ওর মার ক্ষুব্ধ অভিযোগের স্রোতে বাধা দেন নি, ওর কথাতেও বাধা দিলেন না।

বিভা নীরবে কেঁদে চলল। ঘরের ঘড়ি টিকটিক করছে, সময় বয়ে চলল। সময় বয়ে চলল নদীর জল যেমন সরে সরে যায়, তেমনি নীরবে। নিলীনার মনে পড়ল অনীর গলার ভরাট, সুন্দর গান 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।'

আরো যেন কত কি সরে যেতে লাগল নীরবে, দূরে চলে যেতে লাগল, বিভা যে কোনোদিন ইরাকে ক্ষমা করবে সে সম্ভাবনা, অনিমেষ যে কোনোদিন নিলীনার কাছে ফিরে আসবে সে সম্ভাবনা। নিলীনা বেদনায় ভারী চোখ তুললেন, মানুষ মানুষকে এত কম বোঝে! কেমন করে বিভাকে বোঝাবেন সুধাংশু তাঁকে

ইরার ভার নিতে বলেছিল, কেমন করে ও জানবে বিজয় মিত্র নিলীনাকে অনিমেষকে আপন করতে দেন নি, তাই অনিমেষ বড় একলা।

নিলীনা জানতেন ইরা রণজয়কে ভালবাসে, অনিমেষকে ভালবাসে না। তাই ওদের বিয়েতে এত আপত্তি ছিল ওঁর। ভাবতেন সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।

তাই আজ নিলীনা ওদের কাছে যেতে চান। অনিমেষের আজকের নিঃসঙ্গতা ইরা পূর্ণ করে দিক, কিন্তু নিঃসঙ্গতা তো গাছের মতো দিনে দিনে বাড়ে, অনিমেষের একাকিত্ব অনেকে মিলে ঘটিয়েছে, ওকে শৈশবে হয়তো নিলীনাও একলা করে দিয়েছিলেন। আজকের অনিমেষের মন থেকে সে বেদনাটুকু নিলীনাকেই মুছে নিতে হবে, কিন্তু সময় বড় কম, নিলীনা বড় ক্লান্ত।

'তুমি অনীকে ভালবাস বিভা ?'

বিভা মুখ তুলল। নিলীনার চোখে মমতা, করুণা, স্নেহ। সে আস্তে মাথা নাড়ল।

'অনী কিন্তু ইরাকে ভালবাসে।'

বিভা আবার মাথা নাড়ল। নিঃশব্দ ঘরে বিভার কানের হীরের দুল একটু একটু ঝিকঝিক করতে থাকল।

'কামনা কর ওরা যেন সুখী হয়।'

নিলীনা একটু হেসে বিভার মাথায় হাত রাখলেন, বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে বললেন, 'আমি বম্বে যাচ্ছি। আমার মন বলছে ওরা ওখানে ফিরে যাবে। লতার দাদাকে অনী ভালবাসত, হয়তো পাটনায় তার কাছেই গিয়েছে। যাবার জায়গা তো ওর বেশি নেই। সেখানে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ে যাব, অনী যেন বম্বে চলে আসে।'

বেরিয়ে এসে তিনি এষার হাত ধরে গাড়িতে উঠলেন। 'একবার রায়পুরে যেও, এষা,' বলে চুপ করে বসে রইলেন।

তাঁর পাশে বসে, তাঁকে দেখতে দেখতে কেন এবার মনে হল আর নিলীনাকে কোনোদিন দেখতে পাবে না।

নিলীনা বম্বে ফিরে যাবার পর লতার দাদার কাছ থেকে উত্তর এল, অনী আর ইরা পাটনা গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেখান থেকেও চলে গেছে। টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে নিলীনা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

সেই যে দরজা বন্ধ করলেন, তখনই হয়তো বরেন দত্তর বোঝা উচিত ছিল এ আঘাতটা নিলীনা সইতে পারবেন না।

যখন বুঝলেন, জোর করে দরজা খুললেন, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

এই একটি হতাশার আঘাতে নিলীনার হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। তারপর রায়পুরে টেলিগ্রাম গেল।

বিজয় মিত্র ছুটে এলেন।

বানগঙ্গার শ্মশানে তখন নিলীনার শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে এসেছে।

'তোমার জন্যে, তোমার জন্যে···তুমি আর একটু নরম হতে পারলে না বিজয়?'

বরেন দত্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

বিজয় মিত্র পাষাণের মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফাঁকি দিয়ে গেল, তাঁকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল নিলীনা। তাঁর জন্যে রেখে গেল ছোট ছোট জয়, পরাজয়, দ্বেষ, বিদ্বেষ, তাঁর ব্যক্তিত্ব খাটাবার সবরকম চেষ্টা, যা এখনই কত তুচ্ছ হয়ে গেছে।

আর ফাঁকি দিয়ে গেল অনিমেষ। তাঁকে উপেক্ষা করে চলে গেল।

নিলীনার মৃত্যুর খবরটা কাগজের পাতাতেই অনিমেষ প্রথম দেখতে পায়!

অনিমেষ তখন অনেক দূরে। এলাহাবাদের বাংলা স্কুলে মাস্টারী করছে।

ইরা মুখ ঢেকে বিছানায় শুয়েই রইল। সারাদিন বাদে, যখন সন্ধ্যা হল, তখন অনিমেষ বলল, 'ইরা, উঠবে না ?'

ইরা জবাব দিল না।

'তোমাকেও যে আমার সঙ্গে যেতে হয় ইরা।'

হ্যাঁ, তাদের দুজনেরই যাবার কথা। সঙ্গমে স্নান করে গায়ে উত্তরীয় জড়াতে জড়াতে অনিমেষ বুঝতে পারল তার জীবনে শান্তি আসবে না, সুখের প্রত্যাশা কোনোদিনও মিটবে না, কেননা ইরা বলেছিল, 'তুমিও ওঁর মন ভেঙে দিলে অনী।'

অনিমেষ এখন বুঝতে পারল, বন্ধ ঘরের দরজা খুলে, অন্ধকারে ফিরে এসে ইরার প্রতিটি কথা সত্যি।

'মা।'

অনিমেষের আর্ত, দীর্ঘ, অশ্রুহীন কান্নায় বাড়িটা কেঁপে উঠল।

এমন করে যদি অনিমেষ আগে ডাকত, একবার ডাকত, কেন সে ছাড়া কেউ বোঝে নি নিলীনার মন কি কোমল, স্নেহভরা, ইরার শুধু সেই কথাই মনে হল।

'ওগো ওঠ, এমন করে কাঁদলে কি মা ফিরে আসবেন ?'

ইরা তার মাথায় হাত রাখল। আশীর্বাদ করুন, নিলীনা আশীর্বাদ করুন, ইরা যেন অনিমেষকে সুখী করতে পারে।

নিলীনার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রায়পুরের বাড়িতে অনিমেষের নাম নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

'ওর নাম ক'র না। ও নিলীনাকে মেরেছে।'

বিজয় মিত্র চেঁচিয়ে উঠেছিল। নিলীনা যে তাঁর জীবনে কতখানি ছিলেন তা বিজয় মিত্র রায়পুরের বাড়িতে পা দিয়েই বুঝেছিলেন। নেই, নিলীনা কোথাও নেই! সেই উন্নত সুন্দর চেহারা. সেই রানীর মতো চাহনি, সেই সদাই ব্যস্ত দু'খানি হাত আর দেখতে পাবেন না।

নিলীনার মনটা তাহলে সত্যিই এতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল ?

এত বছরের বিবাহিত জীবনেও বিজয় মিত্র নিলীনাকে চিনতে পারেন নি সেটাকেও মনে হচ্ছিল একটা পরাজয়।

এই একটা আঘাতই এষাকে বড় করে দেয়।

অনিমেষ আর ইরার চলে যাবার খবর পেয়েই বিভা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসেছিল।

নিলীনার মৃত্যুর খবর পেয়ে সেই বিভাই বলেছিল, 'ওরা কোনোদিন সুখী হবে না। এতজনকে দুঃখ দিয়ে যারা জীবন শুরু করে তারা সুখী হয় না।

তখনই বোধ হয় এষা বুঝতে পারে কনক যেমন ইরাকে ভালবেসেছিল, বিভাও তেমনি অনিমেষকে ভালবেসেছিল।

হ্যাঁ, ঐরকমই সর্বগ্রাসী উগ্রতায়, ঐরকম নিজেকে ধ্বংস করবার নেশায়, ক্ষেপে গিয়ে।

কেননা তারপরই বিভা যেন একেবারে বদলে যায়।

বড় হবার পর এষা খবর পেত বিভাকে এখন রেসের মাঠে দেখা যায়, তাসের আড্ডায়, আরো এখানে ওখানে। উগ্ররকম অস্থির একটা বন্ধুবান্ধবের দলের সঙ্গে ঘুরত বিভা।

এষার কাছে তবু আসত সে, তখনো আসত।

তখন পাঁচটা বছর কেটে গিয়েছে, এষাও বড় হয়ে গিয়েছে তাই বোধহয় বিভা অমন নির্লজ্জভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে পারত।

'এষা, তুমিই বেঁচে গেলে।'

বিভার গলায় যে ক্লান্তি ঝরে পড়ত তা কি শুধু অস্থির জীবনের ক্লান্তি ?

'ভাল লাগে না এষা, বড় ক্লান্ত লাগে।'

এষা চুপ করে থাকত।

'ভালবাসায় এত ক্লান্তি তা আগে জানতাম না এষা।'

এষা নিরুত্তর।

'তুমি বেঁচে গেলে এষা।'

'কেন?'

'তুমি যে অনীকে ভালবাসনি এষা!'

বিভা কথাটা বলেই উঠে পড়ত। যাবার সময়ে বলে যেত 'ওরা খুব কষ্টে আছে জানতে পেলে আমার ভাল লাগত এষা।'

প্রত্যাহত ভালবাসা এমনি করেই বিভার মন থেকে সব দয়ামায়া মুছে নিয়েছিল।

অথচ, যে বিভা অনী আর ইরার সর্বনাশ চাইত সে-ই তখন আরেক রকম পাগলামিতে মেতে উঠেছিল।

মাদার মাতিল্দে-র মিশনে যোগ দিয়ে ঘুরে ঘুরে দয়া দেখাত। হাসপাতালে, কুষ্ঠ আশ্রমে, ভিখিরীদের বস্তিতে সে সেবার কাজ করে বেড়াত। মাঝে মাঝে না কি রাত হলে এসপ্লানেডের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে রাস্তার নেড়ীকুকুরদের রুটি বিলোত।

একটা মানুষের মধ্যে এতখানি দয়া আর এতখানি নিষ্ঠুরতা কেমন করে পাশাপাশি বাস করত তাই ভেবে এষা অবাক হত।

তখন এষাও বড় হয়ে গিয়েছে।

তখন সে-ও প্রথম ভালবাসার স্বাদ জেনেছে। সলজ্জ, ভীরু, কুন্ঠিত এক যুবকের ভালবাসা।

তপন ওদের বাড়তে এসেছিল ক্লাবের তরফ থেকে। সরস্বতী পুজোয় ওদের বাড়ির সামনে সামিয়ানা খাটানো হবে, তাই খিড়কির দরজাটা দু'দিন ব্যবহার করবার, বড় দরজাটা বন্ধ রাখবার অনুরোধ নিয়ে।

তারপর কেমন করে যেন কখনো পাড়ার লাইব্রেরীর বই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে, এষার মা'র ফাইফরমাস খাটবার কাজে, এ-বাড়িতে তপন ঘরের ছেলে হয়ে উঠল।

অথচ, তপন ঠিক সে-রকম ছেলে নয় যাকে বলা চলে গায়েপড়া, হাল্কা স্বভাবের।

'লাজুক ধরনটি যেন ছাত্র ছাত্র ভাবটা ওর মধ্যে রয়ে গিয়েছে।'

এষার মা ছবি কথাগুলো সস্নেহেই বলতেন। অথচ তপন সত্যিই কিছু ছাত্র নয়। তপনরা এ পাড়ার আগন্তুক হলেও, ওদের বিষয়ে সব খবরই ছবির জানা হয়ে গিয়েছিল।

ওরা এ-পাড়ায় ভাড়া বাড়িতেই থাকতে এসেছিল, কিন্তু বাড়িটা রীতিমতো বড়। বাড়ির সাজসজ্জায় রুচি আর অর্থ দুটোই খরচ করা হয়েছিল।

বাড়ির বাসিন্দা তপনের মা, বোন, কাকা, কাকীমা আর কাকার তিনটি ছেলেমেয়ে।

তপন ও বাড়ির অন্যতম বল, সহায় ভরসা। ওর চাকরিটা ভালই ছিল ছবি সে-খবরও জানতেন।

হয়তো ছবির মনের কোণে অন্য একটা ইচ্ছেও ছিল, সে কথাটা এষার জানা হয় নি।

এক সরস্বতী পুজোয় প্রথম আলাপ, আর এক সরস্বতী পুজোর দিনে এষা আর তপন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল।

অনেক চেষ্টায়, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে তপন এষার সঙ্গে এইটুকু একলা হবার সময় বেছে নিয়েছিল।

এষার পরনে হলদে শাড়ি, রুক্ষ চুলে বেণী, গায়ে শালটা আলগোছে ধরা।

'কি বলবে বলছিলে তপন?'

ঠিক তখনই সামনে দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল।

'কি বলবে?' এষা আবার জিগ্যেস করল। সামনের প্যাণ্ডেলে রেকর্ডের গান বেজে উঠল। আকাশ ফাটানো গানের মাঝখানে তপন আস্তে আস্তে বলল 'এষা, আমি তোমায় ভালবাসি। হয়তো তা তুমি বুঝতে পেরেছ।'

এষা নিরুত্তর। একেবারে বোঝে নি, কিছুই বোঝে নি, এতবড় মিথ্যে কথা তার মুখে এল না।

'তুমি যদি বল এষা, তাহলে সারা জীবন আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব', তপনের গলা একটু কেঁপে গেল। কিন্তু বলতে পেয়ে কি স্বস্তি, কি স্বস্তি, বুক থেকে যেন ভার নেমে গেল।

তপন একটা সিগারেট ধরাল, এষার দিকে চেয়ে হাসল।

॥ ১৩ ॥

তপনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে এষার একটু দেরিই হয়ে গেল।

পাড়ার কাছাকাছি এসে তপন বলল, 'এই, তুমি চলে যাও আমি একটু পরে যাচ্ছি।' বলে হাসল। আসলে পাড়াটা এখন আর ঠিক সে-রকম নেই। অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, অনেক নতুন নতুন লোক এসেছে, এষা আর তপনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখলে সরস্বতী পুজোর প্যাণ্ডেল থেকেই হয়তো কথা ছড়াবে।

তপন একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। ওর দিকে পেছন ফিরে হেঁটে চলে আসতে এষার লজ্জা করছিল।

তাই বোধহয়, একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসে এষা বাড়িতে ঢুকল। বাড়িতে কারো সামনে মুখোমুখি দাঁড়ালেই এষা ধরা পড়ে যেত।

কিন্তু আজ আর কেউ সামনা-সামনি নেই। ভাই বোন পুজোর জায়গায়। রান্নাঘরে ঠাকুর কি কাজে ব্যস্ত। ওপরে বাবা আছেন, না মা, হয়তো দুজনেই আছেন। এষা বসবার ঘরের দরজা খুলে দেখল, দরজা-জানলা বন্ধই আছে।

অভ্যাসবশত টেবিল চেয়ারে আঙুল বুলিয়ে দেখল। না, ধুলো নেই।

এইসব ছোট ছোট কাজ করতে গেলে এখনো অনীদার কথা

মনে পড়ে যায়। অনিমেষের কথা কেন যেন একলা দাঁড়ালে, শীতের হিম হিম বাতাসে এখনো মনে পড়ে। সেই তো প্রথম তার মনের জানলা খুলে দিয়েছিল, দেখিয়ে দিয়েছিল সুন্দর ভাবে বাঁচবার প্রয়োজন আছে।

রান্নাঘরের দিকে আলো জ্বলছে, এদিকে আলো নেই। অথচ রাস্তায় আজ অনেক আলো। তাই বোধহয় ভেতরের অন্ধকারকে তরল মনে হচ্ছে আবছা। অন্ধকার এষার চিরদিন ভাল লাগে। তা ছাড়া এই শীতের হিম হিম বাতাসে কি যেন আছে, মনের ওপর এক টা ফোঁটা হিম ঝরতে থাকে, ধীরে, মনের ভেতরে যেন একটা শীতের সন্ধ্যায় শিশির ভেজা মাঠ তৈরি হয়ে যায়। এই মনে হওয়াও তো অনিমেষ তৈরি করে দিয়েছিল।

আজ, অনেকদিন বাদে, সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে এষার অনিমেষের কথা মনে পড়ল। এত অল্পদিনের পরিচয়, আর তখন তো এষা ছোটই ছিল। কিন্তু এষা অনিমেষকে কি যেন দিয়ে ফেলেছিল সেদিনই, নিজের অনেকখানি, সেটুকু যেন পাঁচিল-ঘেরা নির্জন বাগান। সেখানে কি আছে তা এষাই জানে না, কে এসে তার চাবি খুলবে ?

সিঁড়িতে এক পা রেখে এষা মনে করতে চেষ্টা করল কি দিয়েছিল সে অনিমেষকে, তার কতটুকু, প্রেম নয়, ভালবাসা নয় তার নাম ভালবাসার চেয়ে অনেক দুর্বোধ্য, কিন্তু কি ভীষণ তার আকর্ষণ।

'তপন !'

এষা অস্ফুটে বলল।

তপন তাকে ভালবাসে, তপন তাকে ভালবাসে। তপনকে দেখবে বলে এষা কি চুরি করে ছাতের কোণে বার বার দাঁড়ায় না ? রবিবারের দুপুরে, চারিদিক যখন রোদে ধুয়ে যায়, তখন মাধবীলতা-ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কাছেই আছে তপন, ইচ্ছে হলেই তাকে

দেখতে পারে, এ-কথা মনে করলেই তো এষার মনে ঘোর লেগে যায়। সব কিছুতে যেন আমেজ লেগে যায়।

তার নামই তো ভালবাসা। এষা তপনকে ভালবাসে। অনিমেষ ভালবাসত ইরাকে। কনক ভালবাসত ইরাকে। যদিও, যত দূরের সম্পর্কই হোক, ভাই কেমন করে বোনকে ভালবাসতে পারে তা এষা ভাবতে পারে না আজও। সঙ্কোচ এসে মনকে বাধা দেয়। তবু, কত তীব্র ছিল কনকের ভালবাসা, তার স্বাভাবিক জীবন থেকে উৎখাত করে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল কোথায়। বিভা ভালবাসত অনিমেষকে। ওদের ভালবাসার নামও ভালবাসা, এষার ভালবাসাও ভালবাসা। কিন্তু, তাহ'লে এষা কাঁদছে কেন? একা, সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কেন তার চোখে জল?

একটা খবর দিল না ওরা, কোথায় গেল কিছুই জানাল না। নিলীনার কথা এখনো মনে পড়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় অনিমেষ তার একটা অবাস্তব কল্পনা কোনোদিন সে আসে নি এখানে, ওকে কেন্দ্র করে ক্রমে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় নি কয়েকটি জীবন। সব ফক্কিকারী। দুপুরবেলার জাদুকরের হাতে আম আঁটির ভেলকিবাজী। দীর্ঘ বুকভাঙা একটা নিশ্বাস। এষা চমকে চোখ তুলল। কে নিশ্বাস ফেলল? কেউ তো এখানে নেই? কিন্তু ও কি, অনিমেষের ঘরের দরজা খোলা কেন? ও ঘরের দরজা তো বলতে গেলে আজ পাঁচ বছর বন্ধই থাকে। কেউ খোলে না। এ ঘরটা দরকারও হয় না। ভাইবোনকে পড়তে জায়গা দেবার জন্যে ঘরটা খুলে দেবার কথা একদিন এষার মা বলেছিলেন। পাছে সত্যি সত্যিই খুলে দেন, সেই ভয়ে এষা তার কয়েকটা পড়ার বই নিয়ে কয়েকদিন বসল।

কিন্তু আজ ও ঘরের দরজা খোলা।

এষা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। একসময়ে অন্ধকারকে সে ভয় পেত। তেমনিই ভয় হত হঠাৎ, বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, মানুষ নেই দেখলে। বোধহয় বেশি ভয় পেত তাতে।

কিন্তু সেই অনেক আগে, মা যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

এষা এখন বোঝে সেই সময়ে, মাঝরাতের চৌরঙ্গীতে ফিটন সমেত ঘোড়া ল্যাম্পপোস্টে আছড়ে পড়বার দৃশ্য দেখে যখন মা অজ্ঞান হয়ে যান, তখনই তাঁর মা হবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়।

তখন বাবা থাকতেন হাসপাতালে। বাড়িতে একা এষা। ঘরে ঘরে আলো জ্বেলে ভাইবোনদের নিয়ে বসে বসে সে ভয়ে মরে যেত।

যত ভয়, তত ভূতের গল্প পড়া চাই। রাতে আর উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করবার সাহস হত না।

সেই সময়েই তো অনিমেষ তার ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছিল। তার আঙুল ধরে ওপরে নিয়ে যেত, নিচে নিয়ে আসত। গম্ভীর, মধুর গলায় বলত, 'অন্ধকারে ঘুরতে তোমার ভাল লাগে না এষা? রায়পুরের বাড়িতে আমি তো কত রাত অবধি একা একা ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। অন্ধকারে প্রথমটা হয়তো ভয় করে। কিন্তু চোখে সয়ে গেলে খুব ভাল লাগে।'

সেদিন থেকেই এষারও আর অন্ধকারে ভয় নেই।

সে এগিয়ে গিয়ে অনিমেষের ঘরের আলো জ্বালল। অস্ফুট শব্দে বিভা চোখ ঢাকল।

এষা ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে টেবিলের ঢাকনি সমান করল, যতক্ষণ না বিভা চোখ মুছে নেয়।

'কি, অবাক হয়েছ?'

'না। তুমি তো কিছুদিন আস নি।'

'আসব ভাবছিলে না কি?'

'না, তা-ও ভাবি নি।'

'তা জানি, আমার কথা আজকাল তোমার মনে থাকে না।'

বিভার কথায় কোনো খোঁচা নেই।

'কখন এলে ?'

'এই কিছুক্ষণ। তোমার মন আজকাল কোথায় থাকে তাই ভাবছিলাম। রাস্তায় দেখেই বুঝলাম।'

'রাস্তায় ?'

'হ্যাঁ। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যাচ্ছিলে।'

বিভা আর একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এক সময়ে আমিও তোমার মতোই ছোট ছিলাম। অমনি করেই টুকুর সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। টুকু কে জান ?'

'না।'

'টুকু সোম। আমায় ভীষণ ভালবাসত।'

এষা দেখল বিভার চোখের পাতায় জল, বিভাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'ভালবাসার সময় কোনটা বল তো এষা ?'

'জানি না বিভাদি।'

'আমিও জানি না।'

বিভার গলায় দুঃখ। সে আস্তে আস্তে বলল, 'তখন টুকুর বয়স ছিল আঠারো', আমার ষোল। ওর দাদা আমার দাদার বন্ধু ছিল। দাদাকে একদিন কি একটা সিনেমা দেখবার কথা, ওর দাদার হয়ে বলতে এসেছিল। দেখলাম ওর হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। টুকু কি খারাপ দেখতে ছিল তুমি ভাবতে পারবে না এষা। কিন্তু ওর হাতের ব্যাণ্ডেজ দেখেই আমার ভীষণ কষ্ট হল। আমি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম।'

এষার হঠাৎ হাসি পেল। সব মেয়েরাই, যারা সর্বদা লেখাপড়া, কড়া রুটিন, খিটখিটে দিদিমণি, সদাই সতর্ক মা, এদের সামনে বেড়ে না ওঠে তারাই কি এইসব কল্পনা-বিলাসে ভোগে ?

এষা নিজে ছোটবেলা একদল মামাত মাসতুত বোনের সঙ্গ পেয়েছে। তারা সর্বদা প্রেম নিয়ে কথা বলত, যেসব উপন্যাস এবং

সিনেমার শেষে নায়ক অথবা নায়িকা মরে যায়, তাই পড়ত এবং দেখত জীবনের সর্বত্র, প্রতিটি গলি ঘুঁজিতে ট্রাজিডী আবিষ্কার করত তারা। পথের পাশে বেড়াল ছানা, দুপুরবেলা ঘাম ঘাম চেহারার রিক্শাওয়ালা, মাস্টার মহাশয়ের কপালে বেশি আম খাওয়ার দরুন ফোড়া, যা দেখত তাই দেখেই তারা দুঃখ পেত, কাঁদত।

মামাত মাসতুত বোনদের ঘন ঘন রোমান্স এর অভিজ্ঞতার জন্যই অবশ্য এযাদের বাড়ি থেকে তারা একসময় বিতাড়িত হয়।

তারপর বহুদিন হল তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে কোথাও আত্মীয় বাড়িতে দেখা হয়। তাদের সুখী সুখী চেহারা দেখলে মনেও হয় না, একসময় তারা নিজেদের বড় বড় ট্রাজেডীর নায়িকা ভাবত। বাড়ির বাতাস থেকে রোমান্সের গরম বাষ্প উপে যাওয়ার জন্যেই বোধহয় এযার তখন প্রেমে পড়া হয় নি। কিন্তু তবু, বিভাদের কথা বুঝতে তার অসুবিধে হত না।

'অবশ্য সেটাই আমার প্রথম প্রেম নয়।'

বিভা বলল, তার আগে নেস্‌ল্‌স চকোলেটের ছবি জমাতাম। প্রতিটি সিনেমার নায়কের প্রেমে পড়েছিলাম তার আগে ইস্কুলের সব বন্ধুদের ভালবাসতাম, তার আগে বোধহয় আমাকে মালীকে, আর ডাক্তারবাবুকে ভালবাসতাম বছর তিনেক বয়সে। যাদের কেউ ভালবাসতে পারে না, তাদের নীরবে ভালবেসে যাব, এই ছিল আমার আদর্শ। টুকুর খাড়া খাড়া কান অদ্ভুত সরু মুখ, তোতলামি, এবং হাতে ব্যাণ্ডেজ দেখেই আমি বুঝলাম টুকুকে কারো পক্ষেই ভালবাসা সম্ভব নয়।'

'তাই ওর সঙ্গে ভাব করলে?'

'হাঁ। আমাকে যেচে ভাব করতে দেখে টুকু ভীষণ বর্তে যায়। হঠাৎ স্নো মাখত। সাইকেল চড়ে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বেল বাজিয়ে চলে যেত। ও যে কত খোঁড়া ভিখিরী এবং অন্ধ বুড়োকে রাস্তা পার করে দেয়, লেকে ঝাঁপ দিয়ে শিশুকে বাঁচায়,

রোগা কুকুরছানাকে কোলে করে নিয়ে আসে, এইসব গল্প আমায় ঘন ঘনই করত। আমি বুঝতে পারতাম সব মিথ্যে কথা। কিন্তু টুকু আমাকে খুশি করবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছে ভাবলেও আমার ভাল লাগত।'

'তারপর ?'

'মাত্র মাস দেড়েক আমাদের পরিচয় হয়। তারপরই ও ম্যাট্রিক ফেল করল। ওর বাবা ওকে কোথায় যেন বোর্ডিঙে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা কথা দিয়েছিলাম চিরদিন দুজনে দুজনকে মনে রাখব।'

'মনে রেখে ছিলে ?'

'নিশ্চয়ই না।'

'আর কখনো দেখা হয়েছে ?'

'প্রায়ই হয়।'

'সে কি।'

'টুকু মাসিমার দেওরের ছেলে। এল. এম. এফ. পাস করে অথবা না-করে প্রাকৃটিস জমিয়ে ফেলেছে। মা'কে ইন্‌সুলিন দিতে রোজই আসে।'

'কি আশ্চর্য !'

'আশ্চর্য হবার কি আছে! প্রথম ভালবাসা সাধারণত দূরের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই হয়। এসব ভালবাসা কোনোদিনই টেঁকে না। কাজেই ন্যায় অন্যায়ের কথা তুল না এষা। আজ আমার ওসব কথা ভাল লাগবে না।'

'বিভাদি, চা খাবে ?'

'না। আজ আমি শুধু কথা বলব বলেই এসেছি।'

এষা অগত্যা ভাল করে বসল।

'আসলে, অনীকে ভালবাসার আগে অবধি আমি জানতাম না ভালবাসা কাকে বলে।'

'আমি এ-সব কথা শুনতে চাই না বিভাদি।'

'কিন্তু আমি যে বলতে চাই। তাছাড়া আমি অনীকে ভালবাসতাম, এখনো ভালবাসি, ও আমায় ভালবাসে নি, ইরাকে ভালবাসে এ-রকম ঘটনা তো সব সময় ঘটছে এষা। সবাই বলে না, হ্যাঁ, আমার মর‍্যাল কারেজ আছে আমি বলি। এতদিন বাদে এ-কথা শুনে তুমি নেকু খুকুর মতো লজ্জা পেওনা। ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না।'

'আগে তোমার এত সৎসাহস ছিল না বিভাদি।'

'সত্যি কথা। ছিল না। লেডী নিলীনা মিত্র আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন।'

'অনীদার মা কি লেডী ছিলেন?'

'আহা, লেডী থাকা বলতে কি বোঝ। লালমুখো কোন সাহেব, হার ম্যাজেস্টির গভর্নমেণ্টের হয়ে তাঁকে খেতাব দিয়ে যায় নি। কিন্তু ওর মতো মহিলা......এখন এমন দিন যায় না যখন আমার ওঁকে মনে পড়ে না।'

পরে, অনেক পরে, মৃত্যুর অনেক বছর বাদেও এষার জীবনে এমন অনেক পরিস্থিতি হয়েছে, যখন নিলীনা মিত্রের কথা বার বারই উঠে পড়েছে। মৃত নিলীনা মিত্র, দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার পর, যেন সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্ব কতখানি প্রাণবন্ত ছিল, মৃত্যুর পরও তাই, কতজন তাঁকে স্মরণ করে, শুধু স্মরণ করেই শান্তি পায়।

বিভা বলত, 'জাত গোলাপের আতর যত পুরানো হয় তত গন্ধ বাড়ে। আশ্চর্য, অনী, তুমিই চিনতে পার নি ওঁকে।'

ঠাট্টা করে বলত। অনেক বছর বাদে। বহু বছর অতিক্রম করে, অনেক পথ হেঁটে, বিভা আর অনিমেষ যখন ক্লান্ত দুই পথিকের মতো মুখোমুখি বসে থাকত, ইরার ছবির তলায়।

ততদিনে বিভার ভালবাসা বোধ হয় একদম ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই সে অনিমেষকে নানা ভাবে বিদ্রূপ করত, ব্যঙ্গ করত।

অবশ্য সে অনেক, অনেক পরে। যৌবনে যদি কয়েকজন মানুষ পরস্পরের প্রতি তীব্র ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, যদি সেইসব গভীর সর্বগ্রাসী অনুভূতির ওপর বিশ্বাস রেখে নিজের জীবনে বড় বড় ত্যাগ করে বসে থাকে, (যেমন করেছিল বিভা, নিজেকে শুধু বঞ্চিত করে চলেছিল, যেমন করেছিল অনিমেষ যা পাওয়া যায় না তাই চেয়েছিল, আর অসম্ভব এক আদর্শকে ধরতে গিয়ে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলেছিল), তাহলে আর কোনোদিন তাদের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত নয়।

কেননা উপে যায় সব, চলে যায় ভালবাসা, এ জীবনে সবই বড় অস্থায়ী নশ্বর চঞ্চল। এমন কি এ পৃথিবী পর্যন্ত স্বভাবে চঞ্চল, প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে আবর্তিত হচ্ছে, জায়গা বদলাচ্ছে।

তাই, ভালবাসা থাকে না, থাকে তার স্মৃতি, থাকে শূন্যতা, থাকে তার বয়সের বিষণ্ণ ক্লান্তি। জীবনের মধ্যপথে পৌঁছে কে যৌবনের সে অস্থির আবেগে আন্দোলিত হতে চায়, কে চায় সব ভাসিয়ে দিয়ে একজনের জন্যে মরতে, বাঁচতে, সব করতে?

যৌবনে প্রেম ভাল, মধ্যবয়সে স্মৃতি, অথবা, অন্য কোনো ভালবাসা, অন্য মানুষকে। পথের প্রথমে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তারা একই রকম আছে মনে করে পুরনো আবেগের প্রতি বিশ্বস্ততা বশত আবার তাদের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গেলেই মোহভঙ্গ অনিবার্য।

কেননা বড় অস্থায়ী সব, বড় বদলায়। বদলায় বলেই ব্যথা পায় মানুষ, বদলায় বলেই তবু বেঁচে থাকে সব, মুহূর্তে মুহূর্তে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে একটু একটু করে পুরনোকে ফেলে দিয়ে নতুনকে জন্ম দিয়ে।

বিভা তা বোঝে নি। অনিমেষও না। একজন ছুটে গিয়েছিল সেই সর্বগ্রাসী ভালবাসা নিয়ে, আর একজন এগিয়ে এসেছিল অপরাধ বোধ বশত।

কাছে এসে, অনিমেষের কাছে এসে বিভা দেখেছিল তার মনে আর সে ভালবাসা নেই, অনিমেষ দেখেছিল তার নিজের মনে শুধু শান্তি আর ক্লান্তি।

তাই সব সময়ে সংঘর্ষ হত। যার চলার পথে বুক পেতে দিতে পারত বিভা, যার জন্যে সে জীবনে শ্রেষ্ঠ দিনগুলোই হেলায় বইয়ে দেয়, সে যৌবনের অনিমেষকে প্রৌঢ়, বিষণ্ণ, গম্ভীর মানুষটির মধ্যে কোথাও খুঁজে পেত না বিভা।

তাই সব সময় ব্যঙ্গ করত। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বিদ্রূপ। সেই জন্যই একদিন অনিমেষ ছুটে এসেছিল এষার কাছে। বলেছিল 'এষা, আমাকে এই শেষ সর্বনাশ থেকে বাঁচাও, বিভাকে এতবড় ভুল করতে দিও না।'

আর এক বর্ষার মেঘলা দুপুরে। আকাশের কোণায় কোণায় যখন মেঘ জমে থাকে। ছেলেরা যখন ছাতে গিয়ে 'ভো কাটা নাক কাটি, ভো কাটা নীল বুলুম' বলে ঘুড়ির নাম ধরে চিৎকার করে, আর আকাশ জুড়ে নানা রঙের ঘুড়ি উড়ে বেড়ায়. তেমনি এক মেঘলা দুপুরে অনিমেষ এষার কাছে এসে এইসব কথা বলেছিল। আশ্চর্য, সেদিন এষার বুকের নিচে ব্যথা করলেও কিছুতে এষা বলতে পারে নি, 'অনীদা মনে পড়ে? যেদিন তুমি প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে সেদিনও এমনি ঘন মেঘে ঢাকা নীল দুপুর, আকাশে ঘুড়ি উড়ছিল?' আরো বলতে ইচ্ছে হয়েছিল 'মনে পড়ে? আমাকে একটা বই দিয়ে তুমি বললে এটা নিয়ে যাও। পাতা খুলে দেখলাম তুমি লিখে রেখেছ 'ডু ইয়ু রিমেম্বার অ্যান ইন, মিরান্দা, ডু ইয়ু রিমেম্বার অ্যান ইন?' যে কবিতা ভাল লাগে সেটারই একটা দুটো লাইন তুমি বইয়ে লিখে রাখ তা আমি তো জানি না তখন। তাই ভেবেছিলাম ওটা আমার জন্যেই লেখা। তাই বইটা বাক্সের নিচে লুকিয়ে রাখতাম। অনেক বড় হলে তবে বুঝলাম কিছু না ভেবেই তুমি লিখেছিলে, আর, আর, আমি

কোনোদিনও তোমার মিরান্দা ছিলাম না। ও-সব নামে সবাই সবাইকে ডাকে না।'

কিন্তু তা অনেক, অনেক পরের কথা। সরস্বতীপুজোর সন্ধ্যে রাতে, অনিমেষের ঘরে বসে বিভা এষাকে বলল, নিলীনা মিত্র আমাকে বলেছিল বিভা তুমি অনীকে ভালবাস, তাই না? ওঁর চোখের দিকে চেয়ে আমি বুঝলাম ভালবাসার কথায় লজ্জা পাবার কিছু নেই। তাই তো আজ তোমাকে সব সহজ করে বলতে পারছি এষা।'

লজ্জা পাবার কিছু নেই! এষার এখন আর এক জনের মুখ মনে পড়তে লাগল। ইরার মুখ।

কোন কোন ভালবাসায় লজ্জা জড়িয়ে থাকে, বিভা হাই তুলল, 'যেমন ধরো দাদার কথাটা। ইরার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এত দূরের, যে তাতে হয়তো বিয়ে আটকায় না। কিন্তু, যত দূরে যাক, যত দূরের সম্পর্ক হোক, যা নিঃসম্পর্কেরই শামিল, তবু বোন বলে জানত বলেই বোধহয় দাদা লজ্জা পেল। অবশ্য, সেজন্যে আমি ইরাকেই দোষ দিই।'

'ইরাদির ওপর কেন তোমার রাগ যায় না বিভাদি?'

'কেন রাগ যায় না!'

বিভা চোখের পাতা কষ্ট ক'রে টেনে মেলে এষার দিকে চাইল। তারপর বলল, 'খালি ঘুম পাচ্ছে এষা। দু'রাত ব্রিজ খেলেছি লীলাদের বাড়ি, তারপর মিশনের কাজে ধাপার মাঠের কুষ্ঠরোগীদের ওখানে যাওয়া, হাসপাতালে ভিজিট করা, কাজ ক'রে ক'রে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি।'

'একটু শোবে?'

'শোব?' বিভা আবার হাসল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল।

'আমাকে আরাম দিতে পারে এমন শয্যা কোথাও নেই!

আমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়ত, জান, ভারী খেয়ালী। ঐ লীলার দিদি ঐন্দ্রিলা। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সী আর ইউনিভার্সিটি, সেন্ট জেভিয়ার্সের বাঘা বাঘা জ্যাভেরিয়ানদের সকলের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছিল।'

এষা বুঝল বিভা আজ পাগলামি করবে বলেই এসেছে। একবার ওপরে না গেলে মা হয়তো ভাববেন এষা সেই যে বেরিয়েছে, এখনো ফেরে নি। কিন্তু ওপরে যায়ই বা কি ক'রে?

'আমরা বলতাম ইন্দী, তুমি কি চাও বল দেখি?'

'ও কি বলত জান? ঘুমোতে চাই।' বিভা আবার চোখ মুছে ঘুম তাড়াল।

'আমরা বলতাম ঘুমোতে চাই মানে কি! তখনো তো জানি না ওদের পরিবারটাই অস্বাভাবিক। ঐন্দ্রিলা সারাদিন হইচই করে, আর সারারাত ঘুম হয় না। ঘুম হয় না বলে গুনগুন করে কাঁদে। আমরা বলতাম এসব তোমার বাজে কথা। ও বলত, আমার ঘুম আসবে, আরাম হবে, কোথায় জানি না।'

বিভা ভুরু কুঁচকে সেদিনকার কলকাতার মন কেড়ে নেওয়া মেয়ে ঐন্দ্রিলার প্রায় ভুলে যাওয়া চেহারা ভাবল।

'একদিন হঠাৎ বলল মেডিক্যাল কলেজের সুহৃদ্ আমায় ভালবাসে। ওকে বলেছি হসপিটালের মর্গে নাকি খুব ঠাণ্ডা। সেখানে যদি আমাকে থাকতে দেয়, তো ঘুমিয়ে বাঁচি। আমার সেদিন ওর কথাগুলো ভাল লাগে নি। রেগে বললাম হিস্টিরিয়া ক'র না। ও বলল, বারে, আমার যে খুব ঠাণ্ডা জায়গা ছাড়া ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। তারপর ও কি করল জান?'

'কি?'

'ওর চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব সবাইকে চিঠি লিখল ওর বাবা ওর মাকে মেরে ফেলেছেন সেজন্যে ওর মনে মনে খুব দুঃখ। সেজন্যে ঘুম হয় না তা একটা কারণ। তা ছাড়া সূর্যটা পৃথিবীর কাছে

চলে আসছে। পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যে, গরমে ওর ঘুম হতে চায় না। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাতের টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখে ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে আকাশ আর পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচে যাচ্ছে। তাই সব তারাগুলো অত বড় বড় দেখাচ্ছে। এই সব নানা চিন্তায় ওর ঘুম হয় না। তাই ও ঠাণ্ডা জায়গা বেছে ঘুমোতে চলল। কেউ যেন ওর খোঁজ না করে। সময় হলেই ও ফিরে আসবে। ও কোথায় ঘুমোতে গিয়েছিল জান?'

'কোথায়?'

'লেকের জলের তলায়। বোয়িং ক্লাবের আরো কে কে নৌকোয় ছিল। বিকেলবেলা। কে যেন বলেছিল সূর্য ডুবে গেল। সূর্য ডুবে গেছে? দেন দিস্ ইজ্ দ্য টাইম বলে ও জলে পড়ে যায়। পরদিনের আগে ওকে তোলা যায় নি। তখনকার দিনে বিরাট স্ক্যাণ্ডেল হয়েছিল। যারা কোনোদিন ওর কথা ভাবে নি, ওকে দেখে নি, তারা প্রথমটা হয়তো ভেবেছিল বড়লোকের অপদার্থ মেয়ের খেয়াল। কিন্তু কাগজে একটা ছবি বেরোতেই, ঐ মুখ, ঐ লুটিয়ে পড়া চুল দেখে কলকাতার তরুণরা ক্ষেপে গিয়েছিল। লেকের ধারে হেঁটে হেঁটে জায়গাটাকে তাপ বানিয়ে ফেলেছিল প্রায়। বিখ্যাত আধুনিক কবিদের ক'জন তখন প্রথম কবিতা লেখে ওকে নিয়ে হাতে গুণে বলে দিতে পারি।'

বিভা থামল।

'রাত হচ্ছে,' আস্তে বলল।

'হ্যাঁ।'

'আমি আজ ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম বাড়িতে। ঘুম হচ্ছিল না। তাই তোমার কাছে এসেছিলাম এখা। কিন্তু এখন আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি বাড়ি যাব।'

'ট্যাক্সি ডেকে দোব?'

'না না। এমন সুন্দর রিকশা আছে, চড়ে চলে যেতে পারি। নইলে হেঁটে যাব।'

'বাড়ি যাবে তো?'

'বাড়ি? পাগল হয়েছ?'

'তবে কোথায়?'

'কেন, চৌরঙ্গীতে?'

'চৌরঙ্গীতে!'

'তুমি জান না, আমি কুকুরদের রুটি দিই! ওরা আমার জন্যে বসে থাকে। লিণ্ডস স্ট্রীটের উল্টো দিকের গড়ের মাঠে, মনোহর দাস তড়াগের পেছনে ওরা অপেক্ষা করে। রুটি কিনেছি।'

বিভা ব্যাগটা থাবড়ে আওয়াজ করল।

'কিন্তু বিভাদি, এখন, এত দেরিতে·· আজ না গেলে কি হয়? বাড়ি গিয়ে ঘুমোলে হত না?'

বিভা হঠাৎ বেজায় চটে গেল।

ব্যাগ থেকে চিরুনী বের করে চুল আঁচড়াল। তারপর দাঁড়িয়ে আবার চোখ রগড়ে বলল, 'মানুষ-টানুষ নয়, কয়েকটা কুকুর, হ্যাঁ কয়েকটা কুকুর আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে। আর কেউ তো জীবনেও অপেক্ষা করে নি আমি যাব বলে। ওদের ঠকাব কেন?'

দরজার কাছে এসে চেঁচিয়ে বলল, 'হোয়াই? ওরা কি মানুষদের চেয়ে খারাপ? মোটেই না।'

বিভা বেরিয়ে গেল।

এষা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বিছানার চাদর সমান করল। আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এল।

বিভার কথা ভাবতে ভাবতেই ওপরে উঠে এল।

'কে এসেছিল?'

ছবির গলায় ক্লান্তি। এতক্ষণ জানালায় বসে পুজোর মণ্ডপের গান শুনছিলেন।

'বিভাদি।'

'তুই কখন এলি?'

'অনেকক্ষণ।'

'বিভা গেছে?'

'এই এখনি গেল। তুমি কি করছিলে?'

'তপনের মা এসেছিলেন। উনি যাবার পর থেকে এখানে ব
আছি!'

'রাত হল, মা, ওদের ডাকলে হয় না?'

'ঠাকুরকে বল।'

'বাবার জন্য রুটির কথা বলেছিলে?'

'এ-সব তো এখন তুমিই বল বাছা। আটা যে বের ক'রে দি
যাও নি তা কেমন ক'রে জানব? ঠাকুর এসে বলল, তখন আবা
নিচে যেতে হল। জানি না তোমার মন আজকাল কোথায় থাকে!

মন কোথায় থাকে! এষা তাড়াতাড়ি 'দেখি, ওদের দেখ
পাই কি না,' বলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

মণ্ডপের দিকে চেয়ে ভাইবোনকে খুঁজল না। ওপাশে গি
রেলিঙে ভর দিয়ে বাইরে চাইল। তার মন আজকাল কোথা
থাকে?

তপনের ঘরে আলো জ্বলছে। তপন বাড়িতে এসেছে।

অনেকক্ষণ ধরে এষা সেদিকে চেয়ে রইল।

॥ ১৪ ॥

তপন আর এষার মেলামেশা একজন খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল আর হিংসেয় পুড়ে মরছিল, তপনের বোন মালা। অনেকদিন অবধি দাদার প্রতিটি গৌরবে, কৃতিত্বে সে অংশ নিয়ে আসছে।

পরীক্ষা পাশের কৃতিত্ব, চাকরি পাবার আনন্দ সব কিছুতেই তারই দাবি বেশি হয়ে থেকেছে।

দাদার জামাকাপড় সে গুছিয়ে দেবে, দাদার বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে সে সঙ্গে যাবে, সিনেমা, থিয়েটার যা দেখবার সব দাদার সঙ্গে দেখবে। তার আগে দাদার মাথাধরার খবরটুকু কেউ জানলে তার ভীষণ অভিমান হয়।

তাই মা যখন বললেন, 'তপনের বউ এলে তবে তোর সব জারিজুরি ভাঙবে।' তখন কাকীমা হেসে বলেন, 'ও ননদিনী রায়বাঘিনী হবে, দেখে নিও।'

মালা বলে, 'আমাকে না জানিয়ে, আমার মত না নিয়ে তোমরা দাদার বিয়ে দাও না দেখি!'

মালাই তপনের পরিবর্তন সবচেয়ে আগে বুঝল।

অবশ্য না বুঝবার কোনো কারণ ছিল না, কেননা তপন গোপন করবার মতো কোনো চেষ্টাই করে নি। খুব সাদাসিধে ধরনের ছেলে সে। নিজের বলতে বোন ওর মা। কিন্তু কাকা কোনোদিন মনে করেন নি, ওকেও বুঝতে দেন নি পিতৃহীন।

পাঁচজনকে নিয়েই বড় হয়েছে তপন। নিজের সুখ দুঃখকে বড় করে দেখে নি, সে শিক্ষাও ওদের সংসারে ছিল না। পরীক্ষাতে ভালই করত, বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যাও কম নয়। তবে, গেরস্ত স্বভাবের ছেলে, একদিন দায়িত্ব নিতে হবে সেই দিকে তাকিয়েই বড় হচ্ছিল। তাই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে খুব একটা গা ভাসিয়ে দিতে কখনোই পারে নি।

তার জন্যে তপনের খুব দুঃখও ছিল না। বাড়িতে ওরা সাধারণ সুখেদুঃখে কাছাকাছি, বড় সুখী, মনে এমন কোনো অভাববোধ ছিল না যে জন্যে ঘরের চেয়ে বাইরেকে ভাল লাগবে।

এ-পাড়ায় যখন বাড়ি নিয়ে উঠে এল ওরা, তার আগেই তপন তার বাবার অফিস ম্যাকলাউড অ্যাণ্ড ম্যাকলাউডে ঢুকে পড়েছে।

ও চাকরিতে ঢোকার সঙ্গে কাকার পেনশান নিয়ে রিটায়ার করা আর ওর বিয়ে, মালার বিয়ে জড়িয়ে আছে তা তপন ভাল করেই জানত। আরো জানত, অবস্থা ওদের বেশ ভাল। খুব বেহিসেবী না হলে কারোই কষ্ট হবে না, আর বেহিসেবী হয় এমন শিক্ষা ওর রক্তেই নেই। ফ্যাশানের হাওয়া পালটেছে বলে বাবার গরম কোট গায়ে দিয়ে বেরোতে তপন কোনো দিনই লজ্জা পায় নি।

সবকিছু যেমন নিয়মমতো হয়ে গিয়েছে, বিয়েটাও তেমনি করেই একদিন হবে, এতে তপনের কোনো সন্দেহই ছিল না। এখানে আসার আগে ওরা শ্যামবাজারে ছিল। জ্যাঠামশায়ের মেয়েদের বিয়ে তার বাবা কাকাই একদিন দিয়েছেন। মামাতো পিসতুতো ভাইদেরও সময়মতো বিয়ে হয়েছে। সময় হলে বিয়ে হয়, তারও হবে, কাকা আছেন, মা আছেন, ও নিজে আর তা নিয়ে ভাবে নি।

বন্ধুবান্ধব অবশ্য মাঝে মাঝে খুঁচিয়েছে। তপন একটু হেসে ক্ষান্ত হয়েছে। আজ ওদের বিয়েতে তপন নেমন্তন্ন খাচ্ছে, একদিন তপনের বিয়েতে ওরা নেমন্তন্ন খাবে, অতএব তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি ?

খুব সাধারণ, অথচ ভদ্র মধ্যবিত্ত ছেলে তপন। ব্যবহারে বিনয়ী স্বভাবে শান্তিপ্রিয়, সবরকম আতিশয্যের ওপর তার অবিশ্বাস। মাসে দু'বার চুল কাটে, প্রথম রবিবার সিনেমা দেখে, ছুটির দিনে দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে বন্ধুদের বাড়ি যায়।

এষাকে ভালবাসার সময়েও তার মন একটুও ব্যস্ত হয় নি তখনি সে ধরে নিয়েছে এষা রাজী হলেই সে বিয়ে করবে। ওরা তাদের স্বজাতি, কোনো বাধা নেই। তা ছাড়া ভালবাসার স্বাভাবিক পরিণতি বিয়ে, তপন তা-ই জানে।

এষার কাকা তাকে একদিন বললেন, 'এবার তোর একটা বিয়ের চেষ্টা করতে হয়। বউদি বলছিলেন।'

তপন মৃদুস্বরে বলল, 'আগে মালার বিয়েটা হ'লে ভাল হত।'

'তোর কাকীমা বলছিলেন কাদের যেন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে। বেশ সবদিকে ভাল। তোর আর মালার ওখানেই কাজ হতে পারে। আগেকার দিনে যাকে বলত পাল্টি বিয়ে।'

তপন কাকার চেয়ে কাকীমাকেই বলা সমীচীন মনে করল। কাকীমা ছেলেমেয়েদের পড়াতে চেষ্টা করছিলেন, তপনকে দেখে বেঁচে গেলেন।

'কি রে, অসময়ে?'

'দরকার আছে।'

'দাঁড়া, মাপটা নিয়ে নিই।' কাকীমার একমাত্র নেশা উলবোনা। সারা বছর তাঁর হাতে উলকাঁটা থাকে। বাড়ির সকলকে তো বটেই, চাকর ঝি, পাড়া প্রতিবেশী, সবাইকে তিনি বুনে দেন। তপনের মাপটা নিয়ে নিলেন।

'এটা কি আমার?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ তপন কাকীমার উলবোনা দেখল। শৌখিন কাজ ছাড়া অন্যকাজে তার এই কাকীমাটির খুব দক্ষতা নেই। মা বলেন এ বাড়ি বলেই কাকীমা উতরে গেলেন, অন্য বাড়ি হলে তাঁর খুব কষ্ট হত। কাজকর্মে দক্ষতাটাই সব নয়, কাকীমার স্বভাবটি সুন্দর। সংসারে সুখশান্তি রাখতে হলে সেটার দাম অনেক।

'একটা কথা ছিল কাকীমা।'

'বল্।'

'একবাড়িতে দু'জনের বিয়ে হয়, এ-রকম কোনো সম্বন্ধ না দেখাই ভাল। তা ছাড়া মালার বিয়েটা আগে হোক।'

'মালার বিয়ে! ওর তো সবে সতেরো হয়েছে তপন?'

'কি-বছর ফেল করছে। ওকে পড়িয়েই বা কি হবে?'

'সে তো নিশ্চয়ই। তা ছাড়া মালা যে-রকম সংসারী ওর বিয়ে হলেই ভাল।'

'তাই দেখ।'

মালা সবই বুঝতে পারছিল। হিংসায় জ্বলে যাচ্ছিল, ও অভিমানে শেষ হচ্ছিল। সেদিন দাদার ঘরে বসে দাদার শার্টে বোতাম টাঁকতে টাঁকতে সে বলল, 'তুই যা ভাবছিস তা হবে না দাদা।'

'কি ভাবছি?'

'এষাদি এসে আমাদের সংসারে ঘোমটা টেনে বউ হবে না।'

'হঠাৎ একথা কেন?' তপন অফিসের কাগজপত্রের উপর চোখ রেখেই জবাব দিল।

'হঠাৎ নয় দাদা, তুই তা জানিস্!'

'তার মানে?'

'তার মানে তুইও জানিস্, আমিও জানি। এষাদি সে ধরনের মেয়েই নয়।'

'কে বলল? তুই কি তাকে জানিস্।'

'বেশি জানার দরকার কি? ওরা অন্য ধাঁচের। আমাদের সঙ্গে খাপ খাবে না।'

'কেন, আমি কি একটা বাঘ না ভালুক, না তুই-ই বাঘের বোন বাঘিনী, যে খাপ খাবে না।'

'দাদা! এষাদি একেবারে অন্য ধরনের মেয়ে!' মালার গলা বেশি তীক্ষ্ণ হল।

'ব্যাপারটা কি বলত? সকালবেলা হঠাৎ ক্ষেপে উঠলি কেন?'

'জানি আমি, সব জানি, ভেবেছ আমি টের পাই নি কিছু?'

'টের পাবি না কেন, আমি কি তোদের লুকিয়ে কিছু করছি!'

'তুই ভাবছিস যা তা হবে না, ও যেমন দাম্ভিক, তেমনি নাকতোলা। তাছাড়া কেমন যেন অস্বাভাবিকও বাপু। আমার খুব বিশ্বাস ওর সঙ্গে আমাদের একেবারে খাপ খাবে না।'

'তোর সঙ্গে খাপ খেল কি না তা ভাববার দরকারই নেই। কেননা তুমি তাড়াতাড়িই বিদায় হচ্ছ।'

'কে বললে ?'

'আমিই বলছি। আমি আর কাকাই তো তোর গার্জেন, না কি।'

'আমি এখন বিয়ে-টিয়ে করব না।'

'না, দু'বছর তো হল, আবার এক বছর ইস্কুলে যাওয়া আসা করবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি ?'

দু'বছর ফেল করে মালাও জানে অদূর ভবিষ্যতে তাকে বিয়ের পিঁড়িতেই বসতে হবে, গত্যন্তর নেই। কিন্তু তপনের মুখে ফেল করবার খোঁটা খেয়ে সে কেঁদেকেটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তপনের মনে ভাবনা রেখে গেল। এষা অন্যরকম, তার দেখা, চেনা মেয়েদের চেয়ে অন্যরকম। সেখানেই এষার আকর্ষণ। এষা যাদের সঙ্গে মিশেছে তারা তপনের অচেনা। এষার জীবনে এ পর্যন্ত যে-সব অভিজ্ঞতা হয়েছে তা তপনের অজানা। তবু এষা তাকেই ভালবেসেছে।

এষার, নিজের জীবন সম্পর্কে অন্য অন্য ধারণা আছে কি না, কোনো উচ্চাশা, কেরিয়ার গড়বার বাসনা, তা তপন জানে না। তার ধারণা এষাও বিয়ে করলেই সব মানিয়ে নেবে, বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তার সুখশান্তির যে-সব চেনা চেহারা মনে মনে আছে, এষা একাই সেই বহুরূপা হবে, একাই হবে বিচিত্রা।

তার জগৎ যাদের নিয়ে গড়া, তাদের তো যে কোনো সময়েই এষা চিনতে পারে, তাদের মতো মানুষ এষার আশেপাশে ছড়িয়ে থাকে, সমাজের সর্বত্র তাদের দেখা যায়।

কিন্তু এষার জগৎ কাদের নিয়ে ? কাদের প্রভাব এষার ওপর পড়েছে ? গ্রহ, রত্ন, জল-বাতাস যেমন মানুষকে নানাভাবে প্রভাবিত করে, মানুষও তেমনিই মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিটি পরিণত মানুষের এই পরিণতির মূলে থাকে কেমন মানুষের সঙ্গে সে মিশেছে সেই কথাটি। কোন কোন ঘটনা তার

মনকে নাড়া দিয়েছে, সেই সব। এষার জগৎ কাদের নিয়ে? কোন কোন ঘটনা ওর মনকে নাড়া দিয়েছে, তা তপন কবে জানতে পারবে? না, সব জানার দরকার হয় না, ভালবাসায় মানুষের জন্মান্তর ঘটে, তখন আর পুরনো খবর জানবার দরকার করে না, নতুন মানুষটিকে জানলেই যথেষ্ট হয়?

একটা কথা তপন ভাসা ভাসা বোঝে। এষার নিজের একট কল্পনার জগৎও আছে, আর হয়তো, তপনের ভয় হয়, এষার কাছে সেই কল্পনার জগৎটাই বেশ সত্যি।

তপনের মনে হয়, এ-সব কল্পনাশ্রয়ী হওয়া-টওয়া মানুষ হবার পদ্ধতির ভুলের জন্যে ঘটে। অত রাশ ছেড়ে মানুষ করতে নেই, অত খেয়ালী হতে দিতে নেই। সে জন্যে তপন এষার বাবাকেই দোষী করে রেখেছে। মানুষ হিসেবে তিনি খুবই ভাল। কিন্তু এদিকে একেবারে রাশ ছাড়া। সংসারের বল্গা মেয়েদের হাতে নয়, পুরুষদের হাতে থাকাই ভাল। কাব্যের হিসেবে সুভদ্রার হাতে বল্গা তুলে দেওয়া চলে. সংসারে কৃষ্ণ সারথিই ভাল।

এষাদের সংসারের রাশটা এখন কারো হাতেই নেই। এষা আর তার ভাইবোনেরা পড়ছে বটে। কিন্তু তার পেছনেও যেন কোনো সুনির্দিষ্ট চিন্তা নেই। একমাত্র এষাকেই সে রাজ্যের চিন্তা করতে দেখে, এষার ওপরেই সংসার।

এ-গুলো তপনের ঠিক পছন্দ নয়। ও যা জানে, যা চেনে, সংসারকে সেই চেনা চেহারাতেই দেখতে চায়। এষা যে তা নয়, সেইজন্যেই তার ওকে ভাল লাগে। আবার মনে হয় ওকে ঠিক তাদের মতো করে গড়ে নিতে হবে। তপন জানে ওর পিসতুতো-জ্যাঠতুতো দিদিরা যে যে বাড়িতে গিয়েছে, সে সেই বাড়িরই ছাঁচে ঢালাই হয়ে পতিকুলের শক্তিবৃদ্ধি করেছে।

মেয়েরা নিজেদের ঢেলে সাজাতে পারে। তাতে তারাও শান্তি পায়, সংসারেও শান্তি থাকে। তপন বিশ্বাস করে এষাও নিজেকে

ঢেলে সাজবে। এষা যে আপত্তি জানাতে পারে তা তপন বিশ্বাস করে না। সে তো ছেলে হিসেবে অযোগ্য নয়। তাহ'লে এই দাবিটুকু জানাতে পারবে না ?

এষারও, এই প্রথম, বাইরের লোককে নিজের কথা বলতে ভাল লাগল।

'বিভাদি আমাদের খেতে বলেছে।'

'কে বিভাদি ?'

'গেলেই দেখতে পাবে। আমাদের চেনা, আমাকে ভালবাসে।'

'কিছু মনে করবেন না তো ?'

'কি মনে করবেন ?'

'এই, আমাদের মেলামেশা দেখে ?'

'মেলামেশা দেখে মনে ভাববেন কেন ?'

'লোকে নানারকম কথা ভাবে বই কি।'

'না না, বিভাদি সেরকম নয়।'

বিভাকে দেখেই তপনের মন বিগড়ে গেল। বিভা বাইরে বেরোবে বলে টুকটুকে লাল পাড় সবুজ কটকী শাড়ি পরে ঠোঁটে টুকটুকে লিপস্টিক লাগিয়ে বসেছিল বারান্দায়। তপন বাড়ি, বাগান বাগানে মালী, বেতের চেয়ার দেখেই সঙ্কুচিত হল। ভাবল এরা বোধহয় ভীষণ সায়েব।

বিভাকে দেখেই তার রীতিমতো খারাপ লাগল। মেকআপ যারা করে তারাই খারাপ মেয়ে, তপন এই ধারণাতেই অভ্যস্ত। সবচেয়ে খারাপ লাগল তার বিভা যখন লাফিয়ে উঠে 'এষা, সুইটহার্টকে এনেছ ? তুমি একটা ডার্লিং,' বলে এষার গালে চুমু খেল। সে দেখে খুশি হল এষা, তাড়াতাড়ি গালটা মুছে ফেলল।

সে এখনো এষার হাত পর্যন্ত ধরে নি, অথচ বিভা তারই সামনে এষাকে চুমু খেল! মেমসাহেবেরা এ-রকম করে তপন জানে। বিভা মেমসায়েব হতে পারে, এষা তো নয়। নানা কারণে তার

মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে ঠিক করল এষাকে বারণ করে দিতে হবে।

'কি খাবে বল? আজ আমরা ডাচ পিকনিক করছি জান এষা?'

এষা চোখ তুলল।

'যে যার সে তার খাবার নিয়ে যাব। একটু পরেই ওরা আসবে। লীলা আর অন্তরা।' বলল বিভা, তুমি শুধু কাবাব নিয়ে এস। ভাল করেই জানে শুধু কাবাব নয়, পরোটাও নিতে হবে, তা ছাড়া লঙ্কার আচার।'

'সব নিজে করেছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'বিভাদি খুব ভাল রান্না করেন জান?'

এষা তপনকে বলল।

'বাঃ, ওকে না খাওয়ালে ও বিশ্বাস করবে কেন?' বিভা প্লেটে কাবাব আর পরোটা নিয়ে তপন আর এষাকে দিল।

'আমাদের দিচ্ছ, তোমাদের পিকনিকে কম পড়বে না?'

'না। আমি সব সময়ে অনেক বেশি করে নিয়ে যাই। লীলা যা কিপটে ও সব কিছু একটু একটু নিয়ে যাবে জানা কথা।'

বিভা বিরক্ত হয়ে নখ কামড়াতে লাগল।

'কোথায় পিকনিকে যাচ্ছেন?' তপন ভাবল এটুকু জিগ্যেস করা ভদ্রতা। হাজার হলেও চমৎকার কাবাব খাইয়েছেন মহিলা।

'কেন, ব্যাণ্ডেল চার্চ? পিকনিক করবার আর কোনো জায়গা আছে না কি?'

বিভা গলা তুলে হাসল। উচ্ছল, প্রাণখোলা হাসি, গলার উপর সোনার হারটা চিকচিক করে উঠল।

'না, কলকাতার আশে পাশে খুব ভাল জায়গা সত্যিই নেই। বম্বেতে অবশ্য সে-রকম জায়গা অনেক।'

'বম্বেতে তুমি ছিলে না কি ?'

এষাও তাকাল। সে-ও জানে না তপন বম্বেতে ছিল কি না।

'গিয়েছিলাম ! কয়েকমাস খুব বেড়িয়েছিলাম।'

এষার মনে হল বিভা এখনই ঝগড়া শুরু করবে। আজকাল ভয়ানক তর্ক করে বিভা। বিশেষ করে যারা সরল, লাজুক বা অল্পভাষী তাদের সঙ্গে। মানুষকে অযথা আঘাত করে আনন্দ পায়।

কিন্তু বিভা তাকে অবাক করে নরম মৃদু গলায় বলল, 'সত্যি ! কলকাতা শহরটা যে দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে ! ঠিক ঠিকানা নেই। একসময়ে এই কলকাতাই আশ্চর্য সুন্দর ছিল, কাউকে বিশ্বাস অবধি করাতে পারি না।'

এষার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'সত্যিই ছিল, সে কি আমাদের বয়স কম ছিল বলে মনে হত সুন্দর, না, দিস সিটি ট্যু হ্যাড হার চার্মস, তা অবশ্য তর্ক সাপেক্ষ। তপন তুমি কি তর্ক করতে পার ?'

'আপনার মতো প্রতিপক্ষের সঙ্গে তো নয়ই।'

'এষা, তপন আমায় কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে। আমায় কমপ্লিমেন্ট দিও না ভাই, এষা জেলাস হবে।'

'বিভাদি যে কি বল !'

'আমার কয়েকটি বাঙালী ও বাঙালী কোলিগ আছে তারা কলকাতার নিন্দায় পঞ্চমুখ !'

'তাই বুঝি ? কিন্তু কলকাতার চার্ম যদি দেখতে চাও, ইউ মাস্ট সী দ্য সিটি অফ হার গার্ডস।'

'যেমন ?'

'আমি যেমন দেখি, মিডনাইটের কলকাতা···' বলতে বলতে বিভা নিজের মধ্যে থিতিয়ে গেল, ডুবে গেল, তার চোখের দিকে চেয়ে এখন আর তাকে খারাপ লাগল না তপনের।

কিন্তু মাঝরাতের কলকাতা বলতে ইনি কি ক্যাবারে, বার, হইহল্লা বোঝেন? নিষিদ্ধ নাম, নিষিদ্ধ আনন্দ। মাঝে মাঝে শুধু উজ্জ্বল আলোকে সে আনন্দকে হাতছানি দিতে দেখে তপন, তার বন্ধু মলয় আর সোন্ধীর কাছে একটু-আধটু বর্ণনা শোনে মাত্র।

'মাঝরাতে, এষা জানে, মনোহরদাস তড়াগের কাছে একপাল কুকুর বসে থাকে। আমি ওদের রুটি দিতে দিতে ময়দানের দিকে চলে যাই। কখনো কখনো লিণ্ডসে স্ট্রীট ধরে। তখন দেখি রাস্তা নির্জন, কিছু কিছু লোকের পক্ষে তখন সন্ধ্যে হয়তো! কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে কথা বলি না।'

বিভা কি মনে করে স্মিত হাসল।

'আমি কথা বলি মাত্র কয়েকজনের সঙ্গে। জান তপন, একটা বিশেষ লাইটপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে টোনি। কিছুতে ওর নাম বলে না। জান একসময় ওর নিজের রেসের ঘোড়া ছিল, ও ছিল ট্রেনার। ও বলে, মিস, পৃথিবীর বড় বড় লোকেরা যেমন শান্তির পায়রা ওড়ায় আমি তেমনি করেই নোট উড়িয়েছি এক সময়ে। পায়রাদের মতোই তারা উড়ে গেছে, আর ফিরে আসে নি। হি ইজ এ ক্যারেকটার।'

'আপনি একলা যান?'

'ও শিওর। আমার সঙ্গে আর কে যাবে বল? আমার সঙ্গে ওরা পিকনিকে যাবে, তাসখেলায় যাবে, সব করবে, কিন্তু দে উইল নট অ্যাবাইড উইথ মী।'

বিভার চোখে দুঃখ নেমে এল। সে আস্তে আস্তে বলল, 'অ্যাবাইড উইথ মী, ফাস্ট্‌ ফলস্‌ দ্য ইভ্‌ন টাইড! না তপন, এ সব কথা তুমি শুনো না।'

বিভার চোখটি বিপন্ন, সে এষার দিকে কাতর চোখে তাকাল। তাড়াতাড়ি অযথা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে বলল, 'তপন তুমি আর এষা আবার এস, কেমন? ঐ যে লীলা এসে গিয়েছে।'

'বিভা, বী কুইক।'

'এই যে।'

পিকনিকের বাস্কেট হাতে বিভা ছুটে গেল সামনের দিকে। আর কিছু বলে গেল না তাদের। তপন অবাক হয়ে দেখল, এষা একটুও অবাক হল না। ও এই সব অস্বাভাবিক ব্যবহারে অভ্যস্ত, ভাবতেই তপনের অস্বস্তি হল।

'চল, বাড়ি যাই।'

বাড়ি আসবার সময়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এষা বলল, 'বিভাদিকে তোমার অস্বাভাবিক লাগল কি?'

'একটু কিরকম যেন, কিছু মনে কর না।'

'মনে করব কেন?'

এষা কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বলল, 'নিজে কোনো কারণে আঘাত পেলেই একেবারে সব স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলবে এটা আমার একেবারে ভাল লাগে না।'

'তুমি কি তোমার বিভাদির কথা বলছ?'

সে কথার জবাব দিল না এষা। কি ভাবতে ভাবতে আবার বলল, 'অনীদা জানলে ওকে একটুও ভাল বলত না।'

এষার গলায় একটা কঠোরতা ফুটে উঠল। তপন জানত না এষা কঠোর হতে পারে।

'অনীদা কে, এষা?'

তপন দেখল এষার দুচোখে যন্ত্রণা, অসহায়তা।

'চল, তপন, কোথাও গিয়ে বসি।'

॥ ১৫ ॥

সকাল একটু গড়িয়ে গেলে লেকে কম লোকই আসে। তারাই আসে যারা সময় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে। তপন আর এষা চা-এর দোকানগুলোর সামনে শিরীষ গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে বসল।

অনিমেষের কথা বলে গেল এষা।

অনিমেষ আর ইরার কথা। বিভা আর অনিমেষের কথা। নিলীনার কথা, কিছুই বাকি রাখল না বলতে। শুধু কনক আর ইরার কথা বলল না। সঙ্কোচ হল। কনকের কথা বললে হয়তো তপন বুঝবে না।

'তুমি তোমার অনিমেষদা'কে খুব শ্রদ্ধা কর। তাই না এষা?'

এষা ঘাড় নাড়ল।

সব কথা ঠিক বোঝানো যায় না। অনীদা তাকে ভালভাবে বাঁচতে শিখিয়েছিল, যা সত্যি বলে মনে হয় তার জন্যে কষ্ট করতে শিখিয়েছিল। ভালবাসার মানুষের জন্যে ধনসম্পত্তির প্রলোভন ত্যাগ করতে শিখিয়েছিল! নানা কারণেই এষা অনিমেষকে শ্রদ্ধা করে।

'আমারও ভদ্রলোককে দেখতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য, কিছু মনে ক'র না, ··হাসছ কেন?'

'কিছু মনে ক'র না ব'লে তুমি এক একটা রূঢ় সত্য বল। তোমার অভ্যেসগুলোকে চিনতে ভাল লাগছে।'

'কিছু মনে ক'র না। ভদ্রলোককে একটু স্বার্থপরও মনে হচ্ছে।'

'অনীদা স্বার্থপর নয় তপন!'

'এই দেখ না, ওঁর মার মনে উনি অযথা কষ্ট দিয়েছিলেন। তারপর তোমার বিভাদির ওপরও হয়তো সুবিচার করেন নি।'

'অনীদা কি করবে বল ?'

'যাকগে, আমি ওঁদের জানিই না, ওদের ওপর মতামত দিতে গেলাম কেন !'

'অনীদাকে দেখলে তোমার ভাল লাগবে তপন।'

'বেশ তো, এখন বলত, আজকের মতো সুযোগও রোজ পাওয়া যাবে না, এখনই ঠিক করে নাও কবে আমাদের বাড়িতে আসছ ?'

'তোমাদের বাড়ি ?'

'হ্যাঁ। কাকা আর কাকীমা দু'জনেরই ইচ্ছে তোমায় দেখেন। মালাকে তাই বলছিলেন।'

'কেন, মালাকে বললেন কেন ?'

'মালা বোধহয় নালিশ করতে গিয়েছিল ওঁদের কাছে।'

'কি জন্যে ?'

'দাদা এষাদির সঙ্গে বড্ড বেশি মিশছে বলে।'

তপন হাসল, ওর দিকে চোখ ফেরাল। তপনের চোখের চাহনি বড় শান্ত আর সরল।

'আমার সঙ্গে তুমি মিশছ তাতে কি ওঁরা রাগ করবেন ?'

'শুধু শুধু ফাজলামি করবার জন্যে মিশলে রাগ করবেন বই কি।'

'তবে ?'

'বিয়ে করবার জন্যে মিশলে রাগ করবেন না। চাই কি ঘোরাঘুরিটা একটু বাড়িয়ে দিলে হয়তো আমরা যা চাই তা হয়ে যেতে পারে।'

'আমরা কি চাই ?' এষা চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করল।

'বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন। আমিও তাই চাই। চাই বলেই এতখানি এগিয়েছি এষা। আমার মনে হয়েছে তুমি তা জানতে।'

'তপন !' এষা ক্ষীণ স্বরে বলল। হঠাৎ, বিভাদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকালবেলা লেকের ধারে বসে তপন তাকে বিয়ে করতে

চাইবে তা সে ভাবে নি। সত্যি বলতে কি, বিয়ের কথাই সে ভাবে নি। সে-কথা বললে তপন তাকে হয়তো খুব খারাপ মেয়ে ভাববে। আর, বিয়ের কথাটা এখন বেশ 'সম্ভব সম্ভব' বলেই মনে হচ্ছে।

'আমাদের বাড়ির অবস্থা তুমি জান। খুব একটা বড় কিছু নয়, আবার মন্দও নয়। মালার বিয়ের আগে অবশ্য আমি কিছু বলতে চাই না। ওর বিয়ে হয়ে গেলে তবে ওঁদের বলব। তুমি কি বল? ভাল কথা? তোমার সম্মতি আছে তো?'

'চল, বাড়ি চল।'

এষা চোখ নামিয়ে বলল। হঠাৎ তপনকে লজ্জা করছে তার। বিয়ের প্রস্তাবের মধ্যেই একটা ঘনিষ্ঠতার ভাব আছে। অতখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ভাবতে এষার এখনও অসুবিধে হয়।

পথ চলতে চলতে কিছুক্ষণ বাদে এষা বলল, 'আমার বাবা মা কিছুই জানেন না আমরা এভাবে মেলামেশা করছি।'

'জানেন না, জানালেই হবে!'

'না না, আমার টেস্ট্ সামনে। এখন কিছু জানিয়ে কাজ নেই।'

'বাঃ, সামনে টেস্ট্, আর সরস্বতী পুজোর সময়ে না করলে উপোস, না দিলে অঞ্জলি।'

'তুমি বুঝি ওসবে খুব বিশ্বাস কর!'

'নিশ্চয়। তুমি কর না?'

'কে জানে বিশ্বাস করি কি না, স্কুলে থাকতে খুব ভক্তিভরে উপোস করে পুজো দিয়েছি।'

'যাই বল, পুজোটুজো আমার খুব ভাল লাগে।'

'ভালই তো।'

'অন্য কোনো কারণে নয়, ঐ প্রসাদের ব্যাপারটা' ...তপন ছেলেমানুষের মতোই হাসল।

'আমরা পুজোটুজো এত কম দেখছি। ঠাকুমা থাকলে বোধহয় হত। উনি না কি খুব ভক্তিমতী ছিলেন।'

'মালাকে তো জান না, ভাল বিয়ে হবে বলে কাকীমা এখনো কি সব শিব পুজোটুজো করায়। ভাল কথা, মালা তোমার ওপর ভীষণ জেলাস, জান তো?'—

'না।' এষা ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, 'বইটা তুমি এনে দিলে না!'

'দেব। এত বই পড় কেন? অর্থাৎ বাইরের বই পড় কেন!'

'সে কি?'

'পড়বে। টেস্টের পর। ফাইনালের পর।'

কিছুদিন বাদে সত্যি সত্যিই চৌরঙ্গীতে বিভাকে দেখল তপন।

হঠাৎ একটি কোলীগের মৃত্যুতে এদের ডিপার্টমেণ্ট আগে ছুটি হল। চৌরঙ্গী ছেড়ে গড়ের মাঠ দিয়ে হাঁটতে লাগল তপন। আগে আগে এরকম হেঁটেছে সে, বড় ভাল লাগত।

'তপন!'

তপন তাকিয়ে অবাক। বগলে রঙীন ছাতা, হাতে ম্যাগাজিন, পাশে চীনেবাদামের ঠোঙা, বিভা বসে আছে।

'অফিস ফাঁকি দিয়ে ঘুরছ?'

'না না, হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। আপনি কি করছেন?'

'বসে আছি।'

'এমনি?'

'নিশ্চয়। তুমিও বস।'

তপনকে বসবার জায়গা করে দিয়ে বিভা চারিদিকে তাকিয়ে, যদিও কেউ কোথাও নেই তবুও গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'একেবারে একা নই, জানলে? একটা অরফ্যানেজ হোমের ইস্কুলে পড়াই। তার মেয়েদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাতে এনেছি।'

'কোথায়?'

'ওরা দেখতে গিয়েছে অন্য টীচারের সঙ্গে। আমি চুপচাপ বসে আছি।'

'আপনি গেলেন না কেন?'

'নাঃ, ভিক্টোরিয়ায় গেলে বড্ড দাদার কথা মনে হয়। ও আর আমি মাঝে মাঝেই আসতাম।'

তপন কিছু বলল না। কে জানে, হয়তো ওঁর দাদা মারা গেছেন। এ-সব কথা তুললে অপ্রস্তুত হতে হয়, তপন অনেক সময়েই দেখেছে।

এই সেদিন এদের পাঞ্জাবী সহকর্মী সোন্‌ধী যেমন ওকে লজ্জায় ফেলল। মলয়ের সঙ্গে সোন্‌ধী কলকাতার রাতের জীবনে সাঁতার দেয়। সকালবেলা মাথা ধরে থাকে, মেজাজ খারাপ, বেয়ারাদের ওপর চেঁচায়। সবাইকে নাস্তানাবুদ করে।

সেদিনও ঠিক তাই হল। তপনকে কিছুতে ছাড়বে না সোন্‌ধী। চল, কফি খাবে চল, নয়তো হাঁটবে চল পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত। হ্যাং ওভার ইজ কিলিং মী। অতএব এখন আমার সঙ্গে চল।

যেতে যেতে রণধীর সোন্‌ধী জিগ্যেস করতে লাগল তপনের বাড়িতে কে কে আছেন, বাবা কতদিন হল মারা গেছেন। এইসব। অফিসের পরীক্ষায় তপন বসবে কিনা জিগ্যেস করল। বলল, 'অডিটের বইটই আমারও আছে, নিয়ে যেও যদি দরকার হয়।'

বোনের বিয়ের কথা শুনে বলল, 'তুমি তো ভাগ্যবান। আমি চারটে বোনের বিয়ে দিয়েছি জান? এখনো ধার শোধ করছি।'

'বাবা মা নেই তোমার?'

'মা আছেন। দিল্লীতে থাকেন। বাবা নেই। রণধীর ওপরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে হাসল। তারপর মাথার চুল টেনে বলল, 'টেরিব্‌ল!'

'সোন্‌ধী এত ড্রিংক কর কেন?'

'ট্রাজিডী ম্যান, আন্‌ফুলফিল্‌ড লাভ!'

'দিল্লীতে বদলীর অর্ডার ক্যান্সেল করালে কেন ?'

সোন্ধী এ-কথার জবাবে পার্সোনাল-ম্যানেজার নারায়ণ স্বামীর নামে অজস্র গালাগালি দিলে। বললে, 'ও আমাকে বদলী করাতে চাচ্ছে, আমি জানি।'

'দিল্লীতে যাচ্ছ না কেন সোন্ধী ? প্রোমোশানও হবে।'

'ও নো। আমার হার্টস ডার্লিংকে তাহ'লে আর দেখতে পাব না।'

'কাকে ?'

'আমার ক্যাপটিভ লেডীকে। ও ইয়েস, আই নো অল অ্যাবাউট মাইকেল। আলিগড়ে আমি লিটারেচার পড়তাম। উই ওয়্যার এ রোমান্টিক ব্যাচ অফ স্টুডেন্টস্। উই হ্যাড এ রোমান্টিক প্রফেসার। টারবুলেন্ট ডিরোজিয়ানদের সময়কার গপ্‌সপ্‌ করতেন। এই যে এসে গিয়েছি। এস তপন, আমার ডেন-এ এসে কফি খেয়ে যাও।'

হাজার হলেও সোন্ধী তার চেয়ে একটু উঁচুতে আছে অফিসে। অনুরোধ এড়ানো কঠিন। আবার ঠিক দোরগোড়ায় এসে চলে যাওয়াটা অভদ্রতা।

'এসো। নো ফিয়ার।'

সোন্ধী একটি বড় বাড়ির লিফটে ঢুকল তপনকে নিয়ে। ওর ফ্ল্যাট পাঁচতলায়। সিঁড়ির মুখে কয়েকটি বাচ্চা খেলা করছিল, 'আংক্‌ল, আংক্‌ল,' বলে এসে সোন্ধীর হাত ধরে ঝুলতে লাগল, 'বাবল গাম !'

'পরে, পরে, বেরিয়ে নিয়ে আসব। নাউ এ কিস্ ফর আংক্‌ল !' সোন্ধীর সঙ্গে বাচ্চাদের ভাব দেখে তপন অবাক হল। সোন্ধীর ছাঁটা গোঁফ, চোস্তচেহারা, সরু ট্রাউজার, চওড়া কাঁধ আর মোটা মাইনে দেখে তপনের ধারণা সে হচ্ছে সেইসব লোকদের একজন, যারা পথে পথে মেয়েদের লিফ্‌ট দেবার জন্যে সুযোগ খোঁজে। এক কথায় খারাপ লোক।

সোন্ধীর ঘরের ভেতরটায় বিরাট শূন্যতা। মস্ত ঘর। একখানা ঘরের ফ্ল্যাট। জানলায় দাঁড়ালে ময়দান দেখা যায়, চৌরঙ্গীর রাস্তা যা দেখে দেখে যারা কলকাতা ভালবাসে তাদের চোখ ক্লান্ত হয় না।

বিরাট ঘর। ঝকঝক করছে। একদিকে কয়েকটি চেয়ার টেবিল। অন্যদিকে খাটে পরিষ্কার বিছানা পাতা। চৌকির নিচে ট্রাঙ্ক, হোল্ড-অল, স্যুটকেস। একদিকে একটি আলমারি। ঘরের ওদিকে বাথরুম। বাথরুম, রান্নাঘর, প্যান্ট্রি।

'তপন, আমার ফ্ল্যাট দেখ।'

'চমৎকার!'

ঘরের একদিকে কয়েকটি ঘরোয়া ব্যায়ামের সরঞ্জাম, ছোট বুক-শেল্ফে গুটি কয়েক বই। দেওয়ালে একটি মেয়ের ছবি। ফ্যাশান-দুরস্ত অবাঙালী মেয়ে। চেহারাটা চেনা চেনা লাগল। সোন্ধী রাস্তার জামাকাপড় ছেড়ে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে গ্যাসের উনোনে কফি করল, পাঁপর ভাজল। নোন্তা বাদাম বের করল বয়াম থেকে।

'তুমি নিজে করছ?'

'ও ইয়েস। আমি নিজেই আমার সব কাজ করি। কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা, সব।'

'কিন্তু কেন?'

'পয়সা থাকে না তপন। প্রতিটি মাসের শেষে ধার করতে হয়।'

কেন, তাই ভেবে পেল না তপন।

'সোন্ধী, উইথ ইওর স্যালারী…'

'আই হ্যাভ অ্যান এক্সপেন্সিভ সুইট হার্ট। তাকে দিতে হয়। ভাল কথা তপন, তুমি বিয়ে করবে না?'

তপনের মনে হল সোন্ধী বোধহয় কলকাতায় কোনো জাঁহাবাজ মেয়ের খপ্পরে পড়েছে।

'কি তপন, বিয়ে করবে না?'

'দেখি।'

'ভু। নাথিং লাইক ম্যারেড্ লাইফ। বাঙালী মেয়েরা খুব সুইট হয়, আমি জানি। আমার বোনের দেওর বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছে। সী ইজ্ রিয়্যালি সুইট।'

'সোন্ধী, তুমি বিয়ে কর না কেন?'

'হোআট?' সোন্ধী ঠকাস করে কফির পেয়ালা নামাল। তপন সন্ত্রস্ত হয়ে মুখ তুলতেই আবার মেয়েটির ছবির ওপর চোখ পড়ল, চেনাচেনা চেহারা।

'বিয়ে কর না কেন, তাই বলছিলাম!'

'ও!'

সোন্ধীকে হঠাৎ বয়স্ক দেখাল, বুড়িয়ে যাওয়া, উত্তেজনায় ওর হাতটা কাঁপছিল। পেয়ালাটা রেখে ও উঠে গিয়ে কফির সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখতে লাগল। তারপর দূরে, ঘরের অন্য কোণে সিংকে নামিয়ে রাখতে লাগল পেয়ালা প্লেট।

'তপন, আই অ্যাম ম্যারেড।'

দূর থেকে কথাটা ছুঁড়ে দিল সোন্ধী।

'দে আর শী ইজ!'

দেয়ালের ছবির দিকে তাকাল তপন। চেনা চেনা চেহারা।

'প্রীতম। চেহারাটা চেনাচেনা লাগছে না?'

'হ্যাঁ, অথচ বুঝতে পারছি না ঠিক কোথায়...'

'খবরের কাগজে। প্রায়ই দেখ। ডোনেট মোর ব্লাড, ব্লাড-ব্যাঙ্কের অ্যাপীলে।'

'ও, সোন্ধী!'

'দেখ, কাগজটা পড়ে দেখ, না না। দাঁড়াও, আই উইল শো ইউ।'

সোন্ধী একগাদা কাটিং, চিঠিপত্র, গাদা গাদা কাগজের ফাইল নামিয়ে দিল।

'প্রীতম লিউকেমিয়ায় মারা যাচ্ছে তপন। ওর শরীরে হেমোগ্লোবিন আর তৈরি হয় না। রক্ত দিয়ে দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কলকাতায় ক্যানসার ইন্‌স্টিটিউটে ওকে শেষ চেষ্টার জন্যে এনেছি। শেষ চেষ্টা মানে কি, জানি ও আর বড় জোর এক বছর বাঁচবে, আর তা-ও শুধু ব্লাড ট্র্যান্‌সফিউশ্যন-এর ওপর। ব্লাড দেবার ব্যাপারটা কলকাতায় ভাল হয়। সেই জন্যে।'

তপন শুধু বলতে পারল, 'সোন্‌ধী, আমায় ক্ষমা কর।'

'ওর বয়স মাত্র পঁচিশ। সাত বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে তপন। না না, নেহাতই সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে। কিন্তু আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসি তপন, খুব ভালবাসি। ভাবতে পার, আমাদের দুটি বাচ্চা আছে?'

'তারা কোথায়?'

'মেয়েটার পাঁচ বছর, সে আমার মা'র কাছে দিল্লীতে। ছেলেটার তিন বছর, সে আমার বোনের কাছে থাকে ব্যাঙ্গালোরে। প্রীতম হাসপাতালে, আমি এখানে। আমি ওদের খরচ পাঠাই অবশ্য, কিন্তু দে নীড আস্। প্রীতম বলে ওদের একবার নিয়ে এস। আমি বলি তার চেয়ে তুমি ফিরে এলেই নিয়ে আসব। দিস ইজ আওয়ার গেম অফ্ চেস্, দ্য রয়্যাল গেম।'

তপন আস্তে আলোটা জ্বেলে দিল।

'ও জানে ও কোনো দিন সারবে না, আমিও জানি। কিন্তু দেখা হলেই বলি প্রীতম বাড়ি এলে তবে বাচ্চাদের আনব। প্রীতমের জন্যে ওদের মন ভাল নেই, আবার আমরা একসঙ্গে হব। কত জায়গায় ঘুরব। কিন্তু বেরিয়ে এলেই ইট স্ট্র্যাংগ্‌ল্‌স্ মী। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি ড্রিঙ্ক করি, ইট গিভ্‌স মী হ্যাং ওভার।'

'মলয় জানে?'

'ও ইয়েস।'

'তবু তোমার সঙ্গে যায়?'

'মলয় তোমার মতো সফ্‌ট নয়। হী ইজ টাফ্‌। দ্যাট ইজ গুড। আই হেট সীমপ্যাথি তপন। ওনলি ট্রাই ডে, রোজ রোজ তোমার কম্প্যানি আমার ভাল লাগবে না।'

তপন কিছু মনে করল না।

'মলয় ড্রিঙ্ক করতে ভালবাসে, নট অ্যাট হিজ কস্ট্। বেশ তো! আমারও একলা একলা ড্রিঙ্ক করতে ভাল লাগে না, তাই ওকে সঙ্গে নিই।'

'বেশি ড্রিঙ্ক ক'র না।'

'বেশি ড্রিঙ্ক করব? আর ইউ ম্যাড তপন? প্রীতম হেট্‌স ইট। তা ছাড়া, অ্যাট মাই স্যালারি মেয়েকে ছেলেকে টাকা পাঠিয়ে, হস্‌পিটালে ব্লাডের জন্যে টাকা দিয়ে, ঈচ্‌ ট্রান্‌সফিউশান্‌ কস্টস এ লট, বেশি ড্রিঙ্ক করবার পয়সা কোথায়? একটা চাকর রাখতে পারি না দেখছ!'

'উনি আর সারবেন না সোন্‌ধী?'

'নো মাই বয়। এর কিওর নেই। কাগজগুলো দেখলেই বুঝবে দিল্লী, মাদ্রাজ আর বম্বের সবগুলো হাসপাতাল ঘুরে তবে এখানে এসেছি। গত দু'বছরে আমি বুড়ো হয়ে গেলাম তপন! অথচ বয়স আমার মাত্র পঁয়ত্রিশ!'

তারপর, কি যেন ভেবে সোন্‌ধী বলল, 'প্রীতমের কথাটা কাউকে বল না যেন!'

'না না।'

প্রীতম সোন্‌ধীর ছবির দিকে চোখ পড়ল তপনের। ডোনেট মোর ব্লাড। আপনার রক্ত পেলে একটি প্রাণ···

'সোন্‌ধী, আমি ব্লাড দিই যদি?'

'নাউ তপন, ডোণ্ট বী সেন্টিমেন্টাল।'

সোন্‌ধী ওর কাঁধে হাত রাখল। ধীরে সুন্দর গলায় বলল, 'রক্ত দেওয়া ভাল। কিন্তু প্রীতমের কথা ভেবে দিও না। প্রীতম তো

বাঁচবে না তপন। যারা বাঁচবে তাদের জন্যে রক্ত দিও। প্রীতমের জন্যে কিছু করবার নেই।'

মুহ্যমান, বিমূঢ় তপন বেরিয়ে এল।

তারপর থেকে অফিসে সোন্‌ধীকে ও একই রকম দেখেছে। মাঝে মাঝেই সন্ধ্যার কলকাতার স্বাদ নেওয়া। তার পরদিন বাঘের মতো মেজাজ, চোখ লাল লাল, হলুদ ছাপা সিল্কের শার্ট পরা বিরক্ত চেহারা। কিন্তু তপন জানে ক্যালেণ্ডারের একটি পাতা উলটোন, টেবিলে একটি 'ডেট কার্ড' বদলে রাখা মানেই হল সোন্‌ধীকে একটু একটু করে হতাশার অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া। ক্যালেণ্ডারের পাতা ছেঁড়া মানে প্রীতম সোন্‌ধীর জীবন থেকে একটু আয়ু ছিঁড়ে নেওয়া, কোনো কোনো সমস্যা এমনই হয়, যে তার আর সমাধান নেই।

অফিসের ছুটির দিন, ময়দানে বিভার পাশে বসে ওর হঠাৎ সোন্‌ধীর কথাই মনে পড়ল।

'কি ভাবছ বল তো তপন?'

তপন সংক্ষেপে সোন্‌ধীর কথা বলল।

বিভা খুব দুঃখিত হল।

'তোমার মনটা তো খুব নরম, তপন!'

'কেন?'

'না, সত্যি আমার খুব ভাল লাগল। এরা খুব লাকি।'

তপন লজ্জা পেল, বিব্রতও হল। এই সেদিন মাত্র আলাপ হল, আজই মহিলার পাশে বসে এযাকে নিয়ে আলোচনা করছে।

আমারও আলাপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমাদের একটা অর্গানাইজেশান আছে, তার পক্ষ থেকে আমরা...'

'না না, সে কি বলছেন?'

'কি আবার বললাম?'

'না না, এটা ওর নিজের ব্যাপার। এতে কিছু করতে যাওয়া

উচিত হবে না। তা ছাড়া, এমন যদি হত, যে এর মধ্যে গিয়ে কেউ কোনো সাহায্য করতে পারবে, তা যখন পারবে না···'

'তুমি ঠিকই বলেছ তপন।'

বিভা নিশ্বাস ফেলল। তপন দেখল আজকে আর ওকে তেমন উগ্র দেখাচ্ছে না। অথবা, খানিকটা পরিচয় হয়েছে বলে তপন ওর মুখের কোমল রেখাগুলিকে আবিষ্কার করতে পারছে। বিভার গলার গড়নটি বড় সুন্দর। শাঁখের মতো নরম, তেমনিই সুমসৃণ।

'তোমরা বিয়ে করছ কবে, তপন? বিয়ে করছ তো?'

'দেখি···ইয়ে, আমি আজকে চলি।'

তপন বিব্রত হয়ে উঠে পড়ল।

'এষা অপেক্ষা করছে?'

'না না, আমি একটু এক বন্ধুর বাড়ি যাব···'

তপন যেন পালিয়ে বাঁচল।

তপনকে ঠাট্টা করল বটে বিভা, কিন্তু এষাকে ক'দিন বাদে সে চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল। বলল, 'বাড়িতে মা'র গুরুদেব আসবেন মাসিমা, ওকে নিয়ে গেলে আমার একটু সাহায্য হবে। খাবার-দাবার তৈরি, ঘরদোর গোছানো, কাজ কি কম?'

'তোমার মা'র গুরুদেব আছেন না কি?'

ছবি কোনোদিনই ভাবেন নি বিভা, অনিমেষ, এদের একেকজনের বাড়িতে আবার গুরুদেব থাকতে পারেন।

'হ্যাঁ মাসিমা।' বিভা মিষ্টি হাসল।

'কি নাম তাঁর?'

বিভা নাম বলল।

'বেশ ভাল তো?'

'কে জানে মাসিমা। মা'র যেমন, গুরুটুরু আজকাল কেউ মানে না কি?'

'মানতে তো কাউকে কম দেখি না। আর তোমার মা'র দোষ কি বল বিভা? তুমি বিয়ে করলে না, তোমার দাদা বিলেতে গিয়ে বসে রইল, সে বেচারা কি নিয়ে থাকে বল?'

'সে তো বটেই।'

বিভা আর কথা বাড়াল না। ছবিকে বলল, 'আপনি যাবেন কিন্তু মাসিমা। কাল সন্ধ্যেবেলা গিয়ে বসবেন, কথাটথা শুনবেন, প্রসাদ পাবেন।'

এষা গিয়ে দেখল গুরুদেব আসছেন ঠিকই। সেই সঙ্গে আর-ও একটি ঘটনা ঘনিয়ে উঠেছে বিভাদের বাড়িতে। ওদের যে বোন সবচেয়ে বড় ছিলেন, অনেকদিন আগে, বিয়ের কয়েক বছর বাদে একটি ছেলে রেখে তিনি মারা যান, আজ এতদিন বাদে বিভার মা বাবা তাঁকেই স্মরণ করেছেন।

ঠিক তাঁকে নয়, তাঁর ছেলেকে। তাঁদের দৌহিত্রকে। দৌহিত্র হিসেবে সে অনেকবারই এসেছে আর গিয়েছে। এবার তাকে আনা হচ্ছে সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসেবে। এর আগে তার বাবা এখানে তাকে বেশিদিন থাকতে দিতেন না। কনক বা বিভার সংস্পর্শ ছেলের পক্ষে শুভ বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

॥ ১৬ ॥

এবার ছেলেকে আসতে দিচ্ছেন তার একটা কারণ বিভার বাবা, তাঁর শ্বশুর মিনতি করে চিঠি লিখেছেন। বিভার বাবা-মা চান, গুরুদেব ওকে দেখে বলুন ওকে সম্পত্তি দিলে শুভ হবে। তাঁদের জামাই চান এই সুযোগে ছেলের কোষ্ঠীটা যদি মোহনদাস স্বামীকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়। ভদ্রলোকের কোষ্ঠী-ঠিকুজী তৈরি করবার ক্ষমতা আছে। আগে তিনি তাই-ই করতেন।

বিভাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে। সে বলল, 'এষা, তুমি, আমার সঙ্গে এস।'

বিভার কোমরে তোয়ালে, কপালে ঘাম। এষাকে সে নিয়ে গেল হল-ঘরে, যেখানে টেবিলে রাশি রাশি কাচের বাসন জড়ো করা। এষা ফর্দ মেলাতে লাগল।

'এষা, তপনকে তুমি বিয়ে করছ না কি ?'

'এখনো ভাবি নি বিভাদি।'

'তুমি না ভাবলেও ও ভাববে। ওর দোষ নেই এষা। ও তা ছাড়া আর কিছু জানে না।'

'বিভাদি, এখন ওসব কথা থাক।'

বিভা তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

বিভাদের বাড়ি থেকেই ছবি বোধ হয় এষা আর তপন সম্পর্কে কয়েকটা কথা শুনে এসেছিলেন।

এষা যাই ভাবুক সতীশ আর ছবি তার আর তপনের মেলামেশা আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন।

'যেদিন থেকে অনী এ-বাড়িতে পা দিল, সেদিন থেকেই এষা আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে,' ছবি মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন।

'একথা কেন বলছ ছবি ?'

'বড় দুঃখে বলি! আগে তুমি যা বলতে তাই মন্ত্র জেনে বিশ্বাস করত। পরে অনী এল, তখন থেকে অনীর কথা শুনত। সেই যে, যে-বার আমি হাসপাতালে গেলাম, সেবারই এসে দেখলাম ও বড্ড বেশি বদলে গিয়েছে।'

কথা বলতে বলতে ছবি জানালা দিয়ে পানের পিক ফেললেন। সতীশ দেখলেন ছবির মুখের চামড়া এখনো পাতলা, স্বচ্ছ, চেহারায় ছোট মেয়ের মতো সুকুমার ভাব আজও রয়ে গিয়েছে। দেখে তাঁর মায়া হল। তিনি জানেন, দেখতে পান, কি তাড়াতাড়ি সাধারণের

চেয়েও সাধারণ হয়ে যাচ্ছে ছবির চেহারা। যে-কোনো মধ্যবয়সী মহিলার মতো, দেখলে সতীশের দুঃখ হয়।

কেননা ঐ চেহারা এবং স্বভাবের চঞ্চলতা, ফূর্ত প্রাণোচ্ছলতাই ছবির প্রধান সম্পদ ছিল। আর সব দিকেই তো তিনি অন্য গ্রহের মানুষ ছিলেন। সতীশ ছোটবেলা থেকে কি শান্ত, সুন্দর, বুদ্ধিমান, সংযত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ছবি ছিলেন অন্য রকম। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আসন্তি যাওন্তি মানুষ. বহু জনের বিয়ে, পৈতে আনন্দ, দুঃখ, বিশৃঙ্খল সংসার, ছেলেমেয়েকেও যা খুশি তাই করতে দেওয়া, এই সব নিয়ে ছবি প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রবল ছিলেন।

তাই সতীশ বিনা প্রতিবাদে নিজের জীবন বিপর্যস্ত হতে দিলেন, মন ভেঙে গেল, অকালে বুড়িয়ে গেলেন। তবু, তবু তো ছবির মধ্যে প্রাণের উৎসব ছিল, দেখেও তো আরাম পেতেন সতীশ।

অনিমেষ এ-বাড়িতে আসবার পর সব পালটে গেল। আপনা থেকেই বাইরের হুটোপাটি আনাগোনা কমে গেল অনেক। সতীশের মেয়ে এষা সংসার তুলে নিল হাতে। খানিকটা অসুস্থতার জন্যে, খানিকটা উদ্যম কমে যাওয়ায় ছবিও গুটিয়ে ফেললেন নিজেকে।

এখন সতীশ দেখতে পান ছবির মধ্যে অসন্তোষ, হাতে তাস, গালে পান, তাঁর হঠাৎ দুঃখ হল। এর চেয়ে সে নিরন্তর ভুল বোঝা বুঝি হয়তো ভাল ছিল। স্বামীর সঙ্গে মন বা মতের কোন মিল ছিল না ছবির, আর সেই জন্যেই বোধহয় দু'জন দু'জনকে ভীষণ আকর্ষণ করতেন। সতীশের মনে হল তাঁর নিজেরও দোষ আছে। হাজার হলেও ছবি যখন এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্রই ষোল সতেরো। সতীশ মনোযোগী হলে তাঁকে গড়ে নিতে পারতেন যদিও অনী বলত, মানুষ মানুষকে গড়ে তুলবার চেষ্টা বৃথা 'মানুষের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত নিজেকে এবং অপরকে ক্রমশ পারফেক্ট করা।'

'অর্থাৎ গড়তে থাকা।'

'হ্যাঁ।'

'তুমিই তো বলছ…'

'করা উচিত তাই বলেছি। রেজাল্ট হবে এ-কথা বলি নি।'

বলে অনিমেষ হাসত। সতীশের শুধু মনে হত চারদিকে এত পারফেকশ্যন খোঁজা বোধহয় উচিত নয়। খুঁজতে খুঁজতে ছেলেটা আরো দুঃখ পাবে।

এতদিন পরেও তাঁর অনিমেষ আর ইরার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। ছবির মুখে তপন আর এষার কথা শুনেও তাদের কথা মনে হল।

'তপন এষার খুব ভাব হয়েছে। ওদের বিয়ে হলে মন্দ হয় না।'

'তপনের সঙ্গে এষার বিয়ে!' সতীশের মনে হল ওদের মোটেই মিল হবে না। কিন্তু জীবনে কোনো কথাই জোর জানিয়ে বলতে পারেন নি। অসহায়ের মতো চুপ করে থেকেছেন, এখনো কিছু বলতে পারলেন না।

'হ্যাঁ। আকাশ থেকে পড়লে যে! তপন তো দিব্যি ছেলে। এষার ভাগ্যি যে অমন ছেলে ওকে পছন্দ করেছে।'

'পছন্দ করেছে?'

সতীশ স্ত্রী-র কথা শুনে ভয়ানক অবাক হয়ে গেলেন। এষাকে নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেন। এষা-ও কি আসলে মনে মনে কোনগতিকে বিয়ে হয়ে গেলে ধন্য হবে?

'হ্যাগো! আর আমি তপনের মা কাকীমার কথার আঁচে বুঝেছি তোমার খুব একটা খরচ হবে না।'

তারপর গলাটা অনাবশ্যক নামিয়ে বললেন, 'তপনের মা তো বলেন বিয়ে হবার হলে তাড়াতাড়িই ভাল। নইলে কোথায় কি গণ্ডগোল ঘটে বসে কে জানে।'

সতীশের ভয়ানক অস্বস্তি হল। তপনের মা কাকীমা বলতে ছবির ঘরে বসে-থাকা পুষ্ট দেহ। হাসির লেশহীন গম্ভীর মুখ, সবকিছু

বাজিয়ে নেওয়ার মতো চোখের দৃষ্টি, এইরকম কতকগুলো বিচ্ছিন্ন জিনিস মনে পড়ছে। কি অস্বস্তি! এষাটা কী করতে যাচ্ছে? লেখাপড়া শেখ্, কেরিয়ার কর্ সামনে জীবন পড়ে আছে, এরই মধ্যে নতুন তাঁতের শাড়ি পরে তপনের মা-কে 'ক চামচে চিনি দেব?' জিগ্যেস না করলে চলছে না?

'এখন ওদের বিয়ের কথা উঠল কেন?'

'তপন প্রোমোশন পেল বলে, ওর মা ওর বিয়ে তাড়াতাড়ি দিতে চান সেটাও একটা কারণ।'

'এষাকে জিগ্যেস করেছ কিছু?'

'জিগ্যেস আবার কি করব?'

'ও কি বলে? ও কি এখনই বিয়ে করতে চায়?'

'নইলে কি আর···?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, এষা ছেলেটির সঙ্গে খানিকটা মিশেছে, আমরা ওকে কোনোদিন কারো সঙ্গে মিশতে বারণ করি নি, হয়তো সেই জন্যেই মিশেছে।'

'শুধু মেশে নি, একসঙ্গে বেড়িয়েছে, এখানে ওখানে গিয়েছে।'

'গেলেই বা! শুধু সেইজন্যেই ওকে বিয়ে করতে হবে?'

'ওর ইচ্ছে আছে। না থাকলে কি আর বিয়ের কথা বলছি?'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

'কার সঙ্গে?'

'এষার সঙ্গে।'

'কি বলবে?'

'যা হয় বলব।'

'জানি আমার কথা তুমি বিশ্বাস করলে না। জানি আমার নামে গুচ্ছের কথা বলবে।' ছবি রীতিমতো ফোঁসফোঁস করতে লাগলেন।

'তোমার নামে কথা বলব?'

সতীশের মনে হল তিনি ভুল শুনেছেন।

'নিশ্চয় বলবে। ঐ সব বলেই তো এষা আমাকে একেবারে বিশ্বাস করে না।'

'আঃ!'

সতীশ হঠাৎ জোরে ধমক দিলেন, তারপর নিচে নেমে গেলেন এষাকে ডাকতে ডাকতে।

'আমাকে ডাকছ?'

এষা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল। অনিমেষের ঘরে টেবিলটা গোছাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই সে আসে আলো জ্বেলে কাজকর্ম করে। এখন তাকে লম্বা দেখাল, সুকুমার। চোখের দৃষ্টি অচেনা।

সাধারণত সতীশ বড় সংকোচ অনুভব করেন, মেয়ের সঙ্গে সহজে কথা বলতে পারেন না। কিন্তু এখন তিনি বড় বিব্রত। এষাকে একলা মনে হচ্ছে, ওকে সাহায্য করবার কেউ নেই তাই তিনি এখন কথা বলতে এসেছেন, কিন্তু এষা কি তা বুঝবে, না তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হবে?

'তোর মা বলছেন, তুই কি ঐ তপন ছেলেটিকে বিয়ে করতে চাস?'

এষা লাল হয়ে গেল। তারপর, একটু চেষ্টা করে সহজ হয়ে বলল, 'হঠাৎ এ কথা কেন বাবা?'

'ওর বাড়ির লোকেরা হয়তো তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চান।'

'আমাকে কি এখনই কিছু বলতে হবে বাবা?'

'তুই ওকে বিয়ে করতে চাস কি না, সে-কথা আর কে বলে দেবে খুকী?'

এষা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তপন খুব ভাল ছেলে বাবা, আমি ওকে পছন্দই করি কিন্তু বিয়ের কথা আমি ভাবতে পারছি না, অন্তত এখনই নয়।'

সতীশ অসহায়ের মতো চেয়ে রইলেন। চলে যাচ্ছে, আবার সাহস চলে যাচ্ছে, কিন্তু এষা তাঁরই মেয়ে, ও জানে না পৃথিবীতে

মাঝে মাঝে মানুষ কি অসহায়। মাঝে মাঝে সে জন্যে কি বিপদে পড়তে হয়। বলতে ইচ্ছে হল খুকী, তোর শেষ বোনটা হোক এ আমি চাই নি। তোর মা'র শরীর ভেঙে যাক, আমার ইচ্ছাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে উনি ওঁর সেই দাদা-বউদির সঙ্গে ফিটন চড়ে বেড়াতে যান আর ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে ওঁকে উলটে ফেলে দিক এ আমি চাই নি। হাসপাতালে তোর মা জ্ঞান হতেই আমাকে বলেছিলেন সরে যাও! সে কথা আমি আজও ভুলি নি।

আজ তাঁর সব কথা এষাকে বলতে ইচ্ছা হল, কিন্তু কেমন করে বলবেন? এসব কথা কি মেয়েকে কেউ বলতে পারে? তাঁর যে কেউ নেই, পৃথিবীতে এমন কাউকে মাঝে মাঝে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব কথা বলা যায়, সব লজ্জা, অপমান, গ্লানির কথা।

'শোন খুকী', সতীশ বললেন, 'আলাপ অনেক রকম হতে পারে। হয়তো, হয়তো তোর ওকে ভাল লাগে অথচ বিয়ে করবার মতো ভাল লাগে না। তা যদি হয় আমার কাছে বল্। তা যদি না হয় তা-ও বল্। আমাকে সাহায্য করতে দে!'

নিজের ওপর রাগ হল। করুণা চাইছেন না কি, অ্যাঁ? এষাকে দেখে এদিকে বুক হুহু করছে, ওর বয়স কত কম, সামনে কত বড় জীবন পড়ে আছে, যখন মানুষ বয়সে নবীন থাকে তখন বোঝে না কি ঐশ্বর্য তার হাতের মুঠোয়। অথচ, বয়স যাদের কম, তারা বোধহয় ভয়ানক দুঃখ থেকে নিজেদের বাঁচাতেও পারে না। অনিমেষ পারে নি, ইরাও পারে নি, কনককে নির্বাসনে চলে যেতে হল, বিভার মুখের হাসিও মুছে গিয়েছে সতীশ জানেন। কিন্তু এখন তাঁর ওদের সবাইকে হিংসে হচ্ছে, নিজের মেয়েকেও। দুঃখ ওদের হয়তো মেরেও ফেলতে পারে, কিন্তু মরলেও ওরা জিতে যাবে। তিনি বেঁচে থাকবেন, তাঁরা বেঁচে থাকবেন, তাঁরা, যাঁরা চিরদিনের মতো প্রৌঢ় হয়ে গেছেন, মরে গেছেন।

এষা তাকে দেখতে লাগল। গভীর, গভীর তার চোখ। সতীশ ভয় পাচ্ছেন, কেন না জীবনে তিনি কোনো সমস্যারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখেন নি। ভয় পাচ্ছেন, যদি এষা হঠাৎ জিগ্যেস ক'রে বসে সুখী হবার উপাদান তোমরাও পেয়েছিলে, তা দিয়ে কিছু কর নি কেন বাবা?

যদি জিগ্যেস করে ছোটবেলা আমরা অন্ধকার ঘরে শুয়ে ভয় পেলেও ঘরে একটা আলো জ্বেলে রেখে দিতে না কেন বাবা? মা অনেক, অনেক অক্ষম জেনেও কেন মা'র হাতেই আমাদের ফেলে রাখতে, কেন বাবা? যদি বলে কেন বলে দাও নি বড় হওয়ার নাম দুঃখ পাওয়া?

সতীশের দুই চোখে প্রত্যাশা। তিনি জানেন তাঁর যথাসাধ্য তিনি এষাদের জন্য করেন নি, তাই এখন ইচ্ছে করে এষা তাঁকে অভিযোগ জানাক, দোষী করুক।

কিন্তু না, সতীশের মনে, চোখে, চাহনিতে যে কথা ঘন হয়ে উঠেছে তার এতটুকু তিনি জানতে পারলেন কই, এ ওকে এত কম বোঝে আজকাল। এষা মাত্র এইটুকু বুঝল বাবা তাকে কিছু বলতে চাইছেন, কি জানতে চাইছেন, সে জিগ্যেস করল, 'অনীদার কোনো খবর পাও বাবা?'

অনিমেষ! এষা অনিমেষের কথা জানতে চাইল। তিনি ওকে ওর বিয়ের কথা জিগ্যেস করছিলেন, এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন বলেই কি এষা আজ অনীর কথা জিগ্যেস করল? না কি অন্য সময়েও তার যথেষ্টই মনে হয়, তবু জিগ্যেস করতে পারে না?

'না খুকী,' সতীশের গলায় এখনো উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, বড্ড দরকার এখন সব কথা জেনে ফেলা। যদি অনিমেষের জন্যেই দুঃখ হয় তবে তাই বলুক এষা। কচিৎ এমন সময় আসে যখন মাঝখানের আড়াল সরে যায়, সব কথা বলতে ইচ্ছে করে, শুনতে ইচ্ছে করে, এখনো সে সময় আছে।

'আমার অনীদায়, ইরাদির জন্যে কষ্ট হয় বাবা, অনীদার কথা মনে হয়'. এষা বলল, চোখ তুলে তাকাল।

সতীশের ইচ্ছে হল বলেন সব ঠিক আছে। কিন্তু কি ঠিক আছে? ইরা অনিমেষের স্ত্রী। অনিমেষ তাঁর বন্ধুর ছেলে মাত্র, কিন্তু এষা আজ তার কথা মনে করেই কষ্ট পাচ্ছে।

'তুই ওপরে যা খুকী', সতীশ শূন্যদৃষ্টিতে, শূন্য গলায় বললেন 'এ দরজাটা বন্ধ ক'রে দে।'

বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ভাল ক'রে পড়াশোনা কর্। আমার শরীর খুব ভাল নয়, পড়াশোনা ক'রে রাখা ভাল।'

শেষের কথাগুলো আস্তে আস্তে বললেন। প্রয়োজনীয় কথা, দায়িত্বের কথা, অমনি আস্তে, নিচু গলায় কোনোগতিকে বলে ফেলে সরে পড়া তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

পরদিন এষা একটু বিভ্রান্ত হয়েই বিভার কাছে গেল। তার আগে ছবি তাকে অনেক অনেক কটুকথা বললেন। এষা যে তাঁকে ভালবাসে না তা নিয়ে অনুযোগ জানালেন। 'তুই আমায় বিশ্বাস করিস না,' ক্রোধে ছবি কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, 'তোর বাবার জন্য এই অবস্থা আমার।'

বিভা মিশনের ছেলেমেয়েদের জন্যে জামাকাপড় প্যাক করছিল, এষার কথা শুনে সে ব্যস্ত হয়ে উঠে এল।

'চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি,' বিভা বারান্দায় বেরিয়ে এল।

'মা রাগ করেছেন সে জন্যে ভাবছ কেন?'

'ভাবব না!' এষার কান্না পাচ্ছিল।

'না।, মা আর মেয়ে, বাবা আর ছেলে, দুজনে দুজনকে গ্রাস করতে চায়। অনীও তার বাবার ইমেজ হতে ভয় পেয়েছিল এষা।'

'অনীদা থাকলে খুব ভাল হত।'

'কেন, সে তোমায় সাহায্য করত?'

'হয়তো করত।'

'ও নো। অনীর আসল সমস্যাটা আমি ধরে ফেলেছি এষা। ওর বাবার বিরুদ্ধে ওর সংগ্রাম, ওর মা-কেও ও বাবার দলে বলে মনে করত। অথচ এখন বুঝতে পারি নিলীনা মাসিও মেসোমশায়কে মনে মনে দোষ দিতেন। ওঁর স্বভাব অন্য রকম তাই ঝগড়াঝাঁটি ক'রে কোনো অশান্তি করেন নি।'

'অনীদাকে উনি দুঃখ দিয়েছিলেন।'

'এষা, অনীকে অথবা যে ছেলেদের আমরা ভালবাসতে চাই তাদের কখনো মার্টার ক'রে তুল না। অনীকে নিলীনা মাসি ভালবাসতেন না, ওর বাবা ভালবাসতেন না, হোয়াই, অনী ওঁদের কম দুঃখ দেয় নি।'

বিভা একটু চিন্তিত হয়ে বলল, 'ইরাকেও কম দুঃখ দেবে না। অনী বলে ও সবাইকে সুখী দেখতে চায়, কিন্তু হ্যাপিনেসকে ও ফাইট করে, ভীষণ বাধা দেয়, জেনে রেখ।'

'কিন্তু আমি কি করব বিভাদি?'

'তুমি তপনকে ভালবাস?'

'বাসি।'

'ওকে বিয়ে করতে চাও?'

এষা নিরুত্তর।

'ও হয়তো তোমায় বিয়ে করতে চায়।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ওর সঙ্গে কথা বল না কেন?'

'যদি, যদি ও আমায় ভুল বোঝে?'

'বুঝলে বুঝবে। ফেস দ্য পসিবিলিটি।'

'যদি রাগ করে।'

'বোকার মতো ক'র না এষা। তপন খুব ভাল ছেলে। এই তো সেদিনই বলছিল তোমাকে ও কি ভালবাসে।'

'তোমার কাছে এসেছিল বুঝি?'

'প্রায়ই আসে।'

'বেশ, আমি তপনের সঙ্গেই কথা বলব।'

তপন কিন্তু এবার প্রত্যেকটি কথা খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এষা, আমি যখন তোমার সঙ্গে মেলামেশা করি তখন থেকেই আমার মন তৈরি। মনে হচ্ছে তুমি এখনো প্রস্তুত হতে পার নি। বেশ তো, তুমি সময় নাও না।'

'তোমার বাড়িতে ওঁরা অপেক্ষা করবেন কেন?'

'ওঁদের সমস্যা নয়, সমস্যাটা আমার। আমি বললেই অপেক্ষা করবেন।'

'আমাকে কি তোমার খুব খারাপ লাগছে তপন?'

'না এষা,' তপন মুখ ফিরিয়ে তাকাল। শান্ত তার গলা, চাহনি বিষণ্ণ, 'তবে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে হয়তো অনেক সময় পেলেও তুমি কোনদিনই মন স্থির করতে পারবে না।'

'এ কথা বলছ কেন?'

'কোথায় যেন তোমার মনটা বন্দী হয়ে আছে, সেখান থেকে মুক্তি না পেলে তুমি কোনদিন মন স্থির করতে পারবে না। আমার সম্পর্কে না, কারো সম্পর্কেই না।'

'তপন এ তুমি কি বলছ?'

'আমি খুব সাধারণ ছেলে এষা, সোজা কথা বুঝি, সোজা ক'রে নিই সব সমস্যা। আমার মনে হয় তুমি কি করবে না করবে তা তোমার হাতে নেই।'

'কার হাতে আছে?'

'তোমার মনকে জিগ্যেস কর।'

'আমার মনকে!'

'হ্যাঁ। তুমি যাঁকে অনীদা বল তিনি তোমার ওপর যে-কোনো কারণেই হোক একটা ইম্‌প্রেশ্যন ফেলেছেন, সেইজন্যই তোমার এই ইতস্তত।'

এবার মনে হল সে শুনতে ভুল করেছে।

'তুমি ভুল করছ তপন। কিংবা, কিংবা হয়তো বিভাদি তোমায় এমন একটা কিছু বলেছে যা থেকে তোমার মনে হয়েছে…'

'বিভাদি! তোমার বিভাদি কোনো কথাই বলেন নি।'

'তবে?'

'আমি যে তোমায় ভালবাসি এষা!'

তপন লেকের জলে ছোট একটা ঢিল ফেলল। তারপর আস্তে বলল, 'রাগ ক'র না। আমি তোমায় ভালবাসি তাই সহজেই ধরতে পারলাম কথাটা। তোমার অনীদা অনেক দূরে আছেন, আমি কাছে, তবু তোমার কাছে দূরের অনীদা কাছের আমি-র চেয়ে অনেক, অনেক বেশি সত্যি।'

'তপন, তুমি ভুল করছ…'

'না। কেননা তোমাদের সম্পর্ক বাস্তবে খুব একটা ঘনিষ্ঠ নয় তা আমি জানি, ঘনিষ্ঠ হলেও বা তাতে আমার কি এসে যায়, তোমার মধ্যে কোনো নোংরামি তো থাকতে পারে না।'

প্রতিটি কথা নতুন, এবং অসম্ভব সব কল্পনার দরজা খুলে দিচ্ছে।

প্রতিটি কথা জাদুকরা, কেননা ডাইনীর জাদুভাণ্ডার দেখিয়ে দিচ্ছে। ঘনিষ্ঠতা…নোংরামি…কোন অন্তরঙ্গতার কথা বলতে চায় তপন? অনীদা, অনিমেষ সম্পর্কে?

'তপন, তুমি ভীষণ ভুল করছ।'

'আরে! এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?'

'তুমি ইরাদি আর অনিমেষদার কথা জান না?'

'জানি। ওঁদের ভালবাসা সম্পর্কে তো আমার কোনো সংশয় নেই।'

এবার চোখে জল এসে গিয়েছিল। 'চোখ মোছ,' তপন রুমাল এগিয়ে দিল।

'শোন এষা, কতকগুলো সাদাসিধে কথা শোন, শুনবে?'

'বল।'

অন্যদিকে চেয়ে তপন আস্তে আস্তে বলে গেল, 'আমি আগে থেকেই জানতাম তোমার আর আমার পরিবারের কোথাও মিল নেই। আমরা অতি সাধারণ, অতি স্বাভাবিক, মিতব্যয়ী, গুছিয়ে চলি, খুব একটা কল্পনা বিলাসিতা আমাদের মধ্যে নেই। তোমাদের দেখে তবে বুঝলাম অন্যরকম হতে হলে সব সময়ে খুব টাকা পয়সার দরকার করে না।'

এষা বিস্মিত।

'টাকাপয়সা থাকলে তবেই মানুষ খানিকটা অন্যরকম হতে পারে বলে জানতাম। তোমার বাবাকে দেখলাম, তোমাদের দেখলাম, হঠাৎ মনে হল তোমাদের মতো এমন একটি পরিবার আর দেখিনি। জগৎসংসার কোনদিকে চলেছে তার কোনো খবরই না রেখে নিজেদের নিয়ে দিব্যি আছ। তোমার চোখেমুখে একটা আশ্চর্য ইনোসেন্স আছে, আর একটা অসহায় ভাব, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম তোমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

'কেন?'

॥ ১৭ ॥

তপন বলল, 'কেননা তোমার বাবা খুব ভাল লোক, কিন্তু দায়িত্ব নিতে জানেন না। তোমার ভাইবোনেরা পড়াশোনা করছে, এটাই খুব ভাল বলতে হবে, কেননা না করলেও তাদের কেউ কিছু বলত না। তোমাকে ওঁরা দেখে শুনে বিয়ে দেবেন, অথবা কেরিয়ার ক'রে দেবেন এটা আশা করা উচিত নয়, কেননা, তোমার বাবা দেবতুল্য মানুষ, কিন্তু কেমন যেন পা ছাড়া, গা ভাসিয়ে দেওয়া, তাই না?'

হয়তো তাই-ই হবে। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা বুঝতে পারে বেশি। কাছ থেকে দেখলে সবসময়ে বোঝা যায় না কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। অথবা, সবচেয়ে বেশি সত্যি হল নাড়ির বন্ধনে। মানুষ অতি আপন-জনের ঠিক বিচার করতে পারে না, হয় নিজেকে মোহান্ধ ভেবে মোহের জট ছাড়াতে গিয়ে অধিক রূঢ় হয়ে পড়ে, নয় তো চোখ থেকে মোহের আবেশ আর কাটে না।

কিন্তু এষার বলতে ইচ্ছে হল তুমি ভাবছ তুমি যা ভাবছ সেটাই ঠিক। তুমি জান না এ-ও এক ধরনের দুর্বলতা। মানুষ হয়ে মানুষের হিসেব কষতে বসলেই নিজের আঁককে নির্ভুল মনে করাটা দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ, নির্ভুল আঁক কষতে ক'জন জানে, ক'জন বা পারে! তা ছাড়া এত নির্ভুল অঙ্ক-পণ্ডিত হবার ইচ্ছেতেই বা মানুষ ভোগে কেন?

'এষা, তুমি কথা বলছ না।'

'শুনছি।'

'মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা বললেও পারতে। এরপরে আর জ্বালাতন করতে আসব না।'

'তার মানে?'

'খুব সোজাসুজি। তোমার যদি আমাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছেই হয়, তা'হলেও আমি আর আসাযাওয়া করতে চাই না। মনটা তোমার আপনি আপনিই প্রস্তুত হোক। সবসময়ে দেখা হলে একটা ইনফ্লুয়েন্স পড়ে বই কি! আমার তো মনে হয় তার সুযোগ নেওয়াটা উচিত নয়, আর প্রেমের ব্যাপারেই হয়তো যেটা ফেয়ার, সেটাই আঁকড়ে ধরা উচিত।'

'তুমি কি আমার ওপর রাগ করছ?'

'না না, রাগ করব কেন?'

তপন হাসল, আবার গম্ভীর হল। হাসল, আবার গম্ভীর হল। এষা দেখল আজ আর তপন মুখের হাসি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে

পারছে না। হাসিটা শরতের রোদের মতো ভেসে চলে যাচ্ছে, চোখ বেদনায় ম্লান।

'তুমি কি বিভাদিকে কিছু বলেছ তপন?'

'তোমার কথা? কই, না তো? বিভাদিকে সেদিন রণধীর সোন্ধী আর ওর বউ-এর কথা বলেছি। তাই শুনেই বিভাদি খুব ইন্টারেস্ট পেয়েছেন।'

'সেই মহিলার কথা? যিনি ক্যান্সারে মারা যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার বিভাদিকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না রণধীর ওঁর অথবা কারোই সিম্প্যাথি চায় না।'

'ও।'

'তোমার বিভাদির, চিরদিন একটি চাপা-পড়া কুকুর, অথবা তীর-বিদ্ধ হাঁস, অথবা অনাথ শিশু চাই। ট্যু চ্যানেলাইজ্ হার ভোল্ক্যানিক স্টোর অফ পিটি। সত্যি, এতখানি সৌন্দর্য, শিক্ষা, যৌবন নিয়ে উনি কেন কুকুর, ভিখারী, হতভাগাদের পেছনে ছুটে বেড়ান বলতে পার?'

অন্যসময় হলে তপনের কথায় এষার হাসি পেত, এখন হাসি এল না। তপন কৌতুক ক'রে কথাটা বলে নি। সত্যিই তার মনে হয়েছে বিভা অযথা নিজেকে অপচয় করছে।

'বিভাদি নিজে···'

বলতে গিয়ে এষা চুপ ক'রে গেল। উচিত নয়, বলা উচিত নয়, এ ওর সম্পর্কে হোক না-হোক মন্তব্য করা উচিত নয়। কেননা একজন আরেক জনকে কতটুকু জানে, বা জানতে পারে?

'এষা, আমাদের সময় বড় কম। এটুকু সময় আমরা বিভাদিকে নিয়ে নাই বা কথা বললাম! এষা, আমি তোমায় ভালবাসি, কিন্তু বোধহয় বড্ড কাছে আছি বলেই আমায় তুমি দেখতে পেলে না। দরজার বাইরেই থাকি বলে ধানের শীষের শিশির ফোঁটাটুকু কোনোদিন দেখা হল না—না, কি যেন কবিতাটা তুমি প্রায়ই বল? এই, তুমি কাঁদছ কেন?'

সত্যি শিশিরের মতোই নির্মল টলটলে জল এষার চোখে ছল-ছল করছে। 'এখনো মনে কি সঙ্কোচ, ইতস্তত ভয়, অথচ বলতে ইচ্ছে করছে তপন, তোমাকে আমিও ভালবাসি।

'চল, ওঠা যাক। আমার একটু তাড়াও আছে।'

'কোথায় যাবে?'

এষার ভাবতে কষ্ট হল, বিশ্বাস হতে চায় না, এরপরেও অন্য কাজে যেতে পারবে তপন, স্বচ্ছন্দে, সহজে।

'কাজ আছে।'

তপন আস্তে বলল। এরপরেও কাজ থাকে। যাকে ভাল-বেসেছে, যাকে ভালবাসে, সে এখনো তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, তাতে তপনের দুঃখ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও জীবনের প্রতিটি দাবি মেনে যেতে হবে। জীবনের, বিশেষত প্রত্যহের জীবনের দাবি মানতেই হয়, সেখানে কোনো অসহযোগ চলে না, কোনো হরতাল, অথবা হুমকি, চোখরাঙানি। দাড়ি-কামাতে হয়, অফিসে যেতে হয়, গুণে পয়সা দিয়ে গুণে ফেরত নিতে হয়, জল বাঁচিয়ে জুতো হাতে নিয়ে পথ চলতে হয়, যত বড়ই দুঃখ পাওনা কেন, যত বড় শোক। তোমার হাতে কিছুই নেই, বড়জোর তুমি অসহযোগ ঘোষণা ক'রে নিজের শোকের সঙ্গে ঘরে দোর দিয়ে বসতে পার, কিন্তু পরিণামে দেখতে পাবে তোমায় ফেলে রেখে মানুষের সংসার প্রত্যহের পথে হেঁটে চলে গিয়েছে। তখন হয় দৌড়ে গিয়ে তাদের মধ্যে জায়গা নিতে হবে, নয়তো উন্মাদ, হতভাগ্য হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আত্মহত্যা খুব কম লোক করে।

'রণধীর সোনধীর কাছে যাব। সে ফোন করেছিল।'

তপনের দিকে চেয়ে এখন এষার মনে কান্না ভেঙে পড়ল। সে কি ভুল করছে? সে কি ঠিক করছে? কে বলে দেবে?

তপন যখন রণধীরের বাড়িতে গেল, তখন তার কেবলই মনে

হচ্ছিল তাকে দেখলে যে-কোনো লোক বুঝতে পারবে এরা তার কাছ থেকে সরে গিয়েছে। খুব যে গভীর একটা দুঃখ তা নয়। একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতাবোধ, তপন রণধীরের দরজায় টোকা দিল।

ঢুকেই তার বোঝা উচিত ছিল, অস্বাভাবিক কিছু একটা হয়েছে, কেননা রণধীরের ঘরের মেঝেতে এক টুকরি ফুল, নতুন কাপড়, অভ্রের মালা। ভাসা ভাসা মনে পড়ল রণধীর বলেছিল বটে প্রীতম একটু ভাল আছে, আর এবার বিয়ের তারিখে ফল, ফুল নিয়ে গিয়ে ও প্রীতমের সঙ্গে দেখা করবে। সেই সময়ে তাকেও নিয়ে যাবে। প্রীতম তাকে দেখতে চেয়েছে।

'কোথায় ছিলে তপন?' তপন দেখল রণধীরের চোখ টকটকে লাল, রোমশ বুকের ওপর জামার কলার খোলা, তা ছাড়া মাথা দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়ছে।

'ভালই হয়েছে। চল, আমাদের হাসপাতালে যেতে হবে। তোমাদের নিয়মকানুন কি বাবা, অতি জঘন্য।'

'কেন?' তপন বোকার মতোই জিগ্যেস করল।

'প্রীতমকে ছাড়ছে না', রণধীর মাথা মুছতে মুছতে বলল, চটিতে পা গলাতে গলাতে।

'উনি বাড়িতে আসছেন?'

রণধীর সোন্‌ধী ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখমুখ বেদনাহত, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ, বুড়ো চামড়াঝোলা বাঘের মতো দেখাচ্ছে তাকে কপালের ভাঁজে, ঝোলাঝোলা ভুরুতে।

'তুমি জান না, তুমি জান না।'

'কি?'

'প্রীতম মারা গিয়েছে। অফিসে ফোন করেছিলাম, শ্যামল আসছে, স্বামীনাথন্, দত্ত, বিনয়বাবু, সবাই। তোমাকেও তো জানিয়েছিলাম।'

'আমি বাড়ি ছিলাম না।'

রণধীর তার জবাবটা শুনল না। তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে, ভয়ানক চঞ্চল। উত্তম এবং উৎসাহ যেন ফেটে পড়তে চাইছে। এখন একটার পর একটা কাজ করতে না পারলে যেন রণধীর বাঁচবে না।

তপন জানে অনেক সময়ে, মাঝে মাঝে যা-ই করুক, আজ কিন্তু রণধীর নেশা করে নি। অথচ রণধীরের দিকে চেয়ে তার মনে হল ও নেশা করলেও তপনের আজ হয়তো খারাপ লাগত না, ঘেন্না করত না।

'সকলকে খবর দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।' রণধীর পকেট থাবড়াল, 'টেলিগ্রামের রসিদগুলো আছে তো? দিল্লীতে মা'র কাছে ছেলে, ব্যাঙ্গালোরে বোনের কাছে মেয়েটা, জানিয়ে দিলাম সবাইকে।'

'আসতে বললে?' রণধীর ভেঙে পড়ছে না, ব্যাকুল হচ্ছে না, তপনও তাই খুব কাটছাঁট ভাবে কথা বলতে পারল না।

'না না, এসে আর কি হবে। সব নিয়েছি তো?' রণধীর পকেট হাতড়ে আবার দেখল। তারপর বলল, 'কি মুশকিল জান,' এখানে প্রীতমের এক মাসতুত দিদি থাকেন। ভগ্নীপতি হিন্দুস্থান মোটরস্-এ কাজ করেন। কিন্তু এখানে আসবার পর এত ব্যস্ত থেকেছি, ওঁদের ঠিকানাটা ঠিক জানা হয় নি। খবর দিতে পারলে হয়তো ভাল হত। ঐ যে, স্বামীনাথন্ গাড়ি নিয়ে এসে গিয়েছে। চল, দেরি হয়ে যাবে।'

ছিপছিপে বালিকার মতো নিষ্পাপ, নির্ভার, লঘুদেহ, প্রীতম সোন্‌ধীকে ওরা যখন দাহ ক'রে ফিরে এল তখন রাত হয়ে গিয়েছে।

রণধীর সকলকে হাতজোড় ক'রে ধন্যবাদ জানাতে লাগল, বাধা দিতে গিয়ে তপন সঙ্কুচিত হল। হয়তো এটা ওদের প্রথা, আর ওদের প্রথা বল, রীতিনীতি বল, তপন বড় কম জানে সব।

সিঁড়ির নিচ থেকেই ওরা বিদায় নিল। তপন উঠে এল ওপরে।

ওপরে এসে রণধীর বলল, 'তুমি চলে যাও, আমাকে এখন ঘরটর ধুতে হবে।'

'আমি থাকি আজকের রাতটা।'

ওরা দু'জনে ঘর ধুল, মুছল। স্নান ক'রে এসে রণধীর ধূপ জ্বেলে দিল ঘরে, তপন কফি তৈরি করল। কিছুক্ষণের জন্যে দু'জনে দু'জনের সঙ্গে সহানুভূতিতে, সমবেদনায় এক হয়ে গেল। রণধীরের চোখে যদিও এখনো রাগ, বিস্ময়, সে বোকা বনে গিয়েছে এই রকম চাহনি।

'আশ্চর্য, পরশু অবধি না কি ভাল ছিল।' একবার বলল রণধীর।

তারপর, উঠে আসবার সময়ে তপন যখন বলল, 'এখন কি এখানেই থাকবে সোনধী ?'

রণধীর বলল, 'থাকতেই হবে। এতদিন ওরা আমায় বদলী করতে চেয়েছে আর আমি ভীষণ-রকম ধরাধরি করে কলকাতার থাকবার, আরো ছ'বছর' থাকবার অর্ডারটা সব আনিয়েছি। প্রীতমকে এখানে ক্যান্‌সার হাসপাতালে রাখব বলেই তো কলকাতায় আসা!'

'এখনকার মতো ছুটি তো নাও। তারপর অবস্থাটা বুঝিয়ে বলে দিল্লীতে বদলী হতে চেষ্টা করা যাবে।...সোনধী, আমি বাড়িতে বলে আসি নি, তাই থাকতে পারলাম না, নইলে রাতটা থেকে যেতাম।'

'আমি তো একাই থাকি তপন!'

রণধীর আস্তে বলল, সে কথাও সত্যি। এ ঘরে তো প্রীতম কোনো দিন আসে নি। রণধীর একাই থেকেছে। প্রীতম যে বাঁচবে না, সে কথাও তার অজানা ছিল না। কিন্তু সে একা-থাকা, আর আজকের একা থাকায় তফাত আছে বই কি!

তপন বেরিয়ে আসবার সময়ে পাশের ফ্ল্যাটে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান

মহিলা, মাদ্রাজী গিন্নী, প্রতিবেশিনীরা রণধীরের বাড়িতে ঢুকলেন এঁদের দেখে তপনের একটু স্বস্তি হল। যত কম সময় একা থাকে সোন্‌ধী, ততই ভাল। যদিও, সোন্‌ধীর হয়তো আজকে লোকজন ভাল লাগবে না, একলা থাকলেই আরাম পাবে।

'আমরা যদি আগে জানতাম!'

মাদ্রাজী মহিলা মৃদু গলায় বললেন। ডাবের জলের মতো ঠাণ্ডা, ছলছলে তাঁর গলার আওয়াজ। তপন এখন বুঝল এঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়েই সোন্‌ধীর অনেকটা সময় কেটে যেত।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আজ রণধীরের জন্যে তার মন কেমন করতে লাগল। সে বাঙালী, এই শহরেই তার আপনজনরা সবাই আছেন। সে কি ক'রে বুঝবে একটি অবাঙালী পুরুষ, এখানে যার কেউ নেই, তার স্ত্রী মরে গেলে কি অসহায় লাগে নিজেকে, কি নিঃসঙ্গ বোধ হয়।

সে মনে মনে প্রার্থনা করল যেন সোন্‌ধী দিল্লীতে বদলী হয়ে যেতে পারে। প্রীতমকে সে চিনত না, কিন্তু তার খাড়া নাক, মোমের মতো সাদা রঙ আর মোমবাতির মতো পাতলা, ঋজু দেহ, বুকের ওপর একখানি পাতা খোলা পকেট গীতা, চোখের কোণে জল মন থেকে যাচ্ছে না।

এখন মন বড় শূন্য লাগছে, অথচ ভারাতুর, ক্লান্ত। ট্রামে যেতে যেতে তপন চোখ তুলতেই বিভাকে দেখতে পেল। সে যেন জানত বিভাকে দেখতে পাবে। থিয়েটার রোডের সামনে, যে কোণাটায় শুধু অ্যাক্সিডেন্ট হয়, যাকে বলে ভুতুড়ে জায়গা, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে বিভা। হাতে একটা বাস্কেট। তপন নেমে পড়ল।

'এখানে কি করছেন?'

'এই তো লিণ্ড্‌সে স্ট্রীটের দিকে যাব।'

'এত রাতে?'

'এত রাতেই তো আমি যাই।'

'জানি।'

হাত মুঠো ক'রে দাঁড়াল তপন। চোয়াল শক্ত, ভেতরে রাগ জ্বলে উঠছে।

'বাড়ি যান।'

'কেন, কি হল তপন?'

'কিছুই হয় নি। আপনার বেলেল্লাপনা দেখে, হ্যাঁ, দুঃখ বেদনা পেয়েছেন বলে এ ধরনের বাতিক আর খেয়ালপনাও এক ধরনের বেলেল্লাগিরি বই কি, দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।'

'তপন।'

'নিজেকে নিয়ে বিজ্ঞাপন, প্রচার অসভ্যতা। গায়ে তো আঁচ লাগে নি, টের পান না সত্যিকারের দুঃখ-কষ্ট কাকে বলে। আপনাদের পাঁচজনকে দেখেই এযার মাথা বিগড়েছে।' বিতা কি বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু হঠাৎ তপন ভীষণ রেগে উঠেছে। তাকে থামানো গেল না।

'পথে পথে কুকুরকে রুটি দিচ্ছেন। কেন? একটা ভাল ছেলেকে বিয়ে ক'রে সংসার করতে পারেন না? এর চেয়ে ভাল কোনো কাজ করতে পারেন না? বলি এটা কি ট্রাজিডিয়েন্ সাজবার যুগ?'

'তপন, তুমি বলবে তোমার কি হয়েছে?'

তপন এতক্ষণ ধরে যে-সব ঘটনা তার আয়ত্তে নেই, অথচ যার যন্ত্রণাদায়ক ফলাফল তাকেই ভোগ করতে হচ্ছে, সেইসব খামখেয়ালের ওপর রাগে ফুঁসছিল।

'আমার কিছুই হয় নি। রণধীরের বউ মরে গিয়েছে, আর, আর এযা হঠাৎ জানিয়েছে সে আমায় বিয়ে করবার মতো যথেষ্ট ভালবাসে না। অসহ্য! অন্যায়!'

তপন আবার বলল। এ ধরনের নিয়মের বাইরের ঘটনা এসে তার সাধারণ, অতি সাধারণ জীবনে ঝড় তুলবে কেন? কেন সে

তা সইবে ? বিশেষত এখন সে বুঝতে পারছে বিভা, এষা, যারা নিজেদের হৃদয়াবেগকে এত বেশি বড় ক'রে দেখে তারা আসলে স্বার্থপর। ওদের জন্যে সে বা রণধীর কষ্ট পেতে যাবে কেন ? এষার ব্যবহারও যেমন অর্থহীন একটা অন্যায় প্রীতমের মৃত্যুও তাই। এমন রোগ যার চিকিৎসা হয় না, তাতে প্রীতম সোনধীকে মেরে ফেলাটা আর এক খেয়ালীর অবিচার। এখন বাকি জীবনটা রণধীরের মন থেকে হয়তো যন্ত্রণা যাবে না।

'এষা তোমায় বিয়ে করতে চাইল না ?'

'না।' তপন জোরে রুক্ষস্বরে বলল, 'আপনাকে দেখে দেখে ও-ও স্থির করেছে অনিমেষ অব্‌সেসান নিয়েই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু আমি বলছি আপনারা ভীষণ অন্যায় করছেন, আর এজন্যে কষ্ট পাবেন।'

তপন ট্রামের দিকে হাঁটতে লাগল। সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বিভা বলল, 'তপন, তুমি কি করবে ?'

'চাকরি করব, প্রোমোশান বাগাব, বিয়ে করব, এষার জন্যে জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দেব না,' তপন একটু হাসল। 'আপনাদের কাছে হারব না।'

'আপনার, এষার এবং আপনাদের মতো অপদার্থ জীবদের চেয়ে আমাদের প্রয়োজন সংসারে অনেক বেশি। যা-ই করি না-করি, ফেরাজিনীর পাঁউরুটি পেলে নিজেই খেয়ে নেব।'

ট্রামে উঠে আঙুল নেড়ে বলল, 'কুকুরদের দেব না।' ব'লে তার আনন্দ হল, কিন্তু মাথা থেকে পা অবধি শিরশিরিয়ে উঠল। তপন বুঝল তার জ্বর এসে গিয়েছে।

তপন যা যা বলেছিল, প্রত্যেকটি কথা বিভা পরে এষাকে বলে। এষার বাবা এবং মা-ও কাছাকাছি ছিলেন। তাঁদের শুনিয়ে জোরে জোরেই বলে।

'জান এষা, তপন যখন আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে চলে

যায় তখন আমার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল কি জন্য ও আমায় দোষ দিয়েছিল। আমি বাড়িতে থাকি না বলে? জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল এইটুকু ছেলে ও, কি জানে ভালবাসার, দুঃখের, আঘাতের। কিন্তু ওর মুখ দেখে এষা বুঝলাম, ভীষণ আঘাত পেয়েছে তপন।

এষা ভুরু কুঁচকে শুনছিল।

'ভীষণ আঘাত পেয়েছে। দেখে আমার অনী আর ইরার উপর রাগ হ'ল, দারুণ রাগ। ওরা দু'জন কাছে থেকে আর দূরে থেকে বার বার প্রত্যেককে কষ্ট দিচ্ছে, প্রত্যেকের দুঃখের কারণ হচ্ছে। এষা, তুমি একটা মূর্খ।'

রেগে চেঁচিয়ে উঠেছিল বিভা।

তখন আরো একটা বছর আর কয়েকটা মাস কেটে গিয়েছে। বিভা ক্রমেই তার বাড়ির লোকদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার বাড়ির লোকরাও বিভাকে আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

বিভার মা আর বাবা, তাঁদের বড় মেয়ের ছেলেকে বাড়িতে এনে, গুরুদেবের মত করিয়ে নিয়ে, সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা প্রায় ঠিকই ক'রে ফেলেছেন।

বিভার মার গুরুদেব প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাসী নন। এক সময়ে তিনি স্যার বিজয় মিত্রদের সহপাঠী ছিলেন, প্রেসিডেন্সীর নামকরা ছেলে, হুগলীর নামকরা জমিদার বাড়ির কৃতী সন্তান। যেমন টকটকে রং ছিল, তেমনি সায়েব ছিলেন, সবাই জানত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাঁর দরজার বাইরে শরুক-এর মূল্যবান্ গালিচার মতো বিছানো আছে, পড়ার জীবন শেষ হলেই তিনি পড়ার ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে সেই গালিচায় পা রেখে সূর্য-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে চলে যাবেন।

অথচ, অরিন্দম সেন হয়ে গেলেন টেররিস্ট।

একদিন পড়ার সময়ে যেমন, আজও তেমনি করেই সমস্ত মন,

চিত্ত, মেধা নিয়োগ করলেন বিপ্লব সংগঠনের কাজে আর সেই জন্যেই চীন, জার্মান, বর্মা, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন।

তারপর সেই লোকই একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। শোনা গেল দল ছেড়ে দিয়েছেন তিনি, মত পালটে ফেলেছেন, এবার তিনি অন্য পথে যাবেন।

বিপ্লবের রোমান্টিকতায় যারা মজে ছিল, সেইসব আশাবাদীরা বলেছিল এবার হয়তো তিনি ইউরোপের কোনো দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আর অগাধ টাকা নিয়ে এসে উপস্থিত হবেন।

যারা আধা রোমান্টিক তারা বলেছিল দেখা যাক কোন দলে গিয়ে জোটেন। তারা বিশ্বাস করত তাদের পথই সত্য পথ, অতএব তিনি অন্য পথে গেলে তাঁকে যে ক'রে হোক ফিরিয়ে আনতে হবে।

কিন্তু প্রচুর পড়াশোন করে অরিন্দম সেন হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। আর সঙ্গে সঙ্গে মন, মেধা, বুদ্ধি, যুক্তি সব ঢেলে দিলেন এক দিকে। তাঁকে যিনি দীক্ষা দিলেন, তিনিই বলে দিলেন সৎ গৃহীদের সাহায্য করবার জন্যেই তাঁকে শিষ্য নিতে হবে কয়েকটি। থাকতেও হবে লোকালয়ে।

এখনো তিনি বাইরে ঘোরেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। হইচই, নাম প্রচার, অর্থলোভ, যশলাভ, কিছুতেই আকর্ষণ নেই তাঁর। হয়তো সে জন্যেই তাঁকে দেখবার জন্যে লোকের এত আগ্রহ।

বিভার মা'কে তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, 'সব সম্পত্তি বড় মেয়ের ছেলেকে দিয়ে দিচ্ছ কেন।'

তার উত্তরে বিভার মা তাঁর কাছে কয়েক দফা অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

তখন বিভাকে ডেকেছিলেন অরিন্দম সেন। সামনের চেয়ারে বসিয়ে হঠাৎ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছিলেন। বিভা একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারে নি। প্রশ্নগুলো স্বাস্থ্য এবং শরীর বিষয়ে। যে কোনো ভাল ডাক্তারের মুখ থেকেও আসতে পারত প্রশ্নগুলো।

তিনি চলে আসবার সময়ে বিভার বাবাকে বলেছিলেন, 'বিভার মন কি ফিরবে না ?'

'মন ? বিভার মনে কি হয়েছে ?'

'ও যে বিয়ে করতে চায় না...'

'মন ? ননসেন্স্। রোমান্টিক কথাবার্তা দিয়ে সত্যিটা ঢেকে চলে এসেছ চিরকাল, সাজানো কথাই ভাল লাগে।' অরিন্দম সেন মোটা ভুরু কাঁপিয়ে ধমক দিয়েছিলেন।

'কিন্তু...'

'বিভা ড্রাগ অ্যাডিক্‌ট। জানি না কেন, কোথায়, কবে ওর এ জঘন্য অভ্যাসের শুরু। তবে ও অ্যাডিক্‌ট।'

বিভার বাবা এবং মার মনের দেওয়ালে তাঁদের মেয়ের সম্পর্কে যে সব চেনা চেনা ছবি টাঙানো ছিল যে-সব ছবির নিচে সুন্দর এবং রোমান্টিক সব চিত্র-পরিচিতি ছিল, সব ভেঙে চুরে দিলেন গুরুদেব।

বিভা খামখেয়ালী, অনিমেষকে ভাল বেসে চলা বিভা, মাদাম তেরেসার হোমের সেবিকা বিভা, রাতের চৌরঙ্গী রোডে কুকুরদের রুটি বিতরণরত বিভা, সব ছবিই বাতিল ক'রে দিলেন অরিন্দম সেন। দিয়ে-টিয়ে আটটা পঁচিশের ট্রেন ধরে পাঁচমারী পাহাড়ে রওনা হয়ে গেলেন। রেখে গেলেন শুধু একখানা ছবি। বিভা ড্রাগ অ্যাডিক্‌ট।

বিভার বাবা এবং মা হতভম্ব। যেন তাঁদের শোবার ঘরের আরাম কেদারায় ঠ্যাং ছড়িয়ে সাউথ আমেরিকার আর্মাডিলোর মতো একটা আজব এবং অচেনা জন্তু বসে আছে। অজানা, ভয়ঙ্কর, অথচ তার সম্পর্কে একটা কিছু করা দরকার। বিভা ড্রাগ নেয়। বিভা অচেনা, অস্বাভাবিক তার সম্পর্কে কিছু করা দরকার, কিন্তু তাঁরা কি করবেন ?

'তুই এমন কাজ কেন করলি ?' মা বলেছিলেন।

'অনীর জন্যে। ভালবাসা না পেলে, আমার মতো আদরে নষ্ট, খামখেয়ালী, একবগ্‌গা মেয়ে আর কি করতে পারত বল?'

'অনীর জন্যে?

'হ্যাঁ। ও আমাকে চাইল না কেন?'

বিভা মা'র হতভম্ব মুখের দিকে চেয়ে হেসেছিল। বলেছিল, 'আমি খুব স্বার্থপর। আমার কথা ভেব না।'

ততদিনে এষা আর তপনের মধ্যে আড়ালটা অনেক বড় হয়ে উঠেছে।

তবু তপন বিভার কথা জেনে দুঃখিত হয়েছিল। বিভার জন্যে দুঃখ করা উচিত নয়, কেননা বিভারা বিধাতার অপব্যয়, বাজে খরচ। তবু দুঃখ হয়েছিল।

যদিও সে দুঃখের কথা সে এষাকে বলতে যায় নি। সে তখন এষাকে ভুলতে চেষ্টা করছে।

'তুমি কি তপনকে ভুলে গেছ, এষা?'

বিভা জিগ্যেস করেছিল।

জানে না, এষা জানে না। সে তপনকে গ্রহণ করতে পারে নি, কিন্তু সে তো অনিমেষকে ভালবাসে নি। প্রেম ছাড়াও কোনো কোনো পুরুষ হয়তো মেয়েদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অনিমেষও এষাকে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু এষার ঈশ্বর জানেন, তার নাম ভালবাসা নয়, এষা কোনো দিন অনিমেষের কাছে ইরা হতে চায় নি।

অথচ অনিমেষ যেদিন এসে দাঁড়াল, সেদিন তার এক ডাকেই এষা ভেসে যেতে পারল। অন্ধ হয়ে কোনো না কোনো নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে সে তখন ব্যাকুল।

সেই সময়েই অনিমেষ এল। এষা আর তপনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার তিন বছর বাদে।

॥ ১৮ ॥

এষার জীবনে এত বছর বাদে অনিমেষ ফিরে এল। এই ফিরে আসা যেন কোনো না কোনো ভাবে নিয়মের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করা। কোনো ভয়ঙ্কর নিয়মকে মান্য করা। এখান থেকেই চলে গিয়েছিল অনিমেষ একদিন, চলে গিয়েছিল ইরার সঙ্গে, আজ ফিরে এল।

যখন এল, তখনই এষা ভয় পেল।

কেন, এতদিন বাদে আবার সেই সবই ফিরে ফিরে ঘটছে কেন? অনেকদিন আগে এক মেঘলা দুপুরে, তাদের সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের আকাশ কালো করে মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, আর ঘন নীল মেঘের ওপর একটা উজ্জ্বল, হলদে, মস্ত ঘুড়ি যেন মেঘদের পেটে ঢুঁ মেরে ঢুকে যেতে চাচ্ছিল।

সেদিন অনিমেষ এসেছিল, অনিমেষ আর বিভা।

তখন এষাদের বাড়ির আশেপাশে কিছু কিছু জমি পড়ে থাকত, কোথাও দুটো-একটা ডোবা, কোথাও বা নারকেল গাছ। তখন সরস্বতী পুজোর প্যাণ্ডেলে অনেক রাতে তাজমহলের গান বাজত অথবা কে. এল, সাইগলের অদ্ভুত কাছে বসে, শুধু এষার জন্যে পাওয়া গলায় 'নাইবা ঘুমালে' শোনা যেত।

সেই সময়েই এসেছিল অনিমেষ। অনিমেষ আর বিভা।

তখন এষার বয়স কত কম, কত ভাল লাগত তার পরিচ্ছন্ন সুন্দর জীবন। যে জীবন সে আশেপাশে কোথাও দেখে নি। তখন তার জীবন পরিবারের গণ্ডীতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মাসতুত আর মামাত বোনরা আসত। বিয়ে, প্রেম, ভালবাসা—এইসব কথা বলত। এষার তখন তাদের সঙ্গ ভীষণ ভাল লাগত। এক সময়ে

সে বলেছিল স্নেহাদিকে মা'র চেয়েও ভালবাসি, তাতে তার মা ছবি রেগে লাল হয়ে গিয়েছিলেন।

জ্যান্ত কচ্ছপের পিঠের খোল ভেঙে ফেললে, যন্ত্রণায় লাল মাংসটা কাঁপে। এষাও সেইরকমেই স্পর্শকাতর ছিল, তা ছাড়া একদিকে ভয়ানক স্বার্থপর, কেননা আত্মকেন্দ্রিক, কেননা নিজেকে ভালবাসত ভীষণ। যদিও সে সব কথা সে জানত না। ভালবাসা পাবার জন্যে হাঁপিয়ে মরত।

সেই সময়ে অনিমেষ এসেছিল। কলকাতা যখন যুদ্ধের হিড়িকে আলোর ওপর কালো কালো ঘেরাটোপ পরছে। ত্রিপুরার রাজবাড়িতে মানুষদৈত্য গিয়েছে বলে যখন কলকাতার মানুষ, এমনই বিশ্বাস করতে ব্যস্ত, যে ভিড় করত। তা ছাড়া তখনও ফিটন চড়ে চৌরঙ্গীতে বেড়ানো ভারী শখের ব্যাপার। বিশেষ করে বড়দিনে, যখন কাগজের টুপী থেকে কাগজের রিবন ফিটনের তালে তালে নাচে।

তেমনিই এক ফিটনে তো এষার মা'র অ্যাক্সিডেণ্ট হয়। সেই অ্যাক্সিডেণ্ট থেকেই ছবির মা হওয়া বন্ধ হল। যতদিন অ্যাক্সিডেণ্ট হয় নি ছবি, সুস্থ সুন্দর, অবুঝ, জেদী, ছেলেমানুষ ছিলেন, ততদিন স্বামী-স্ত্রীর বনিবনাও ছিল না।

এষাদের বাড়িতে চিরদিন ভালবাসাটাই সমস্যা। সতীশ ছবিকে ভালবাসতে চাইতেন, পারতেন না। ভিতু হয়ে গিয়েছিলেন, ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারেও অধিকার খাটাতে ভয় পেতেন। ছবির অ্যাক্সিডেণ্ট হবার পর দুজনের মধ্যে তবু একধরনের বনিবনাও হল। যেন দুজনেই বিশ্বাঘাতকতা করে টরে, নানারকম বিপথ ভ্রমণের পর ফিরে এসেছেন। তাই যেন এ ওকে ঘাঁটাতে নারাজ, তাই যেন দুজনে দুজনের বিষয়ে বেশি সহিষ্ণু। অথচ, এ আর কিছুই নয়, ব্যবহারের দুর্নীতি নয়, চরিত্রের বিপথগামিতা নয়, এ শুধু পরস্পরকে ভালবাসতে না পারবার পাপস্খালন।

সেই সময়েই অনিমেষ এল।

তখনও তাদের বাড়িতে মামাত-মাসতুত বোনরা থাকে না, শুধু তারা থাকে। তবু সতীশ আর ছবি উদাসীন। শোনা যায় ছবি সংসার নিয়েই থাকেন, তবু সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, ছেলেমেয়েরা পড়া-শোনায় কেন ভাল নয় বলে মাঝে মাঝে সতীশ বাঁকা হেসে মন্তব্য করেন। এইসব সমস্যা আর অশান্তি বাড়িতে এক বিষণ্ণ ছায়া ফেলে রাখে, শীতের অপ্রসন্ন সকালের মতো; আর তাই থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে এষা মাঝে মাঝে পালিয়ে যেত।

বইয়ের জগতে। দুঃখভরা গল্প-কবিতা ছাড়া কিছু পড়তে চাইত না সে। 'টমকাকার কুটির' পড়ে ইভাঞ্জেলিনের মৃত্যুর ছবি এঁকে ফেলেছিল একটা। তা ছাড়া আরো যা পড়েছে যেখানে, বিশেষত শিশুদের মৃত্যুর কথা, ভয়ানক অভিভূত করত তাকে। ওদের বড়ই কাছের মানুষ মনে হত তার। ডী নদীর জলে হারিয়ে যাওয়া মেষ-পালিকা মেরী, দুর্গা, লুসি গ্রে, আর 'সবার চেয়ে ছোট্ট পিঁড়িখানি'র হারিয়ে-যাওয়া মেয়েকে মনে হত জ্যান্ত মানুষদের থেকে অনেক, অনেক সত্যি। যখের বাড়িতে যে ছেলেটা হরতনের টেক্কা নিয়ে খেলত আর যে সুয়োর বাঁশি শুনেছিল তাদের সে অনেক বেশি চিনত। সেইজন্যেই ইস্কুলের ব্রণ ওঠা মেয়ে অথবা পাড়ার বিয়ের স্বপ্ন দেখা মেয়ে, কারো সঙ্গেই বন্ধুত্ব হল না তার।

'এটা একটা অসুখ।' অনিমেষ, অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো এ বাড়ির আসল সমস্যার ওপর আঙুল রেখেছিল, 'এ বাড়ির সমস্যা স্নেহহীনতা, ভালবাসার অভাব।'

সে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাই, এষার পৃথিবী অনিমেষ গ্রাস ক'রে নিল। অনিমেষকে দেখে দেখেই বড় হতে লাগল সে। যদিও তার নাম ভালবাসা নয়, তার নাম নির্ভরতা, অথবা অন্য কিছু। কিন্তু তার নাম ভালবাসা নয়। সে তো জানতই ইরাকে ভালবাসে অনিমেষ। চিরদিন ভালবাসে, চিরদিন ভালবাসবে, আর সেই জানাতে এষারও কত শান্তি ছিল।

তাই, এতদিন যে অনিমেষ আর ইরার কম খবরই পাওয়া গিয়েছে, ওরা যে আসে নি, খবর দেয় নি, তাতে কোনো দুঃখ ছিল না এষার।

বরঞ্চ, এখন যখন সে দেখল অনিমেষকে ভালবাসা একটা ব্যাধি বিশেষ, ওকে ভালবেসে বিভা ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়েছে, তখন সে ভয় পেয়েছে।

তপন যখন বলল অনিমেষ কোনো না কোনো ভাবে আপ্লুত, আচ্ছন্ন করে রেখেছে এষার ভুবন, আর সে জন্যেই তপনকে গ্রহণে এষার এত বাধা তখনও সে ভয় পেয়েছে। মনে মনে প্রার্থনা করেছে অনিমেষ যেন না আসে এখানে। ওরা সুখে থাকুক, সুখী হোক। এষা ইচ্ছে করেই ভুলে যেতে চেয়েছে ইরা স্বেচ্ছায় যায় নি, অনিমেষ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভয়ঙ্কর কোন নিয়মের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে এতবছর বাদে অনিমেষ এল। যেন বৃত্ত রেখার দুটো মুখ জুড়ছিল না, এবার জুড়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। কিন্তু কোনো মতে বৃত্ত সম্পূর্ণ করবার জন্যেই কি এল অনিমেষ। অনিমেষ যে বরাবর চাইত একটা প্যাটার্ন। চাইত মানুষ নিখুঁত হোক, মানুষের ভাবানুভূতিগুলো শুদ্ধ হোক। চার পাশের মানুষ বড় বেশি মুখোশ দিয়ে আঁটা, বর্ম চর্ম ঢাকা, সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়।

নিলীনা মিত্র, বিজয় মিত্র, রণজয়, অজয়, লতা, ইলা, সবাইকে নাকচ করে দিয়েছিল অনিমেষ, সে ইরাকে চায়।

বিভার ভালবাসার দিকে চেয়ে দেখে নি, কারো কথা ভাবে নি, ধরেই নিয়েছিল ইরাও তাকে চায়।

ইরাকে ভালবাসত অনিমেষ, অথচ বলত ইরা একেবারে নিখুঁত বড় বেশি পারফেক্ট, তাই এষা তার কাছে প্রয়োজনীয়। এষা ছোট, সরল, সুকুমার, নমনীয়। এষার নিষ্পাপ সাহচর্য তার দরকার।

মানুষকে ভেঙে ভেঙে গড়ার, মানুষকে নিয়ে খেলবার, সব অধিকার আছে তার, এ কথাই বা কেন ধরে নিয়েছিল অনিমেষ, তা কে বলবে।

এখন, এই ফিরে আসা, হয়তো শুধুই, অনিমেষের একটা মানসিক প্যাটার্ন সম্পূর্ণ করবার ইচ্ছের চরিতার্থতা। আর কিছু নয়। মনে করতেই এষার ভয় হল।

এইজন্যে ভয় হল, যে যে-সব দিন মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে থাকে কোনো না কোনো কারণে, যদি সেইসব দিনই ফিরে ফিরে ঘুরে আসে, তা হলে ভয় হয়, কেননা তা স্বাভাবিক নয়। অনিমেষ এসেছিল পড়তে, তখন তার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, আর এষার বয়স শুধুই বারো। অনিমেষ সেদিনও আর একজনকে ভালবাসত। তবু, তার আসাটাকে যদি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ এক ঘটনা বলে মনেই না হবে তা হলে এখনো এষার মেঘলা আকাশ দেখলে ভয় হয় কেন? মেঘলা দিনে, বাদুলে বাতাস ঠেলে হলদে লাল ঘুড়ি কলকাতার আকাশে ছেয়ে ফেলেছে দেখলেই কেন বুকের ভেতরটায় ধুলো পড়া সব তারে টুং টাং লেগে মনে পড়িয়ে দেওয়া সুর বাজতে থাকে?

অনিমেষ এল আবার এক বর্ষার দিনে। এল বিভার সঙ্গে। আজকের আকাশেও মেঘের শেষ নেই, আর বিশ্বকর্মা পুজোতেও যদি ঘুড়ি না উড়ল তা হলে আর কলকাতা কি।

'অনী, আস্তে নাম,' বিভা মিহিসুরে বলল। বিভার একনিষ্ঠতা দেখে এষার হঠাৎ হাসি পেল। ভয়ানক আজগবী সব, অদ্ভুত, জাদুকরের বাজতে মুখোশ, রঙীন পোশাক, আলখাল্লা সব নিজে নিজে নেচে বেড়ালে যেমন হয়, তেমনিই ফ্যান্টাসি চলেছে। অথচ বিভাও তা জানে না। তার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল 'বিভাদি, চিরদিন কি তুমি অনীদাকে পৌঁছে পৌঁছে দেবে? একবার আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিলে। একবার ইরাদিকে এনে অনীদার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলে। আবার অনীদাকে এনেছ কেন? আর কতদিন তোমরা ফ্যান্টাসি ধাওয়া করে বেড়াবে? অন্যদের কথা কি, আমাদেরও যে বয়স অনেক হল।'

যদিও, তা জিগ্যেস করল না এষা।

তার জিগ্যেস করবার কোনো সুযোগই হয় নি। এতদিন বাদে এবাড়িতে অনিমেষ আসছে, সতীশ, ছবি, এষার ভাই বোন মনীষা, কমল, সকলেই তার জন্যেই যেন অপেক্ষা ক'রে বসেছিল।

এ বাড়িতে ইতিমধ্যে তার জন্যে রাজাসন পাতা থাকবে, তা যেন অনিমেষও জানত। ভাবতে গিয়ে এষার হঠাৎ রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। যেন দশ বছর আগে এ-বাড়ির প্রতিটি ভালবাসা, আন্তরিকতাকে অস্বীকার করে সে চলে যায় নি, যেন নিলীনা মিত্রের ওপর চূড়ান্ত অবিচার করে নি, পৃথিবীতে ভালবাসা নেই বলে সে যেন প্রত্যেকের ওপর, স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন, প্রতি সম্পর্কের ওপর, স্নেহহীনতার অপরাধে রুল জারী করে নি!

'কে তোমায় বিচারক করেছিল অনীদা?' এষার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল। যদিও সেই ধরনের কথা উচ্চারণ করল না, 'হীরালাল, দাদাবাবুর স্যুটকেসটা বারান্দায় রাখ,' এষা নিজের গলা শুনতে পেল।

এতক্ষণে তার বুকের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সব, এখন বোঝাপড়ার সময়, বলবে নাকি 'অনীদা, তুমি একটা সর্বনেশে ইনফ্লুয়েন্স। তোমার বাপ মা, আমার বাপ মা ইত্যাদি, কনকদা, বিভাদি, আমি, আমরা সবাই নানাভাবে জোড়া-তালি দিয়ে দিব্যি চলছিলাম, তুমি সকলকে সৎ হও, শুদ্ধ হও, হেনতেন সতেরোটা কথা বলেই হাঙ্গামা বাধালে। তোমার ইচ্ছেটাই অথবা তুমি, এ সময়ে অচল। তাই তোমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে, অথবা দিতে না পেয়ে, তোমার মা মরে গেলেন, আমিও কি রকম হয়ে রইলাম অনীদা, সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারলাম না—'

'বিভাদি, ভাল আছ?' সে জোরে বলল।

'এষা!'

অনিমেষকে আর সরিয়ে রাখা গেল না। এগিয়ে এল সে।
'এষা, ভাল আছ ?'

বলেই সে থমকে দাঁড়াল।

সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে এ সে এষা নয়, যাকে সে রেখে চলে গিয়েছিল তাছাড়া, সৌজন্যের কথা বলতে গিয়ে এখন অনিমেষ বুঝতে পারল মাঝখানে কয়েকটি বছর, কয়েকটি মানুষের আড়াল দাঁড়িয়ে। নিলীনা মৃত, কনক নির্বাসিত, ইরা অনুপস্থিত। এই সময়েই এষার কানে বাজল অন্য গলা, 'ভাল আছ এষা ?'

'তপন ?'

তপন দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত হচ্ছিল, ঘামছিল।

'তুমি ওঁকে চেন নাকি, এষা ?'

অনিমেষ বিস্মিত।

'ও যে এখানকারই ছেলে,' সতীশ সকলকে স্বস্তি পেতে দিলেন। এখন ঠিক এমনি একটি কথারই দরকার ছিল। ও আমাদের হাবুদার ছেলে গোছের কথা হলে আরো ভাল হত। পরিস্থিতি যখন অতি মাত্রায় অবাস্তব, তখন বাস্তবতার হোমিওপ্যাথিক ডোজেও কাজ হয়।

'বা, আমরা একসঙ্গে এলাম যে !'

অনিমেষ আশ্চর্য।

'হ্যাঁ। আমি বম্বে থেকে, উনি রায়পুর থেকে, অনেকটা রাস্তা আমরা পরস্পরের সঙ্গী ছিলাম।' তপনের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি খেলা করছে। বোঝাই গেল বিভা ওকে স্টেশনে দেখেও চিনতে চায় নি।

'যখন শুনলাম এদিকেই আসবেন, তখন বললাম একসঙ্গেই চলুন,' অনিমেষ হাসল। তার এই সাধারণ, অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছেলেটিকে ভাল লেগেছে। ট্রেনে আসতে আসতে তার কতবার মনে হয়েছে সে-ও যদি অদ্ভুত অদ্ভুত উচ্চাশায় অস্থির না হত,

তা হলে ঐ ছেলেটির মতো আত্মস্থ হতে পারত। আত্মস্থ হওয়াই হল সবচেয়ে বড় কথা, নিজের মধ্যে স্থির থাকা। মালবাবু হয়ে তিসি আর মশ্‌নের হিসেব রাখতেও আপত্তি নেই, যদি সেটাই তার নিজের, একান্ত নিজের কাজ হয়। কিন্তু অনিমেষ এ-ও জানে, সে সুযোগ সে আর কোনদিন ফিরে পাবে না। যেমন, তার চোখের পাওয়ার আর মাইনাস সিক্স্‌ হবে না। যেমন তার সরিয়ে ফেলা অ্যাপেন্‌ডিস্‌টি আর ফিরে পাবে না, তেমনিই অকিঞ্চিৎকর হাস্যকর, তবু এক নিদারুণ সত্য সে আর তপনের বয়সটা ফিরে পাবে না।

'তুমি বম্বে থেকে আসছিলে, তপন?'

সতীশ বিস্মিত।

'আজ্ঞে।' তপন অনিমেষকে দেখে যে ধাক্কা খেয়েছে, তার ঘোর কাটে নি।

'বম্বে কি জন্যে গিয়েছিলে তপন?' ছবির গলায় হতাশা। জীবনে কোনো কিছুর জন্যেই তিনি আন্তরিক চেষ্টা করেন নি। ভাল মা, ভাল স্ত্রী হতে চেষ্টা করেন নি, কিন্তু এখন তাঁর গলায় ক্ষোভ, ঐ শিষ্ট ছেলেটিকে তাঁর অবাধ্য মেয়ে বিয়ে করলেই তিনি ভাল জামাই পেতে পারতেন।

'অফিসের কাজে।'

'তোমার অফিস কলকাতায় না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি দুটো প্রোমোশন পেয়েছি তিন বছরে।' তপন বিভার দিকে তাকাল, 'অফিস ইন্‌সপেকশ্যনে বম্বে আর মাদ্রাজ যেতে হয়।'

'আপনাদের কিসের অফিস?' অনিমেষ আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

'আমরা ছাঁট লোহা রপ্তানি করতাম, এখন লাইট মেশিনারী বানাচ্ছি।'

'মালা, মালা, ভাল আছে তপন?' ছবি প্রশ্ন করলেন।

'আছে বই কি।'

তপন হাসল, বিভার দিকে চাইল। বলল, 'ভাল আছেন?'

'সে কি, আপনি ওকে চেনেন না কি?'

'ও তপন,' বিভা আস্তে বলল।

'তা হলে, স্টেশনে তো তুমি··· ?'

'উনি লজ্জা পাচ্ছিলেন,' তপন হঠাৎ হাসল, 'আমি ওঁকে কতকগুলো সত্যিকথা বলেছিলাম। বিভাদি রাস্তার কুকুরদের জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারতেন তখন, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা যারা বলে তাদের এখনো ক্ষমা করতে পারেন না। সেই জন্যেই আমায় চিনতে চান নি।'

এবার মুখ লাল হয়ে গেল, তারপর সাদা। তপন এরপর আর কি বলবে?

'তপন এক সময়ে···'

বিভার কথা কেটে দিয়ে তপন বলল, 'এখনো আপনার খবর রাখি বিভাদি। অনন্ত চাটুজ্যে আমার বন্ধু। আপনাকে সেই তো সামালে। বোধহয় সে জন্যেই আপনি তাকে দেখতে পারেন না।'

'তপন এতদিন পরে কি তুমি ঝগড়া করতে এসেছ?'

'না এবা। তবে আমি তো জান, একটু কাদামাটির মানুষ, ব্যবহারটা তোমাদের মতো নিখুঁত আর হল না। আচ্ছা চলি অনিমেষবাবু।'

'চলে যাবেন, আপনার সঙ্গে তো···'

'আরে আমার আপনাকে চেনা দরকার ছিল মশাই। অন্যদের দোষ দোব কি, ট্রেন জার্নির সময়টুকুতে আমিই আপনার চার্মে পড়ে যাচ্ছিলাম!'

'কিন্তু আবার দেখা হবে না?'

'অনিমেষবাবু, আমার এখানে ঘন ঘন উপস্থিতি এখন দরকার হবে না। তা ছাড়া আপনিও বোধহয় ব্যস্ত থাকবেন। আমাকে

যে বলেছিলেন আপনার সামনে অনেক কাজ? চললাম মেসোমশায়।'

তপন বেরিয়ে গেল। সকলে নির্বাক। তারপর সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

'অনী, তোমার ঘর ঠিক সেই রকমই...'

'ইরাকে আনলে না কেন?'

'ট্রেন লেট থাকলে বোধ হয় আর...'

অনিমেষ, পর্দা তুলে নিজের ঘরে ঢুকল, থমকে দাঁড়াল। সব, সব সে রকম আছে। কিন্তু অনীদা, ভুল বুঝ না, এষা চেঁচিয়ে বলতে চাইল, এ দেখে ধরে নিওনা তুমি এসে দাঁড়ালে সব অন্যরকম হয়ে যাবে, কিন্তু অনিমেষের সামনে কে কবে কথা বলতে পেরেছে? এষা কেমন করে বলবে?

'বিভা, আজও দেখ আকাশে ঘুড়ি উড়ছে।'

'আজ বিশ্বকর্মা পুজো, অনী।'

'বিভা, অনন্ত চাটুজ্যে কে?'

'একজন দারুণ হ্যাণ্ডসাম্ ডাক্তার অনী।'

'তার কথা কি যেন বলছিল ছেলেটি?'

এষা বিভার দিকে তাকাল। লজ্জা নেই, কোনো লজ্জা নেই বিভাদির। হাঁ করে অনীদার কথাগুলো গিলছে। এখনো অনীদাকে ভুললে না, এমন নির্লজ্জ তুমি হলে কবে বিভাদি? এখন কি অনীদাকে তুমি সত্যি কথাটা বলবে?

'আমি ড্রাগ নিতাম অনী।'

'কি বললে?'

'আমি ড্রাগ নিতাম। তপন আমায় ঠাট্টা করে গেল এষা, কিন্তু ড্রাগ কেউ মনে সুখ থাকলে নেয় না। অনী, আমাকে অনন্ত চাটুজ্যে বিছানায় বেঁধে রেখে ড্রাগ ছাড়ালে। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বলতে

পায়। সবাইকে মারতাম, ছুটে বেড়াতাম, জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলতাম।'

বিভার চেহারায় এখন অন্য অস্থিরতা, আক্ষেপ।

'যাদের ভবিষ্যৎ আছে, তারা ড্রাগ ছাড়লে তার একটা মানে হয়। কিন্তু আমার কাছে ওটাই ছিল শান্তি, বিশ্রাম। আমার তো সামনে তাকাবার কিছু নেই। আমি কেন ওদের কথা শুনে সুস্থ স্বাভাবিক হতে গেলাম বল তো? ওরা আমার উপকার করে নি অনী।'

'বিভা, তুমি আমায় বললে না কেন? তোমার কিসের দুঃখ?'

'আমার কিসের দুঃখ!'

বিভা শূন্য দৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে চেয়ে রইল। তারপর, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'সে সব কথা থাক। আমি কোনদিনই তোমার ক্যানভাসে ছিলাম না। ইরার কথা বল।'

ইরার কথা!

অনিমেষ মুখ তুলল। বলল, 'আমি রায়পুরে কেন গিয়েছিলাম জানতে চাইলে না তো?'

'কেন গিয়েছিলে অনীদা?'

'বাবাকে দেখতে। সার বিজয় মিত্র বর্তমানে অন্ধ। হি-হ্যাজ লস্ট্ হিজ্ প্রেশাস্ আইজ্। আমায় কাতরে প্রায় ভিক্ষে জানিয়ে আসতে লিখেছিলেন।'

'তোমার বাবা অন্ধ হয়ে গিয়েছেন!'

'হ্যাঁ। চোখের নার্ভ মরে যাচ্ছে, এখানে কাউকে বিশ্বাস করলেন না। ভিয়েনা আর লণ্ডনে ছুটোছুটি করে ডাক্তার লিণ্ডাকে দিয়ে অপারেশান করিয়েও কিছু হল না।'

'তোমার তো খুশি হবার কথা অনী!'

'ইরাও সেই কথা বলেছিল। কিন্তু আমি ব্রুট নই বিভা, আমি খুশি হই নি। রায়পুরে নেমে যখন দেখলাম বাবার চোখে কালো চশমা, কাঁধ ঝুলে গিয়েছে, আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ, বাবা আমাকে বোকা বানিয়ে দিলেন। আমি আর উনি চিরদিন দুজনে দুজনের শত্রু। ওঁকে ঘেন্না করতাম বলে মা'কে কোনোদিন জানাতে পর্যন্ত পারি নি আমি মা'কে কত ভালবাসি।'

এখন, অনিমেষের কথায়, এষার মনে আর একটা শূন্যতার অনুভূতি এল। নিলীনা মিত্র, সৌন্দর্যে অসাধারণ, ব্যক্তিত্বে সাম্রাজ্ঞী, অনিমেষ তাঁর মন ভেঙে না দিলে তিনি হয়তো মরতেন না। বিরাট, বিরাট অপচয়, বিরাট ক্ষতি, কেন না নিলীনা মিত্র একথা শুনতে আর ফিরে আসবেন না।

'আসলে বাবা চাইতেন আমায় গ্রাস করতে। আমি চেষ্টা করতাম বাবার মতো না হতে। ভালবাসা নয়, বলতে পার ঘৃণা আমাদের দুজনকে দুজনের দিকে টেনে রেখেছিল। কিন্তু যখন বাবা বললেন অনী! তখনই আমি বুঝলাম আমার লড়াই ফুরিয়ে গিয়েছে। আমি আর ওঁকে ভালবাসতে পারব না, ঘেন্নাও করতে পারব না।'

'তারপর!'

'বাবা আমাকে ওঁর কাছে রাখতে চান বিভা, ইরাকে উনি একসময়ে একটা ডেসপ্যাচ ক্লার্কের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এখন ইরাকে আঁকড়ে ধরলেন। হঠাৎ মনে হল ওঁর চোখ নষ্ট হওয়াও কিছু নয়, এ রকম একটা অ্যাকটিভ জীবন নষ্ট হওয়াও কিছু নয়, সবই ওঁর সইবে, ইরা যদি কাছে থাকে।'

বিভার দিকে চোখ তুলল অনিমেষ। এখন এষা দেখতে পাচ্ছে অনীদার দু'দিকের রগের চুল পাকা, চোখের পাশে অজস্র ছোট ছোট রেখা, পাতলা দুধের পাতলা সরে যে রকম ভাঁজ পড়ে, ঠিক তেমন।

'সেই জন্যেই তুমি ইরাকে রেখে এলে?'

'আমি বুঝলাম বাবাকে বার্ধক্যে ধরেছে। নইলে কোনোদিনই

তিনি বুঝতে দেন নি, মা-কে দরকার তাঁর, অথবা অন্য কারুকে। হঠাৎ বাবাকে ছিয়াত্তর বছরের মতোই বুড়ো দেখাচ্ছিল, এতদিন মনে হত উনি বুড়ো হন নি। বুঝলাম ইরাকে ভালবেসে উনি অ্যাটোনমেন্ট করছেন। মা'র কাছে, হয়তো আমার কাছেও।'

অনিমেষ একটু থামল।

॥ ১৯ ॥

'সেটা আমার খুব সত্যি মনে হয়নি। বাবা আগে বলতেন উনি কাজ করতে করতেই মরতে চান, বুড়ো হতে চান না। এখনো দেখলাম আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। লতা বউদি কি সব বই পড়ে শোনায়, উনি তাই শুনে নিজের কান তৈরি করছেন, সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পাবেন, নিজের কাজ নিজে করবেন। এখনো ড্রাফটের ডিকটেশান দেন, চিঠিপত্র শোনেন, অফিসের কাজকর্ম বলে দেন। এটাই ভাল। উনি অন্য ধাঁচের মানুষ।'

এষা চোখ তুলল। কোনোদিন অনীদা বাবার সম্পর্কে এত কথা বলে নি।

'প্রাউড। আনবেণ্ডিং। ভাল। ওঁকে আমরা ঐরকম দেখতেই অভ্যস্ত। তার মধ্যে ইরা ইরা বলে ব্যস্ত হওয়াটা, আমার ফ্র্যাংক্‌লি মনে হল হয়তো ভান। মনে হল উনি ভাবছেন ইরাকে আটকে রাখলেই আমি ওঁর কাছে থেকে যাব।'

'কি বলছ অনী!'

'ভান! ভণ্ডামি। বাবার পক্ষে সে সব অসম্ভব মনে ক'র না। বহুদোষ, বহুগুণ, একই সঙ্গে জামাকাপড়ের মতো অবহেলে উনি একই দেহে বহন করেছেন। আমার মনে সন্দেহ রয়ে গেল।'

'তবে ইরাকে রেখে এলে কেন?'

'ইরাকে ?'

অনিমেষ হঠাৎ হাসল। নির্মল, সুন্দর হাসি, শুধু চোখ দুটি হাসল না, চোখ বিষণ্ণ, ঠোঁট হাসল।

'ইরা যে ওখানেই থাকতে চায় বিভা। ইরাদের যে বাড়িটা, অর্থাৎ সুধাংশু নন্দীর যে বাড়িটা পড়ে ছিল, সেটা বাবা কি সুন্দর সারিয়ে টারিয়ে রেখেছেন, ইরা তার একটা ঘরে থেকে বাকিটা ভাড়া দিয়ে দিতে চায়।'

'কেন, অনী ?'

'ইরা আর আমার ঠিক বনল না। ও বোধহয় আমাকে ভালবাসতে পারল না, না না, ও চেষ্টা করেছিল বিভা, খুব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চেষ্টা করে কি…'

'অনী, তুমি সত্যি কথা বলছ না।'

'সত্যি কথা ?'

'অনিমেষকে পালটা জবাব দেবার সময় দিল না বিভা। চেঁচিয়ে বলল, 'ইরা ইজ ইন্‌কেপেব্‌ল অফ্‌ লাভ্‌। হ্যাড শী বীন, তাহলে আমার দাদা কনক এভাবে…তুমি লাইক এ ফুল…ইরা যদি কাউকে কিছুমাত্র ভালবেসে থাকে, সে তোমার দাদা রণজয়। ইয়েস, দ্যাট ব্রুট। সেখানেই ইরা আসলে কি, তার পরিচয় জানাজানি হয়ে গিয়েছে। রণজয় ব্রুট, বর্বর, এখন তার ছেলেমেয়েও বড় হয়েছে, কিন্তু…হ্যাঁ, ইরা অসাধারণ, অনন্য, সুপার সেন্‌জিটিভ, রাবিশ ! হোআইট লাই ! ইরাকে সবাই এত বেশি …হ্যাঁ অনী, সত্যি কথাটা তুমিও জান, স্বীকার করছ না। ইরা তোমায় কোনোদিন ভালবাসে নি, ভালবেসেছিলাম আমি, আমি ·· হ্যাঁ আমি।'

বিভা বেরিয়ে গেল।

অনিমেষের মুখ রক্তশূন্য, এবার মুখ সাদা।

কিছুক্ষণ বাদে অনিমেষ মুখ তুলল, এবার দিকে তাকাল।

'তাই তোর কাছে এলাম এষা। একটু শান্তি পেতে।'

এষা আর অনিমেষ, অনিমেষ আর এষা।

অনিমেষকে এ বাড়িতে এবার বিভা আর তপন দুজনেই এনেছিল।

কয়েকদিন বাদে আবার দু'জনের দেখা হয়ে গেল। আবার গড়ের মাঠে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উলটো দিকে। তপন আনমনে হাঁটছিল, বিভা গাড়ি থামিয়ে বসে ছিল। তপন তার পাশে এসে দাঁড়াল।

দুজনেই একটু অপ্রতিভ, অথচ মুখে হাসি। তপনের আজ বিভাকে দেখে দুঃখ হল।

'তপন, তোমার চোখ ওরকম দেখাচ্ছে কেন? তুমি কি আমাকে করুণা করছ?'

'দুঃখ হচ্ছে বিভাদি।'

'কি আশ্চর্য, তুমি না একসময়ে···আমাকে···' বিভা আর কথাগুলো শেষ করল না। ইচ্ছে করল না। কয়েক বছর আগে এই তপনই তাকে কি নির্মমভাবে শ্লেষ করেছিল। সেই যেদিন এষা তাকে ফিরিয়ে দেয়, সেদিন, মনের দুঃখে।

'হ্যাঁ। কিন্তু দেখছি কি জানেন? একসময়ে আপনাদের সঙ্গে তো যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিল। এখনো বোধহয় আপনাদের একেবারে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারি নি।'

'আমি তা জানি তপন।'

'কিন্তু আমি সে কথাটা ফিরিয়ে নেব না বিভাদি। আপনি একটা অলীক, অবাস্তব ধারণার পেছনে ছুটে ছুটে নিজেকে অপব্যয় করেছেন। অনিমেষকে কি আপনি এত ভালবেসেছিলেন যে সে জন্যে আপনাকে ড্রাগ অ্যাডিক্ট হতে হল?'

'হ্যাঁ তপন।'

আস্তে বলল বিভা, ক্লান্ত চাহনি মাঠের দিকে ফেরাল।

'আমি ওকে ভীষণ ভালবেসেছিলাম, এখনো বাসি। অনিমেষরা সংসারে সর্বনাশ করতে আসে, অন্যদের সর্বনাশ হয়ে আসে। কে এত ভালবেসেছিলাম যে, ইরাকে ও যখন চাইল, তখন যেমন য়ে হোক ওদের মিলন ঘটাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়েছিলাম। দিও, যদিও আমার দাদা কনক যে ইরাকে ভীষণ ভালবাসে, তা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু তপন, এখন মনে হয়, অনিমেষ রাকে শুধু দুঃখই দিয়েছে, এর চেয়ে হয়তো দাদা ইরাকে সুখী রতে পারত। আর যা হোক, দাদা অনীর মতো এগ্‌জ্যাক্‌টিং য়।'

'আমাকে আপনি এ সব কথা বলছেন কেন বিভাদি? আমি কে? আমাকে আপনি চেনেনই বা কতটুকু?'

'তুমি তপন। তুমি কয়েকবছর আগে এষাকে ভালবেসেছিলে, আমাদের সার্ক্‌লে চলে এসেছিলে। তা ছাড়া, ঐ যে কয়েকটা নির্মম কথা বলেছিলে, ট্রাজিডীয়েন্‌, হেন তেন, ওরকম সত্যি কথা আমায় কেউ বলে নি তপন। তা ছাড়া, তুমি তো এষাকে এখনো ভালবাস।'

'না বিভাদি।'

'সে তোমার চোখ দেখেই বুঝলাম। কিন্তু তপন, তুমি বুঝে দেখ, অনীকে ভালবাসা আমার কি রকম অভ্যাস হয়ে গেছে। এতদিন হয়ে গেল, কত সময়ে ভাবি ঘুম থেকে উঠলে ওর কথা ভুলে যাব, কাজ নিয়ে মেতে থাকলে বুকের নিচে ওর চিন্তা থাকবে না। কিন্তু কিছুতে ভুলতে পারি না তপন, শরীরে এমন কষ্ট হয়!'

বিভার মুখ ক্লান্ত, করুণ, অসহায়। চাহনি বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত। শুধু অপেক্ষা করে করে বিভার জীবনের উষ্ণ ঋতুগুলি চলে গিয়েছে, আসলে কোনোদিন কেউ তাকে কোনো উৎসব আয়োজনে অংশ নিতে ডাকল না। আজ সবগুলো দিন পার করে দিয়ে এসে বিভা যদি ক্লান্ত না হয় তবে ক্লান্ত হবে কে?

'বিভাদি, আমাকে এ সব কথা বল না, আমি···'

তপনের বলতে ইচ্ছে হল আমি সাধারণ, অতি সাধারণ। এষার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, অপমানে জর্জর আমি, অন্য কোনো দিকে নিজেকে অপব্যয় না করে চাকরির উন্নতির চেষ্টা করতে লাগলাম। এখন উন্নতি করেছি, আমি এখন সেই কোম্পানীর কর্মচারী, যারা ছাঁট লোহা জাপানকে বিক্রি করে, আর ঝকঝকে সব যন্ত্রপাতি। আমাকে এসব কথা বল না তুমি।

'তোমাকে বলছি তপন, কেননা তুমি এখনো এষাকে ভালবাস।'

'না। আমি, আমি চলি বিভাদি।'

'অনীকে আমি একদিন ইরার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম তপন। সে অনেক, অনেক আগে। আমাদের জেনারেশনটা ছিল রোমান্টিক, ছটফটে, ওভারসেন্‌জিটিভ। ঐন্দ্রিলা বলত আমরা ট্র্যা টাচি, আমাদের দিয়ে কিছু হবে না। দেখিস, কবিতা টবিতা লিখবে অন্যরা। সেই ঐন্দ্রিলা, যে আশ্চর্য সুন্দরী ছিল, সূর্যটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বলে যে বাইশ বছর বয়সে লেকে ডুবে মরে গেল। সে বলেছিল।' বিভা আবার গলা পরিষ্কার করল।

'লস্ট জেনারেশান, স্যুইসাইড জেনারেশান। আমরা কবিতা লিখি নি তপন, উই উড রিসাইট। ডু ইয়্যু রিমেম্বার অ্যান্ ইন্ মিরাণ্ডা। ডু য়্যু রিমেমবার অ্যান্ ইন্ ? অথবা সাইওনারা, কিংবা অন্য কিছু। আমাদের স্টুড্ন্ট লাইফেই একদিন হিরণ দাশ মোটর হাঁকিয়ে চৌরঙ্গীর ট্রাফিক আটকে দিয়ে ঐন্দ্রিলাকে 'বনলতা সেন' শুনিয়ে পুলিশকে ফাইন দিয়েছিল তপন, তুমি বলবে আমরা অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর, অপব্যয়। হয় তো তাই, কিন্তু অনীকে ভালবেসে আমি একদিন ইরার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। এবার এষার কাছে পৌঁছে দিলাম। আমি হয় তো মেরুদণ্ডহীন, বোকা, অপদার্থ। মাঝে মাঝে, অনীকে ওর ডেস্টিনিতে পৌঁছে দিয়ে যাই. কিন্তু তুমি, তুমি কেন সেদিন এষাকে বিয়ে করলে না তপন ?'

বিভার গাল বেয়ে জল নামল। তপন নির্বাক। তার বুকে তীব্র, তীক্ষ্ণ বেদনা এফোঁড় ওফোঁড় করে বিঁধছে আর বিঁধছে। এষাকে সে তো ভুলেই গিয়েছে, তবে আজ ব্যথা লাগে কেন ? এষা কি তবে অনিমেষকে···?

'তখন, তখন হয় তো এষা ওকে ভালবাসত না। কিন্তু এখন ? এখন কি এষা ওকে···?'

'আপনি যদি এষাকে বলেন, যদি ওর দিকে চেয়ে···?'

'ওর দিকে চেয়ে ?'

বিভা মাথা নাড়ল, 'এষাকে আমি কি বলব তপন ? তোমাকে বলি নি, অনী অন্যের পক্ষে সর্বনাশ ? অনীর যাবার একটাই জায়গা আছে, সে ওর বাবার কাছে। ও চিরদিন ওর বাবার হাত থেকে পালাচ্ছে।'

'কেন ?'

'কেন না ও ওর বাবার স্প্লিট ইমেজ। ওরা দুজনে দুজনের কাছে ভীষণ, ভীষণ প্রয়োজনীয়। কিন্তু অনী কিছুতেই সারেণ্ডার করবে না, যতক্ষণ না······'

'কি ?'

'যতক্ষণ না ওর ভালবাসার এক্সপেরিমেণ্ট সম্পূর্ণ হয়। আমি কি জানিনা এষাও ভীষণ, ভীষণ দুঃখ পাবে ? কিন্তু এ কি বলছি ? অনী ইজ নট দ্যাট ব্যাড তপন। তুমি আমার কথায় কিছু মনে কর না।'

সেদিন বাড়ি ফিরে তপন হঠাৎ মন স্থির করল এবার বিয়ে করবে। মনের কোথায় ছিল, কোথায় ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু অনিমেষকে দেখে, আর বিভার কথা শুনে এতদিনে তার মনের কোথায় যেন কি কেবলই ভাঙতে লাগল আর ভাঙতে লাগল। সে-ও ভালবেসেছিল এষাকে, এত ভালবেসেছিল, যে এখনো অন্য মেয়ের দিকে চাইতে পারে না সে, মনে মনে-ও বিশ্বাসঘাতকতা করে না তার স্মৃতি।

ওরা আলাদা জাতের, ওদের কথা আমার ভাবা উচিত হয় নি তপন ভাবল। এতদিন বাদে আবার কি ভীষণ যন্ত্রণা আ কাউকে বলবার নয়, কিন্তু মনের নিচের মনে কি আশাই ছিল ন যে এষা তার কাছে এসে দাঁড়াবে আবার ? কিন্তু বিভা আজ কি কথা বলল ?

'মা !' তপন বাড়িতে ঢুকে একটু অস্বাভাবিক, একটু চড়া গলায় ডেকে উঠল। আজ মা-কে ডাকতেও বড় কষ্ট. কেননা মা কিছুই বুঝবেন না, কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতি, তীব্র বেদনা নয়। এষার প্রতি তপনের বিশ্বস্ততাকে এতদিন তিনি হিংসা করেছেন, মনে করেছেন তাঁর প্রতি অপমান। আজ তিনি জিতে গেছি মনে করে উল্লসিত হবেন, কিন্তু তপন তাঁকেই বা বোঝায় কি করে এতদিনে নিজেকে সে ভয় পাচ্ছে। যেমন তেমন একটা নিয়তির হাতে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে সে, সেই জন্যেই বিয়েতে রাজী হওয়া কিন্তু বুঝিয়ে কি হবে, লাভই বা কি !

'মা !' তপন তাঁর সাদা থানের নড়াচড়া দেখতে পেল। যেহেতু বিধবা হয়েছেন. সেহেতু সংসারের কাছে, সন্তানের কাছে তাঁর অনেক বেশি প্রাপ্য এ ধারণা তাঁর চিরদিনই আছে। আজ বিদ্রোহী প্রজার কাছে রাজকর নেবার মতো উল্লাসের ভঙ্গীতে তিনি এসে দাঁড়ালেন।

'মা, আমি বিয়ে করব,' তপন বলল। সঙ্গে সঙ্গে, কে যেন ঘুসির মতো তার বুকে ধাক্কা মারল।

'তোমরা যাকে ঠিক করবে তাকেই,' সে আবার বলল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঙ্কের বোধ। সে বিভার মতো হতে চায় না। এখন মনে হচ্ছে সে-ও হয়তো এষাকে খুব বেশি ভালবেসেছিল, নইলে এতদিন বাদেও কষ্ট হচ্ছে কেন ?

'মা, তুমি যাও,' সে রুদ্ধগলায় বলল। মা বেরিয়ে গেলেন পেছনে তাকাতে তাকাতে গেলেন। তপনের চোখমুখের অ স্বাভাবিকতা তাঁর চোখে পড়েছিল।

ভগবান্, আমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা কর, এষার দিন ও রাত প্রার্থনায় ভরে গেল, কিন্তু এ-ও সে জানত, হয়তো সে রক্ষা পেতে চায় না।

অনিমেষ দেখতে পাচ্ছিল ভয়ানক অস্থির এষা, বড় চঞ্চল। দেখে দুঃখ পাচ্ছিল সে। চায় নি সে, এষাকে এমন অস্থির দেখতে চায় নি।

'আমি ওকে এমন অস্থির দেখতে চাই নি বিভা।'

'তুমি এখানে এলে কেন অনী?'

'এখানে এসে তখন যে ভারী শান্তি পেয়েছিলাম।'

সেই জন্যেই যদি, কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মনে করে ফিরে এলে আবারও শান্তি পাবে তাহলে তাকে আর বলবার কি আছে।

তা ছাড়া, বিভার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল, তুমি শান্তি চাও, শুধু চাও। কিন্তু তুমি কি কাউকে শান্তি দিয়েছ কোনোদিন? কোনোদিন ভেবে দেখেছ যে তোমার কাছে থেকেও কেউ শান্তি পায় নি?

'ও সব জিনিস এক তরফা হয় না অনী।'

'তার মানে?'

বিভার বলতে ইচ্ছে হল তোমার কি নিলীনা মিত্র-র কথা মনে পড়ে? তুমি কি বিজয় মিত্রর কথা ভাব? ইরা তোমায় ভালবাসে না আর কারুকে, তা কি কখনো ভেবে দেখেছিলে? বলতে পারল না, সঙ্কোচ হল।

'তুমি এখানে কেন আছ অনী?'

'থাকতে ভাল লাগছে না বিভা।'

'একটা কথা বলব?'

'কি?'

'আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'যেখানে ইচ্ছে। যেখানে বলবে আমি সেখানেই যাব অনী।'
বিভার মনে হল অনিমেষ যদি রাজী হয়, তা হলে একটা সর্বনাশ হয় তো ঠেকানো যেতে পারে।

'কোথায় যাব? এখন যাবই বা কি করে? মাসিমারা কয়েক-দিনের জন্যে পুরী যাচ্ছেন জান না?'

'পুরী যাচ্ছেন! তোমাকে রেখে?'

'না গিয়ে কি করবেন? জীবনেও ওঁরা বাইরে যান নি, ছুটি নেন নি মেসোমশায়। এবার ডাক্তার বলেছে উনি যদি বাইরে না যান, অন্তত পনেরো দিনের জন্যে হাওয়া না বদ্‌লান ··এ কি বিভা, তোমার মুখ ও রকম হয়ে গেল কেন?'

'এষা যাচ্ছে না?'

'কি করে যাবে? ওর ভাইবোনরা আছে না?'

'তুমিও আছ।'

'আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম বিভা, দেখলাম ওঁরা আমাকেই বিশ্বাস করে বাড়ির ভার দিয়ে যেতে চান, তুমি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। অনী, আমার কোনো কথা তুমি কোনোদিনই শোন নি, তবু বলছি তুমি চলে গেলে ভাল করতে। তপন এষাকে এখনো ভালবাসে অনী!'

'তপন এষাকে ভালবাসে!'

অনিমেষের এতদিনে মনে হল বিভা বোধহয় সব বুঝতে পারে না। বিভার কোথায় কোথায় যেন সব বুঝবার গোলমাল আছে। তপন এষাকে ভালবাসে!

'সে তো ভাল কথা বিভা। সে তো আনন্দের কথা।'

বিভার ইচ্ছে হল অনিমেষকে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দেয় কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। কিন্তু কাকে বোঝাবে? কেমন করে বোঝাবে? অনিমেষ হয়তো এখনো জানে না এষা তাকে ভালবাসে। এষার বাবা মা'কে যেতে বারণ করবে? ওঁরা যে চিরদিন অনিমেষকে

বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু বিভা এ সব কথাই বা কেন ভাবছে? সত্যি সত্যিই অনিমেষ কোনো অন্যায় করেছে কি? ও যে এষার চেয়ে অনেক, অনেক বড়। তা ছাড়া ওর ভদ্রতা, সৌজন্য, মানুষকে সৎ দেখবার, শুদ্ধ দেখবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এর কোনটি বা ভুলে যাবে বিভা? ওকে যে এষা ভালবাসে, তা হয়তো ও জানে না, তার সঙ্গে অনী চলে গেল না কেন? জীবন এত জটিল কেন। সে এষার কথাই বা এমন করে ভাববে কেন? করুক, এষা তার ভাগ্যের লেখা পরিপূর্ণ করুক।

'তোমার হাতে কি বিভা?'

আঙুর, খেজুর, কাজুবাদাম সবাই মিলে গল্প করতে করতে খাব বলে কিনেছিলাম। আঙুর খাবে অনী?'

বিভা তাড়াতাড়ি একটা কাচের বাটি নিয়ে এল। বাটিটার সাদা গায়ে হলদে, নীল ফুল আঁকা। তার জন্যে তার দাদা কনক কিনে এনেছিল। কোথায় চলে গেল কনক, কি হয়ে গেল তাদের জীবন, বাবা মা তো দিব্যি আছেন তাঁদের দৌহিত্রকে নিয়ে। গর্ভের সন্তানদের জীবন অপূর্ণ থেকে গেল, অস্বাভাবিক হয়ে গেল, সে জন্যে মার একটি রাতের ঘুমেও ব্যাঘাত ঘটেছে কি?

'রক্তের বন্ধন-টন্ধন কথাগুলোর কতটা সত্যি, কতটা বানানো, ভেবে পাই না অনী।'

মাঝখান থেকে সে আর কনক—কিন্তু এখন এ সব কথা ভেবে কি হবে? মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, দাদার কথা তার কতটুকু মনে পড়ে?

'দাদার কথা আমার মনে পড়ে না অনী, যদিও এই বাটিটা দেখে...'

বিভা কথা শেষ করল না। তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল, কালো আঙুরে, হলদে কাচে চিকচিক করতে লাগল।

আর, এষা, অনিমেষের কাছে এসে দাঁড়াল তারও কয়েকদিন পর।

অনিমেষ ভয় পাবার পর।

ভয়ানক ভয় পেয়েছিল অনিমেষ, ভয়ে তার ভেতরটা পাথর হয়ে গিয়েছিল।

এষার ঘুম হত না রাতে। বারান্দায়, ছাতে, সে হেঁটে বেড়াত। একতলার ঘরে বসে অনিমেষ তার পায়ের শব্দ শুনতে পেত আর ভয়ে তার ভেতরটা থমকে থাকত।

কেননা, অনেক, অনেকদিন পরে হঠাৎ অনিমেষ বুঝতে পেরেছিল সে এষাকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই হয়তো এষার কাছে ফিরে এসেছে।

'আমায় তুমি ভালবাস নি অনী,' ইরার গলা মনে পড়ত।

'অনী, তুমি আমার কাছে এস,' নিলীনার মৃত, অতীত কণ্ঠস্বর।

'অনী, মাই সন, মাই সন, আই ওয়াণ্ট য়্যু,' অন্ধ বিজয় মিত্র, পরাজিত ধৃতরাষ্ট্র, পরাজিত সন্তানকে, শুধু সন্তানকে চান।

'অনী চল চলে যাই,' বিভার ক্লান্ত করুণ কণ্ঠস্বর, বিভার চোখে জল, কিন্তু এতদিনে প্রতিটি ধাঁধার উত্তর মিলে যাচ্ছে, সব বুঝতে পারছে অনিমেষ। চীনে ধাঁধার বাক্সের মতো যেখানকার যে টুকরোটি, সেটিই ঠিক জায়গায় বসে যাচ্ছে।

এষাকে সে ভালবাসে, এষার মধ্যে তার মন শান্তি পায়, আশ্রয় পায়। অনেক, অনেকগুলি মানুষকে অসুখী করেছে অনিমেষ, এখন তাকে শাস্তি নিতে হবে।

তাই, এষার পায়ের শব্দে চমকে উঠত অনিমেষ। ভীষণ ভয় পেত। সতীশ চলে এলেই সে চলে যেতে পারে, সতীশ তাকে বিশ্বাস করেন।

এষা, তিন চার রাত বাদে, এক রাতে নিচে নেমে এল, অনিমেষের দরজায়, দাঁড়াল।

অনিমেষ নির্বাক, চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করল, কিন্তু কি মমতা হয়, কি নরম বয়স ওর, কি বিশ্বাস ওর চোখের চাহনিতে।

'ভেতরে আয় এষা।'

ঘুমে পাওয়া মানুষের মতো এষা ভেতরে এল, চেয়ারে বসল। এখন তার উজ্জ্বল, সুন্দর সুঠাম ঘাড়ে, গলায়, পিঠে চুলগুলো ছড়িয়ে গিয়েছে, চোখের চাহনিতে প্রশ্ন।

'অনীদা!'

'বল্।'

'আমি তোমায় আগে ভালবাসতাম না। তপন ভুল বলেছিল।'

'এখনো বাসিস না এষা। তুই এখনো ভুল করছিস।

'আমি ভুল করছি? তোমার বুকে হাত রেখে তুমি একথা বলতে পার?'

না, তা পারে না অনিমেষ। কিন্তু এতদিন বাদে মার মুখ মনে পড়লে, আরো অনেক মুখ, বিচূর্ণিত প্রতিমার সার যেন সব, বড় উদ্‌ভ্রান্ত অনিমেষ, বড় অস্থির, একদিকে একটু স্নেহ-মমতার জন্যে ছুটে বেড়িয়েছে, আর অনেক স্নেহমমতা ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে অন্যদিকে, আজ তাই বলে অনিমেষ নতুন কোনো অন্যায় করবে না।

'এষা তুই আমার কথা শুনবি?'

'শুনব।'

'তোর বুঝতে ভুল হচ্ছে, ভীষণ ভুল হচ্ছে। আমি তো তোকে কোনো রকম ভুল বোঝবার অবকাশ দিই নি এষা।'

'দাও নি বটে, কিন্তু ইরাদিকেও তুমি ভালবাস নি অনীদা।'

'কে বলল?'

'আজ মিছে বলে কি হবে অনীদা? তা ছাড়া, তুমি যখন এসেছিলে, তোমরা যখন চলে গেলে তখন কি আমি খুবই ছোট? তা যদি হবে তবে তুমি কেন আমার পৃথিবী আচ্ছন্ন করে রাখলে

অনীদা? কেন তোমাকে ছাপিয়ে, তোমাকে ছাড়িয়ে, আর কাউকে দেখতে পেলাম না? তপন বলেছিল আমি অবসেস্‌ড। হয়তো তাই। সেইজন্যে, তোমার দিকে আমার চোখ ছিল বলেই কি, তপন এত কাছের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ওকে আমি দেখতে পেলাম না?'

'ভুল করেছিলি এষা।'

'ভুল করেছিলাম। হয়তো তাই। কিন্তু তাই বলেই কি আজ তুমি আমায় এড়িয়ে যেতে পার?'

'আর কি বলব এষা?'

'অনীদা, তোমার জন্যে আমি তপনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তোমার জন্যে বিভাদি···তুমি তো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে জানতে না অনীদা। আজ কেন এ কথা বলছ?'

'এষা ওপরে যা, রাত হয়েছে। চল্‌ আমি তোকে নিয়ে যাচ্ছি।'

অনিমেষ ওর হাত ধরে ওপরে নিয়ে চলল।

'অনীদা, ছাতে চল।'

'না এষা, ঘুমোতে যা।'

সেদিন এষাকে কাছে আসতে দেয় নি অনিমেষ, কিন্তু তার পরের দিনও এষা নেমে এল, তারও পর দিন।

অনেক পরে, ইরা যখন আর ফিরে এল না, অনিমেষকে জানিয়ে দিল সে আর ফিরবে না, তখন অনিমেষের মাঝে মাঝে মনে হত কেমন করে সে জোর পেয়েছিল এষাকে ফিরিয়ে দেবার।

'কেমন করে জোর পেয়েছিলে অনী?'

এ প্রশ্ন বিভাও করত। হ্যাঁ, অনেক অনেক পরে বিভা অনিমেষকে পেয়েছিল। যদি তাকে পাওয়া বলে। জীবনের বহুপথ বৃথা ভ্রমণের পর, অন্বেষণের শেষে, অনিমেষ তখন ক্লান্ত, জীর্ণ, অথচ অনিমেষ তখনো প্রতিমা খুঁজছে। ভালবাসার প্রতিমা, নিটোল, শুদ্ধ, সৎ মানুষের প্রতিমা, কোথাও না কোথাও আছে সে প্রতিমা, মানুষের ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যেই আছে, অনিমেষ তা জানত।

সেই সময়ে বিভাকে সে কাছে ডেকে নিয়েছিল। বলেছিল, 'বিভা, তোমার উপর আমি সুবিচার করি নি। তবু, আজ আমার তোমাকে বড়ই প্রয়োজন।'

সেদিন আর বিভার জীবনের এ পরিণতি দেখবার জন্যে এষা কাছে ছিল না। তবু বিভা ইতস্তত করে নি, চলে গিয়েছিল।

জানি না, কাহিনী, যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারও পরের, অনেক পরের কথা বলে যাওয়াটা ভুল অথবা ঠিক। কিন্তু এষা আর অনিমেষ, এষা আর তপন, অনিমেষ আর বিভা, এদের আজকের কাহিনীর সঙ্গে ভবিষ্যতের সেই অনেক পরের কাহিনীটার একটু যোগ আছে বই কি।

সেই প্রশ্নই বিভা করত।

'একবার তো খুঁজে পেয়েছিলে অনী, যাকে চাও, তাকে পেয়েছিলে। সেদিন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে কিসের জোরে?'

'তাকে যে আমি ভালবেসেছিলাম বিভা।'

অনিমেষ তখন প্রায় বৃদ্ধ, বিভাও তাই। এষার কথা বলতে তখনো অনিমেষের কষ্ট হত। তারপর ওদের কথা ফুরিয়ে যেত। ওরা শুধু মুখোমুখি বসে থাকত। বৃথা অন্বেষণ, আর বিফল জীবনের গ্লানি ওদের মাঝখানে পথের মতো বিছিয়ে থাকত। সব পথই কি পেরোন যায়?

হ্যাঁ, ভালবাসাই অনিমেষকে জোর দিল।

সেদিন সকালে সতীশের চিঠি এসেছে, ওঁরা দু'দিন পরে এসে পৌঁছচ্ছেন।

রাতে এষা নেমে এল। বলল, 'অনীদা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'কোথায়, এষা?'

'আচ্ছা অনীদা, তুমি আর আমি, যদি কোথাও চলে যাই,

তা হলে কি আমরা সুখী হতে পারি না! তুমি আমায় এই বিশ্বাস করতে বল?'

অনী বুঝল আজ তাকে এষার প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে। সে আস্তে বলল, 'তাতে কি লাভ হবে এষা?'

'জানি না,' এষা চাপা, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল। তারপর অস্থির হয়ে বলল, 'কেন তুমি এসেছিলে, কেন তুমি আমায় বন্দী করে রেখেছ, আমি তোমার মধ্যে ইম্‌প্রিজন্‌ড অনীদা। কেন তুমি আমার যন্ত্রণা দেখতে পাচ্ছ না! এখন আমি বুঝতে পারছি আমার মা বাবার মধ্যে ভালবাসা ছিল না, কোনো স্থায়ী ও গভীর ভালবাসা। তুমি এলে, তুমি বললে এ বাড়ির প্রতিটি লোক ভালবাসা না পেয়ে ভুগছে। সেই থেকে আমি যেন তোমার মধ্যে, তোমাকে ছাড়া··· তপনকে আমি গ্রহণ করতে পারি নি অনীদা···তুমি আমার কথা একটু ভাব।'

'তোর কথা!'

অনিমেষের একবার মনে হল এষার কথা শুনলে কি দাঁড়ায়। সত্যি সত্যিই তো তাদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই আর ইরা তাকে কোনোদিন ভালবাসে নি। তার আর ইরার জীবন একটা মস্ত বড় ব্যর্থতা। এষা হয়তো তাকে শান্তি দিতে পারত, ভালবাসা দিতে পারত। এষাকে ভালবেসেও কত শান্তি। হয়তো, তাহলে আর অনেক যন্ত্রণা থাকে না, অনেক অশান্তি মুছে যায় মন থেকে। 'তোর কথা আমি ভেবেছি এষা। তুই যা বলছিস, তাতে হয়তো কিছুদিনের জন্যে শান্তি পাওয়া যায়।'

'কিছু দিনের জন্যে।'

'হ্যাঁ এষা। তুমি এখন এত অনভিজ্ঞ, এত তরুণ, তুমি ভাবতে পার শুধু তোমার ভালবাসা দিয়েই তোমার আমার একটা পৃথক পৃথিবী হতে পারে।'

'হ্যাঁ অনীদা।'

'আমি তা কেমন করে ভাবব এষা ?'

অনিমেষ মাথার চুলগুলো টানতে লাগল। অজস্র, অজস্র রূপালা চুল, চোখের নিচে কালি।

'অনীদা, সেই কবিতাটা মনে পড়ে? আমার বই-এ লিখে দিয়েছিলে ?'

'মনে পড়ে বই কি।'

'ডু য়ু রিমেম্বার।'

'অ্যান্ ইন্ মিরান্দা ? মনে পড়ে এষা। তখন তুই ছোট ছিলি।'

এষা হাসল। এখন সে বুঝতে পারছে অনিমেষও তাকে ভাল-বাসে। অনিমেষের ভালবাসা আলো অথবা উত্তাপের মতো তার দিকে প্রসারিত হচ্ছে। অনিমেষ তাকে ভালবাসে, আঃ, কি শান্তি। এখন সে সব পারে, বাবা মা-কে আঘাত দিতে, সকলকে তুচ্ছ করে চলে যেতে, অনিমেষ তাকে ভালবাসে। হয়তো, হয়তো, সেদিনও অনিমেষ তাকে ভালবাসত, এখন এষা বুঝতে পারছে তপনকে সে হয়তো কোনোদিনই ভালবাসেন নি। এই ঝড়, এই যন্ত্রণা, এই আর্তনাদ, এর নাম ভালবাসা। এই যখন তার নিয়তি, তবে তাই হোক। অনীদা, তোমার মাথার চুল পেকে গিয়েছে, মুখে নেমেছে রেখা ? আমার তারুণ্য আছে, আমার যৌবন আছে, আমি তোমার চলবার পথে হৃদয় পেতে দিয়ে, হৃদয় পেতে দিতে দিতে, অনীদা কি বলছে ?

'এষা, আমার সব কবিতা মনে আছে।'

অনিমেষ ঈষৎ হাসল। যেন সে বলেছে তার পড়া মনে আছে। যেন সে ইস্কুলের পুরোনো পড়া ভোলে নি।

'আমার সব কবিতা মনে আছে, এষা, আরো অনেক কিছু মনে আছে, যা তোর মনে নেই। মনে থাকবার কথা নয়। তোর পনেরো বছর বয়সের চেহারা মনে আছে। যেদিন ইরার সঙ্গে চলে যাই, সেদিন তোর চেহারাটার কথাও মনে পড়ে।'

'তুমি তখন অন্ধ হয়েছিলে।'

'তোরা তাই বলিস। কিন্তু যদি অন্ধই হয়ে থাকব, তাহলে এত কথা আমার মনে থাকল কি করে এষা? যাকগে, আরো একটা কথা শোন্।'

অনিমেষ ওর হাত ধরল, পাশে বসাল।

'তোর সঙ্গে, আজ মনে হয়, শুধু তোর সঙ্গেই আমি সুখী হতে পারতাম। তোর মধ্যে কোথায় যেন আমার মা একটু আছেন. দাঁড়া একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি।'

'বল।'

'আমার মা, ইরার বাবা সুধাংশু নন্দীকে একসময়ে ভালবাসতেন। যখন ওঁদের বয়স কম ছিল। সুধাংশু নন্দী কিন্তু ইরার মা আরতিকে ভালবাসলেন, মা-ই ওদের বিয়ে দেন। কিন্তু মা'র মধ্যে কোথায় যেন ওদের ওপর দুর্বলতা ছিল। ইরাকে বোধহয়, সেই জন্যেই আমি সুখী করতে চেয়েছিলাম। আসলে আমাদের মধ্যে কোথায় কোথায় বাবা মা'র ইমেজ থেকে যায়, থেকে যায় তার প্রতি বিশ্বস্ততা। আমরা বোধহয় কোনো একটা প্রিডেস্টাইন্ড প্যাটার্ন পূরণ করি, অথচ ভাবি যে খুব নতুন একটা কিছু করছি।'

'এসব কথা বলছ কেন?'

'একদিকে মা, অন্যদিকে বাবা, দুজনকেই আমি ভীষণ ফাইট করেছি এষা, তবু, তবু আমি বলব, আমার এই একদিকে ভালবাসা খোঁজা, অন্যদিকে ভালবাসাকে পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে যাওয়া, এই অস্থির উন্মত্ততার কথা স্বীকার করেই আমি বলব, তুই আর আমি সুখী হতে পারতাম।'

'জানি।'

আজ জেনে কি আনন্দ অনীদা, আজ অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে সব। সোনালী আলোয় স্নান করছি আমি, এর নাম স্বস্তি নয়, তৃপ্তি নয়, আরো কিছু, তপন, তোমায় আমি ভালবাসতাম না।

'আমি আর তুই সুখী হতে পারতাম এষা। কেননা মাকে আমি যেভাবে দেখতে চাইতাম, তার খানিকটা তোর মধ্যে কোথায় যেন আছে। ইরা যে রকম হলে আমার ভাল লাগত, তারও খানিকটা তোর মধ্যে কোথায় যেন আছে। তা ছাড়া, তুই-ই একমাত্র আমার কাছে সারেণ্ডার করেছিলি, তোর ব্যক্তিত্বকে সারেণ্ডার করেছিলি, ইরা আমায় বাধা দিত, রেজিস্ট করত, ফ্রোজ্ন পার্সোনালিটি।'

'তবে অনীদা, তবে তুমি 'করতাম', 'হতাম' বলছ কেন? আমাদের ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে তাকে অতীতে ঠেলে দিচ্ছ কেন?'

'কেন তা জানিস এষা?'

অনিমেষ একটু নিচু হল; এষার কপালে, চুলে হাত রাখল। মোটা, স্থির আঙুল, আঙুলে চুরুটের গন্ধ।

'কেননা আমি আর তুই সে সব কিছু করব না। যে যাই বলুক আমি জানি আমি তোর ওপর ব্যাডইনফ্লুয়েন্স্ নই, কোনোদিন ছিলাম না। আমি চলে গেলে হয় তো তুই তপনকে…'

'অনীদা, এ সব কথা বল না।'

'বেশ তা নাই বললাম এষা। কিন্তু তুমি জান ইরা আছে আমার জীবনে।'

'ইরাদিকে তুমি ভালবাস না অনীদা।'

'না ভালবাসলেও দায়িত্ব থেকে যায়, কর্তব্য থেকে যায়। বিভাকে ভাল না বেসে আমি ওর জীবনটা নষ্ট করেছি, ইরাকে ভালবাসি মনে করে ইরার জীবন নষ্ট করেছি, এখন তোকে……'

'তুমি আমায় ভালবাস অনীদা।'

'হয়তো এটাই সত্যি ভালবাসা, যে ভালবাসার জন্যে মানুষ অপেক্ষা করে, কিন্তু এষা সো মেনি বাস স্টপ্স্। কোনটা আমার, কোথা থেকে উঠলে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছব তা জানতাম না বলে, আমি আর কতবার মানুষকে কষ্ট দেব?'

এষা কাঁদতে লাগল।

'তুই বলেছিলি তোকে মুক্তি দিতে। তোকে আমি মুক্তি দিচ্ছি এষা। আমাকে তুই ভুলে যা।'

এষা চোখ তুলে তাকাল। বড় অস্থির দেখাচ্ছে অনীকে। কপালের দু'পাশের শিরা দড়ির মতো ফুলে উঠেছে। অনিমেষের গলা চাপা, বিকৃত, দেহের যন্ত্রণায় যেমন হয়।

'ভুলে যা আমাকে। আমাকে দেবতা মনে করে করে তোর ভুল হয়েছে। আমি দেবতা নই। ইরা, ইরা আমার দুটি সন্তানের মা হয়েছিল। তারা সারভাইভ করে নি। কিন্তু তবু ইরা···এষা আমায় ভুলে যা!

'তাতে কি হয়েছে অনীদা?'

এষার এখন ইচ্ছে হল আরো অনেক কথা বলে। নৈতিকতার কথা নয়। অনীদা, আমি তোমাকে তবু ভালবাসি। অনেক, অনেকদিন তুমি আমার পৃথিবী হয়ে আছ।

'আমি ছিলাম বলে তপন তোর কাছের ভালবাসা, তাকে তুই দেখতে পেলি না। না না, আমি তোর ভাল করতে পারব না এষা, তুই আমায় ভুলে যা।'

ঠিক তখনই তারা ঘণ্টা শুনতে পেল। দূরের নয়, কাছের। কে ঘণ্টা বাজিয়েই চলেছে, বাজিয়েই চলেছে। এষা আর অনিমেষ দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাল। অনিমেষ বুঝল এখন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেওয়া মানে চিরদিনের মতো এষার জীবন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কেননা এ ঘণ্টার মধ্যে কি যেন ছিল। কি যেন জরুরী সংবাদ।

অনিমেষ দরজা খুলে দিয়েছিল সে রাতে। দরজা না খুলে দিলে সে এষার কাছে আত্মসমর্পণ করত, তখনই করত। সে-মুহূর্তের আত্মসমর্পণের দুঃসহ স্পর্ধা, অথবা সাহস, অথবা দুঃসাহস, তাদের অন্য কোথাও টেনে নিয়ে যেত। অজস্র যন্ত্রণায় বিদ্ধ

করতে করতে তবু দিত কিছু কিছু অমৃত মুহূর্ত। তখন যদি অনিমেষ দরজা না খোলে, তাহলে সহজ হয়ে যায় সব। তারা দু'জন সুখী হতে পারে, আর অনিমেষের মতো এ কথা আর কে জানে দু'জন মানুষ সুখী হওয়া সত্যিকারের সুখী হওয়া এ সংসারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সকলকে সুখী করা যায় না। এ কথা তার মতো আর কে জানে। সে জানত এষা তাকে সব দিতে পারে, জানত ইরা আর কোনোদিন তাকে ভালবাসবে না।

অনিমেষ দরজা খুলে দিয়েছিল।

পিওনের হাতে দুটো তার ছিল পুরী থেকে সতীশের তার, তাঁরা আসছেন। রায়পুরের তারে লেখা ছিল ফাদার সিরিয়াস্। দাদা।

অনিমেষের কথা রেখেছিল এষা, তপনের কাছে গিয়েছিল। যেতে একটুও দেরি করে নি।

তপনও বলল তপন তাকেই ভালবাসে। কিন্তু এষাকে আর কোনোদিন সে গ্রহণ করতে পারবে না। 'কোথায় যেন কি ভেঙে গিয়েছে এষা। আমি তোমার খুব কাছে ছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দু'পা ফেললেই দেখতে পেতে, এতই কাছে। কিন্তু তুমি আমাকে দেখনি এষা, দেখতে পাও নি।

'প্রতীক্ষার, ভালবাসার, প্রতিটি অনুভূতির এক একটি বিশেষ ঋতু আছে। এষা, আমার ঋতু চলে গিয়েছে।'

এষার চোখ পড়ল তপনের বাড়িতে চুনকাম হচ্ছে, উৎসবের আয়োজন। 'ভাল থেক তপন', সে আস্তে বেরিয়ে এল। কৃতজ্ঞ সে, তপনের কাছে কৃতজ্ঞ, অনিমেষের কথা রাখতে তার কাছে যাওয়া, নইলে তপনকে সে ভালবাসে নি, ভালবাসতে পারে নি। হঠাৎ তার স্টেশনে যেতে ইচ্ছে হল, হাওড়া স্টেশনে। কেন ইচ্ছে হল তা সে জানে না।

এখন মনে হল অনিমেষকে এড়াতে চায় বলে সকালে বেরিয়ে এসেছিল সে তপনদের বাড়ি। অনিমেষ হয়তো এখনো যায় নি, এখনো ওর ট্রেন হয়তো প্ল্যাটফর্মে আছে। ইচ্ছে হল ছুটে যায়, বলে তপনও আমায় নিলে না অনীদা, তুমি আমায় ফেলে যেও না।

হাওড়া প্ল্যাটফর্মে অনিমেষের ট্রেন ছিল না, শুধু বিভা ছিল। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। একজনকে অনী ভালবাসে নি, একজনকে ভালবেসেছে, অথচ দু'জনেই শেষ অবধি মুখোমুখি।

'বাড়ি চল, এষা।' বিভা বলল।

'একটু দাঁড়াও।'

এষা কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। রায়পুরের ট্রেন চলে যাবার শব্দ শুনতে তার ভাল লাগছে। যদিও কোনো শব্দই বেশিক্ষণ প্রতিধ্বনি তোলে না। এষার জীবন থেকে অনিমেষের চলে যাবার ট্রেনের শব্দও নয়। শব্দের আয়ু বড় অস্থায়ী।